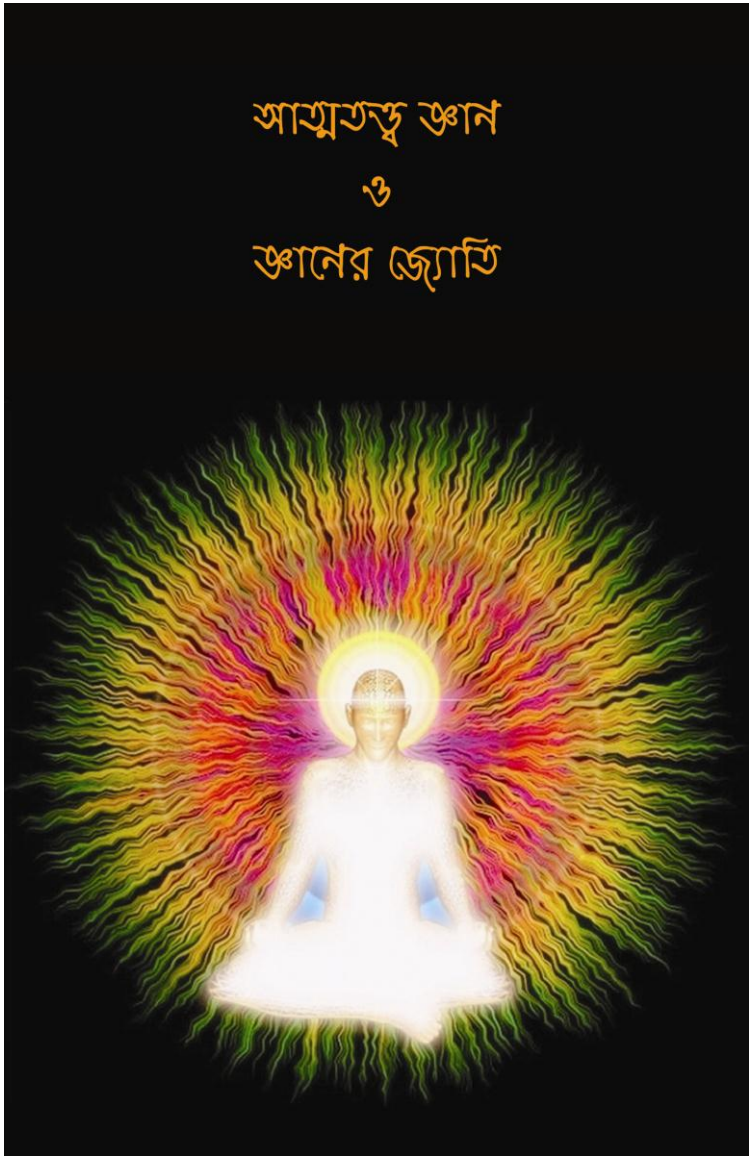

প্রথম পর্ব

"আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ও জ্ঞানের জ্যোতি"

ব্যাখ্যা: আত্ম শব্দের অর্থ-আপনার, নিজের, স্বীয়, নিজ সম্বন্ধীয় ইত্যাদি।

তত্ত্ব: আসল বস্তু, প্রকৃত অবস্থা, সত্য, পারমার্থিক জ্ঞান, মতবাদ, দর্শন।

যেহেতু রমিজ একজন আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন সেহেতু তাঁর লেখা বচনের শব্দগুলো অধ্যাত্ম বিষয়ক হিসাবে চয়ন করাই ভালো।

তা হলে, আত্মতত্ত্ব জ্ঞান বলতে- *নিজের আত্মা বা পরমাত্মা সম্বন্ধীয় পারমার্থিক জ্ঞান, মতবাদ বা দর্শন (Spiritual Philosophy of soul.) কে বুঝায়।*

আবার জ্ঞান হলো- কোন কিছু সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানা বা চেনা, বোধ, চেতনা, অবগতি, পান্ডিত্য, পরমতত্ত্ব ইত্যাদি।

এখন, আত্মতত্ত্ব জ্ঞান বলতে বুঝায় নিজের আত্মা বা পরমাত্মা সম্বন্ধে সঠিকভাবে চেনা বা জানা অথবা *নিজ পরমাত্মার পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হওয়া*। অর্থাৎ নিজ আত্মা বা পরমাত্মার সঠিক পরিচয় বা বিশেষ পরিচয় লাভ করা কিংবা নিজকে নিজে চিনা।

আবার জ্যোতি অর্থ আলো। তা হলে যিনি আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করেছেন তিনি উক্ত জ্ঞানের মাধ্যমে সাঁঈ বা স্রষ্টার (প্রভুর) অনুসন্ধান লাভ করতঃ আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ও জ্ঞানের জ্যোতি বা আলোতে আলোকিত হয়েছেন এবং স্রষ্টার স্বরূপ দেখতে সক্ষম হয়েছেন।

এখন, আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ও জ্ঞানের জ্যোতি বলতে *"নিজ পরমাত্মার পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হয়ে স্বহৃদয়ে উদ্ভুত অনন্ত স্রষ্টার অনন্ত শক্তির জ্যোতি বা নূর, যাহার মাধ্যমে আলোকিত হয়ে স্রষ্টা প্রেমিকগণ স্রষ্টাতে বিলীন হয়ে একাকার হয়ে যান", তা-ই বুঝায়।*

এ অবস্থায় পীর-পয়গম্বর, অলি, ঋষি, সূফী মুণিগণ ফানাফিল-াহ্, বাকাবিল-াহ্ ইত্যাদি আধ্যাত্মিক ও মারেফতের উচ্চস্তরে অবস্থান করেন। এ সময় তাঁদের দেহের মাংসল ইন্দ্রিয়াদি কার্যক্ষম থাকে না। ইহাদের পরিবর্তে তাঁদের অন্তরে বা হৃদয়ে দৈব শক্তির আলো বা নূর সঞ্চার হয়। যার ফলশ্রুতিতে তাঁদের সর্বাঙ্গ নূরময় হয়ে যায়। ইহারই কারণে তাঁদের মধ্যে দৈব ইচ্ছা শক্তি সৃষ্টি হয় এবং তাঁদের হাত আল-াহ্‌র হাত হয়ে যায়, তাঁদের পা আল-াহ্‌র পা হয়ে যায়, তাঁদের চোখ আল-াহ্‌র চোখ হয়ে যায়, তাঁদের মুখ ও জবান আল-াহ্‌র মুখ ও জবান হয়ে যায়। তাদের মধ্যে তখন অতীন্দ্রিয়ের কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়।

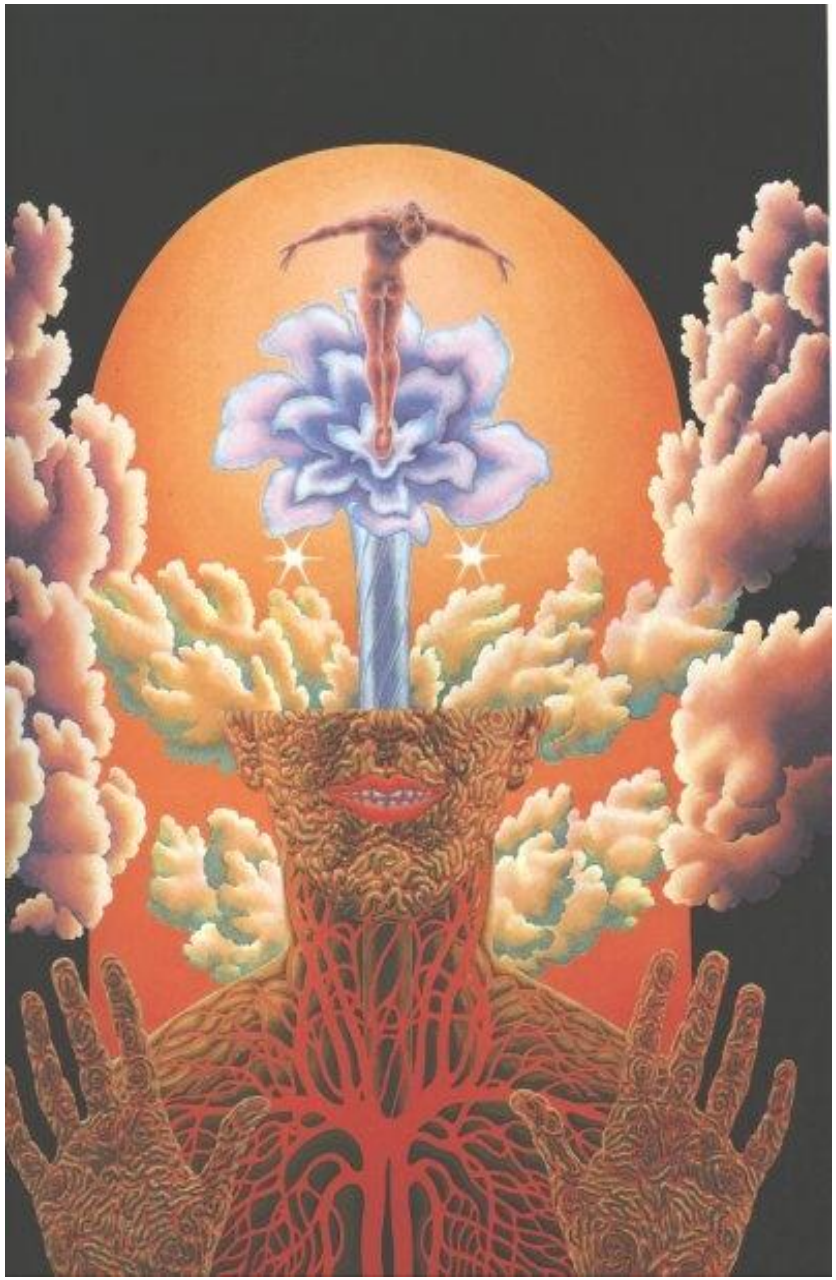

এ অবস্থায় লালন বলেছেন- *"আত্মতত্ত্ব জানে যারা,*
সাঁঈর নিগূঢ় লীলা দেখছে তাঁরা"

গুরু রমিজও তাই উলে-খিত শিরোনামে যা কিছু প্রকাশ করেছেন তার বিচ্ছুরিত আলোর (জ্ঞানের) মাধ্যমে সাঁঈ বা প্রভু বা স্রষ্টার সন্ধান লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। উক্ত আলো বা জ্যোতি ভক্তদের মধ্যে ছন্দ ও ভাবের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছেন যাতে ভক্তগণও আত্মতত্ত্বের জ্ঞানের জ্যোতিতে বা আলোতে আলোকিত হতে পারেন এবং হৃদয়স্থিত স্বয়ং স্রষ্টাকে অবলোকন করতঃ তাঁর অনন্ত শক্তি ও অনন্ত সৃষ্টির সাথে বিলীন হয়ে যেতে পারেন। আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে গুরু রমিজের ভাষায়-

"রমিজ বলে জানলে তত্ত্ব, হবিরে তুই অনাসক্ত,
পাবিরে তুই জীবন মুক্ত এই ধরা তলে"

বাণী নং-২৫ (স্বর্গের সুধা)

গুরু রমিজ অধ্যাত্মবাদী ছিলেন। অধ্যাত্মবাদী হচ্ছে **"স্রষ্টা বা পরমাত্মা-ই সকল কিছুর মূল"** এই মতবাদে বিশ্বাসী। সেজন্যই তিনি পরমাত্মার পরমতত্ত্ব সম্মন্ধে **"আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ও জ্ঞানের জ্যোতি"** এই শিরোনামে তাঁর গ্রন্থের প্রথমেই ভক্তদের আত্মা ও পরমতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান দানের উদ্দেশ্যে তাঁর বিধানের মূল বিষয়স্তু হিসেবে ২১টি আপ্তবাক্য বিবৃত করেছেন। এই বাক্যগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা তিনি যথাযথভাবে দিয়েছেন।

আদেশ ও উপদেশ সমূহের (রমিজ বিধানের) বিস্তারিত ব্যাখ্যা

১। *"সবচেয়ে বড় হল আপনার কর্ম,*
বিশ্বমাঝে কর্ম ছাড়া নাহি কোন ধর্ম"

ব্যাখ্যা: এখানে গুরু রমিজ আত্মকর্মের প্রাধান্য বিষয়ে ভক্তদের উপদেশ দিয়েছেন। আজীবন মানুষকে নিজ কর্মে ব্যস্ত থাকতে হয়। কর্ম বহুবিধ। কর্ম ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। কর্মই তার জীবন। আর্থিক, দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক একটি না একটি কর্ম তাকে করতেই হয়। ধর্মীয় দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে যত ধর্ম আছে প্রত্যেকটি ধর্মেই স্রষ্টাকে পাবার জন্য ধর্ম যাজকগণ নিজ নিজ ধর্মের বহুবিধ কর্ম করার প্রচলন করে গেছেন। কর্ম ছাড়া কোন ধর্মই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যথা ধর্ম তথা কর্ম। কর্ম বিনে ধর্ম অসার। মানব জীবনে যত ঘটনাই ঘটে তন্মধ্যে কর্মই প্রধান। আধ্যাত্মিক স্তরেও কর্মই সবচেয়ে প্রধান এবং সবচেয়ে বড়। এই উপদেশে ইহাই রমিজের মূল কথা।

রমিজের ভাষায় এখানে ধর্ম হতে কর্ম বড় কিংবা কর্ম হতে ধর্ম বড় একথা বলা হয়নি এবং কর্ম ও ধর্মের কোন পার্থক্য নিয়েও কোন কথা বলা হয়নি। বরং কর্ম ও ধর্ম একটি অপরটির পরিপূরক, তা-ই বলা হয়েছে।

স্বামী পরমহংস দেব বলেছেন **"কর্মই ধর্ম"** তার মানে যার যার কর্মই তার তার ধর্মের পরিচয় বহন করে।

উলে- খ্য যে, কর্মবাদীদের কর্ম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হচ্ছে। গুরু রমিজ যে কোন ধর্ম, মত বা পথের নামে সর্ব প্রকার জীব হত্যা জনিত কর্মের বিরোধী ছিলেন। কারণ বিবেক শাস্ত্র বা মানবতাবাদ অনুযায়ী একটি প্রাণী বা জীবকে হত্যা করে নিজের অথবা অপর প্রাণীর মঙ্গল কামনা করা যায় না। মানবতাবাদ ও মানব ধর্মকে (Humanism and Human Relegion) রমিজ সর্বোচ্চে স্থান দিতেন।

কারো হাতে বা মুখের বাক্যে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রাণী যেন কষ্ট না পায় এমন কর্ম তিনি অনুশীলন করতেন এবং তাঁর ভক্তদেরকেও তা করতে আদেশ দিতেন।
তিনি অন্য এক আপ্তবাক্যে বলেন- *"যাহার হস্তে কি মুখের বাক্যে জীবে না পায় কষ্ট,*
তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী সর্ব জীবে রাষ্ট্র"

এখানে রমিজ একথাই বলেন যে, যিনি নিজ হাতে বা আদেশে অন্য কোন জীবকে কষ্ট না দিয়ে থাকেন তিনিই আধ্যাত্মিক জগতে একজন যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তি। এ জাতীয় জ্ঞানী ব্যক্তি মহোদয়গণ-ই আত্মার মুক্তির পথে সাধন কর্মে সফলতা অর্জন করতে পারেন।

নিষ্কলুষ ও আদর্শ চরিত্র গঠনকল্পে বিভিন্ন ধর্মের যে সকল সৎ কর্ম অনুশীলন করার উপদেশ দেয়া আছে তৎসমুদয়ের প্রতি রমিজ যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

২। *"ধর্ম বলি দলাদলি দেখ বিচার করে,*

যত শাস্ত্র তত অস্ত্র দল সাজন করে"

ব্যাখ্যা: এখানে গুরু রমিজ ধর্মীয় শাস্ত্রগুলিকে মানব কল্যাণে ব্যবহার না করে ধর্মে ধর্মে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করতঃ মানবের অকল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর ছন্দের মাধ্যমে একথাই বলতে চেয়েছেন যে, শাস্ত্রকারগণ ধর্মের মূল কর্মগুলো মানব কল্যাণের জন্য যুগে যুগে জীবন বিধান হিসেবে প্রয়োগ করে গেছেন।

কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে পরিবর্তিত মানবগণ অর্থাৎ ধর্মের বিপথগামী মানবগণ নিজ স্বার্থ হাসিল করার নিমিত্তে শাস্ত্রগুলোকে মানব কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণের পথে ব্যবহার করে আসছেন।

শাস্ত্রগুলোকে অপব্যবহার করে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের পরিবর্তে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে, সহজ-সরল প্রাণ মানুষকে বিপথগামী করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। মানুষে মানুষে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, দেশে দেশে, ধর্মে ধর্মে দলাদলি সৃষ্টি করতঃ মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি, কাটাকাটি, গোলাবাজি, বোমাবাজি এবং আত্মঘাতী বোমা মারার মতো জঘন্য ও ঘৃণ্য কাজে কোন কোন লোক লিপ্ত রয়েছে।

নিজ নিজ ধর্মীয় শাস্ত্রের প্রতি মানুষের একটি অন্ধ বিশ্বাস থাকে। এ বিশ্বাসকে পূঁজি করে একটি বিশেষ মহল সাধারণ মানুষকে বিপথগামী করে আসছে আর আজও এ প্রবনতা উক্ত মহলগুলোতে বিদ্যমান রয়েছে।

প্রত্যেকটি ধর্মের মানুষ তাদের শাস্ত্রগুলো বিকৃতি করে বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। যার ফলশ্রুতিতে মানুষ ধর্ম ও শাস্ত্রের সুফল পাচ্ছে না। অর্থাৎ বহুদিন যাবৎ ধর্মীয় শাস্ত্রগুলোকে রাজনীতির দলীয় অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।

৩। *"একেক দলের একেক শাস্ত্র, এই হল তার দলের অস্ত্র,*
দলাদলি তার মহামন্ত্র, কর্ম, ধর্ম, তন্ত্র"

ব্যাখ্যা: প্রত্যেকটি ধর্মের মূল নীতি-নিয়মকে শাস্ত্র বলা হয়। পৃথিবীতে প্রত্যেকটি ধর্ম আবির্ভাবের অনেক পর ধর্মের শাস্ত্রকে সঠিক পথে ব্যবহার না করে সমকালীন শাস্ত্রকারগণ মনগড়া শাস্ত্র প্রণয়ন করতঃ তাদের এবং সমাজের সমাজপতিদের স্বার্থে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতো।

ধর্মে ধর্মে, জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, ভেদাভেদ সৃষ্টি করতঃ ধর্মের মনগড়া শাস্ত্রগুলোকে দলাদলি নামক মহামন্ত্রে বিলীন করে দিয়েছে। অর্থাৎ এক ধর্ম অন্য আরেক ধর্মের একে অপরের কর্ম নিয়ে দলাদলি, ধর্ম নিয়ে দলাদলি এবং তন্ত্র (সাধন প্রণালী) নিয়েও দলাদলিতে ব্যস্ত হয়ে পরেছে।

অর্থাৎ-কর্ম, ধর্ম এবং তন্ত্র (সাধন প্রণালী) কে মনগড়া শাস্ত্রের মাধ্যমে দলাদলি নামক মহামন্ত্রে পরিণত করেছে। যার ফলে পৃথিবীর মানব জাতিগুলোর মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে কলহ, নষ্ট হচ্ছে মানুষে মানুষে প্রেম, ভালবাসা ও সাম্যতা।

চিরতরে বিদায় নিতে চলছে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব ও মমতা। আর এভাবে দিন দিন কেবল বেড়েই চলছে বিভেদের প্রাচীর।

৪। *"সবচেয়ে বড় শত্রু মন আপনার,*
বাধা দিতে শক্তি নাহি জগতে কাহার"

ব্যাখ্যা: মানব দেহে অবস্থিত মন একটি বড় শক্তি। মন মানুষের সকল স্মৃতি বহন করে। মানব দেহের জ্ঞান-মন দ্বারাই সকল কর্ম সম্পাদন করায়। কোন কিছুর প্রভাবে মানবের জ্ঞান বিকৃত হলে মনও বিকৃত হয়ে যায়। এ অবস্থায় মন দ্বারা মানুষ যা ইচ্ছা তাই করে। মনের দুটি গতি থাকে। একটি 'সু'মতি অপরটি 'কু'মতি। কুপ্রবৃত্তি দ্বারা মন যখন নিয়ন্ত্রিত হয় তখন মন দ্বারা শুধু কুকর্মই সংঘটিত হয়। যখন মন এরূপ ধারণ করে তখন কোন শক্তিই তাকে বারণ করতে পারে না। মন খারাপ হলে মানুষ অনেক খারাপ কাজই করতে পারে। তখন কারো বাধাই সে মানে না।

এখানে গুরু রমিজ তা-ই বলছেন যে, মনই জগতে জ্ঞান এবং বিবেকের (আমিত্ব) সবচেয়ে বড় শত্রু। এ অবস্থায় মনকে প্রতিরোধ করার আর কোন শক্তিই থাকে না।

(প্রসংগত উলে- খ্য যে, একজন সদ্‌গুরুই পারেন একজনের মনকে বাধ্য করাতে। তবে ইহাতে সাধন চর্চার কোন বিকল্প নেই।

৫। *"প্রকৃত বন্ধু জীবের যে পেয়েছে জ্ঞান,*

বিপদে-সম্পদে যিনি রক্ষা করেন প্রাণ”

ব্যাখ্যা: উক্ত উপদেশ বাক্যে গুরু রমিজ বলেন যে, তিনিই জীবের একমাত্র প্রকৃত বন্ধু যিনি বিপদে-সম্পদে সর্বজীবের প্রাণ রক্ষা করেন এবং জীবের প্রাণ রক্ষা করার সম্যক জ্ঞান অর্জন করেছেন।

যিনি নিজের আত্মা এবং সর্বজীবের আত্মা একই প্রকার আত্মা (পরমাত্মা) হিসেবে পরিচয় পেয়েছেন তিনিই আত্মতত্ত্বের সন্ধান লাভ করেছেন এবং সর্বজীবের আত্মাকে নিজ আত্মার মত মর্যাদা দিয়ে তাদেরকে বিপদে-সম্পদে রক্ষা করতে পারেন। সকল আত্মা এক এবং অভিন্ন, কেবলমাত্র বিভিন্ন কর্মের কারণে কর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ ধারণ করতঃ বিভিন্ন জীবের আকার প্রাপ্ত হয়। কর্ম অনুযায়ী যে যেরকম দেহ প্রাপ্য হয় সে সেরকম দেহেই জন্ম লাভ করে।

দেহ প্রাপ্তির বিষয়টি মন শত্রু দ্বারা কৃতকর্মের উপর নির্ভর করে।

৬। *“জ্ঞান দ্বারা মন শত্রুর যে না করে বিচার,*
তার মত বোকা ভবে কেবা আছে আর”

ব্যাখ্যা: দেহ, মন, হৃদয়, আত্মা ও জ্ঞান সমাহারে মানব দেহের উদ্ভব। জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদের মতবাদ অনুসারে মানবাত্মার ভবিষ্যৎ দেহ গঠন তার বর্তমান কর্মের উপর নির্ভরশীল।

গুরু রমিজের দর্শন অনুযায়ী আত্মা প্রকৃত জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা এমন সৎকর্মও করতে পারে যাতে তার পরজন্মে দেহ নিয়ে পৃথিবীতে আর আসতে না হয়। অর্থাৎ জন্ম লাভ করতে না হয়।

উক্ত আত্মাই নির্বাণ বা মুক্তি প্রাপ্ত আত্মা। অর্থাৎ আত্মার জীবনচক্র হতে মুক্তি লাভ করে নির্বাণ হয়েছে।

তাই, রমিজের মতাদর্শ মতে জ্ঞান দ্বারা মন শত্রুকে বিচার করে কু-প্রবৃত্তি হতে মুক্ত হয়ে সৎকর্ম করাই শ্রেয়। যারা জ্ঞান দ্বারা বিচার না করে অসৎ কর্মে লিপ্ত, তাদেরকে রমিজ আত্মরাজ্যের বোকা হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

৭। *“প্রকৃত জ্ঞান যিনি পেয়েছেন ভূমন্ডলে,*
তিনিই জীবন মুক্তি জানিও সকলে”

ব্যাখ্যা: এখানে গুরু রমিজ প্রকৃত জ্ঞান লাভ করার সুফলের কথা ব্যক্ত করেছেন। একজন মহাজ্ঞানীর সঙ্গ লাভ করতে পারলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। আর সে মহাজ্ঞানী ব্যক্তিটিই-বা কে ? অবশ্যই তিনি হচ্ছেন একজন সদ্‌গুরু বা নিষ্ঠাগুরু এবং চেতন গুরু।

রমিজের মতে, সদ্‌গুরু হতে প্রাপ্ত জন্ম, জীবন, মৃত্যু, সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক পরম জ্ঞানকে প্রকৃত জ্ঞান বলা হয় কিংবা সদ্‌গুরু হতে প্রাপ্ত আত্মতত্ত্ব জ্ঞানকেই প্রকৃত জ্ঞান বুঝায়।

যিনি ভূমন্ডলে উক্ত জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন তিনিই জীবন মুক্তি লাভ করেছেন। তিনিই জীবনচক্র হতে নিষ্কৃতি লাভ করেছেন। তাকে আর পুনরায় জন্ম নিতে হবে না। তাঁর পরমাত্মা স্রষ্টার পরমাত্মার সাথে অনন্তে লয় হয়ে গেছেন। এ অবস্থায় উক্ত আত্মা-আত্মার রাজ্যে (আলমে আরওয়ায়) সম্মানজনক স্থান পাবেন।

৮। *“কর্ম ছাড়া ধর্ম কি জগতে দেখিনা,*
ধর্ম সব দলাদলি আসলে আত্মার কামনা”

ব্যাখ্যা: এখানে গুরু রমিজ বলেন যে, পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে তত ধরণের কর্মও রয়েছে। প্রত্যেকটি ধর্মেরই নিজস্ব ধর্মাচার ও কর্ম আছে। কর্ম ছাড়া ধর্ম হতে পারে না।

শাস্ত্রকারগণ ধর্ম-কর্মগুলোকে ধর্ম আবির্ভাবের বহু পরে মানুষের কাছে তাদের মনগড়াভাবে এমন করে প্রকাশ করেছেন এবং উপস্থাপনা করেছেন যাতে ধর্মে ধর্মে, বর্ণে বর্ণে, মতে মতে দলাদলির প্রকাশ ঘটে।

একেকটি ধর্ম ও মত যেন একেকটি দল। এক ধর্মে যেটি আদেশ করা হয়েছে অন্য ধর্মে সেটি নিষেধ করা হয়েছে। আবার এমন মতও রয়েছে যেখানে আদেশ-নিষেধ বলতে কিছুই নেই। যখন যা ইচ্ছা তা-ই তারা করে থাকে। সবই তাদের আত্মার কামনা বা ইচ্ছা। এখানে আত্মা মনের কুপ্রবৃত্তির ইচ্ছাধীন এবং জ্ঞান কুকর্মের বিকারগ্রস্থ অবস্থায় থাকে।

৯। *"মানবকে ভালবাস হৃদয়ে রাখি ভক্তি,*
মানবেতে আছেন প্রভু তাঁরে জানাও স্তুতি"

ব্যাখ্যা: এই সিদ্ধবাক্যে গুরু রমিজ মানবকে অতি উচ্চে এবং অতি মর্যাদায় স্থান দিয়েছেন। স্বয়ং আল-াহ্ও মানুষকে সেই স্থান দিয়েছেন। সকল মানবই আদম সন্তান এবং আশরাফুল মাখ্লুকাত।

স্রষ্টা আদি মানব আদমকে সৃষ্টি করেই তাঁকে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাদের আদেশ করলেন। একজন ব্যতীত সকল ফেরেশতাই আদমকে সেজদায় অবনত হল। স্বয়ং স্রষ্টা আদম সন্তানের কাল্বে বা হৃদয়ে অবস্থান করেন।

সুতরাং দেহধারী মানবের প্রতি ভক্তি-ভালবাসা রেখে তাঁর হৃদয়ে অবস্থিত স্রষ্টাকে স্তুতি বা আরাধনা করার জন্য গুরু রমিজ তাঁর ভক্তবৃন্দকে আদেশ দিয়েছেন।

১০। *"মস্জিদে মন্দিরে নাই আছে ঘরে ঘরে,*
বানাইয়া আপনার ঘর-আছে তাঁর ভিতরে"

ব্যাখ্যা: এখানে গুরু রমিজ স্রষ্টার অবস্থান কোথায় এবং তিনি কি অবস্থায় থাকেন তাঁর একটি আভাস দিয়েছেন।

রমিজের মূল বক্তব্য হলো যে, মানবের গড়া মস্জিদ বা মন্দিরে স্রষ্টা বসবাস করেন না। তবে স্রষ্টার গড়া মানবের "হৃদয়" নামক কাবাঘরে তাঁর অবস্থান। তেমনিভাবে প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেও তিনি (স্রষ্টা) বিরাজিত।

মানবের (প্রাণীসহ) দেহ ও হৃদয় স্রষ্টার নিজ ইচ্ছায় এবং পছন্দ মতে গড়া। তাঁর নিজ ইচ্ছা এবং পছন্দমতে গড়া হৃদয় কাবায়-ই তিনি অবস্থান করেন। *সনাতন ধর্মের শাস্ত্রকারগণ উলে-খ করেছেন-* ***"যথা জীব তথা শিব" ও "নররূপে নারায়ণ"***

ইসলাম ধর্ম মতে হাদীসে উলে-খ আছে যে *"ইন্না কুলুবিল আরশিলে- মোমেনা"*। অর্থাৎ মানবের হৃদয়েই স্রষ্টার আসন তিনি আলাদা কোন স্থানে ঘর বাড়ি তৈরী করতঃ সেখানে বসবাস করেন না। সুতরাং, প্রত্যেক মানব এবং প্রাণীই স্রষ্টার আবাসস্থান। যেহেতু মানব সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ট *(আশরাফুল মাখ্লুকাত)* সেহেতু মানবাকারেই তিনি যুগে যুগে স্থানে স্থানে মানবের আত্মাকে মুক্তি করার জন্যে আবির্ভূত হয়ে থাকেন।

১১। *"মানবরূপে কখন তারে না করিও জ্ঞান,*
মহা পাপের ধরাতলে পাবেনা পরিত্রাণ"

ব্যাখ্যা: গুর ে রমিজ এখানে বলেন যে, স্রষ্টা যুগে যুগে বা বিশেষ সময়ে, বিশেষ স্থানে স্থানে মানবের আত্মাকে মুক্তি করার জন্য এবং তাঁর সৃষ্টির কল্যাণে পৃথিবীতে মানবাকারে সর্বশ্রেষ্ঠ পরমাত্মা হিসেবে আবির্ভূত হন। আবার সদ্‌গুরুও পরমাত্মার অধিকারী হয়ে ফানাফিল-া ও বাকাবিল-ার পর্যায়ভুক্ত হয়ে স্রষ্টার জাতের সাথে বিলীন হয়ে মিশে থাকেন।

ইসলাম মতে যারা সূফীবাদে বিশ্বাসী তারা তাদের কথা অনুযায়ী পরমের সাথে বিলীন হয়ে যাবার জন্য আরাধনা ও সৎকর্মে রত থাকেন এবং নিস্কলুষ চরিত্র গঠন করতঃ আমি সত্য *(আন্ আলহক)* বা আমি হক বলে দাবী করার প্রয়াস পান।

সনাতন ধর্ম মতে এ পর্যায়ের লোকগণ বা মণি, ঋষি, যোগী বলেন যে *"অহংব্রোস্মি" অর্থাৎ "আমি সেই পরম ব্রহ্ম"*। এভাবে যারা পরম স্রষ্টার জাতের সাথে মিলিত অবস্থায় মিশে গেছেন, তাদেরকে আর মানবরূপে জ্ঞান না করার জন্য রমিজ তাঁর ভক্তগণকে আদেশ ও উপদেশ দিয়েছেন।

মহাগুর ে রমিজ পন্থীরা এ আদেশ অক্ষরে অক্ষরে অকুণ্ঠচিত্তে পালন করা একান্ত বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন।

রমিজ তাঁর ভক্তদেরকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন যে, স্রষ্টা এবং পরম সদ্‌গুর েকে কোন সময়ই মানবরূপে কল্পনা করা যাবে না। তাও বলা হয়েছে যে, যদি কেহ স্রষ্টা এবং সদ্‌গুর েকে সাধারণ মানবরূপে কল্পনা করে তবে সে মহাপাপী হিসেবে বিবেচিত হবে এবং উক্ত মহাপাপী ব্যক্তি এ ধরাতলে কোন দিনও পরিত্রাণ পাবে না অর্থাৎ আত্মার মুক্তি পাবে না।

১২। *"ইচ্ছা করি গুর েরর বাক্য যে করিবে রদ,*
হইবে সে মহাপাপী পাবেনা কোন পথ।"

ব্যাখ্যা: এ সিদ্ধবাক্যে গুর ে রমিজ তাঁর ভক্তবৃন্দকে হুঁশিয়ার করে বলেন যে, কেহ যদি ইচ্ছা করে এবং জেনে শুনে গুর েরর বাক্য লঙ্ঘন করে তবে সে মহাপাপীর পর্যায়ভুক্ত হবে এবং কোন সময়ও সে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবে না। কারণ, পূর্ববর্তী সিদ্ধবাক্যে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, যিনি সদ্‌গুর ে তিনি স্রষ্টাতে বিলীন অবস্থায় আছেন। অর্থাৎ তিনি স্রষ্টার জাত পাকের সাথে মিশে আছেন। তাই সদ্‌গুর েও জাতে হক। তা হলে ইচ্ছা করে গুর ে বাক্য বা আদেশ লঙ্ঘন করলে স্রষ্টার বাক্যই লঙ্ঘন করা হলো।

স্রষ্টার আদেশ লঙ্ঘন করলে বিধান মতে মহাপাপী হতে হয়। সুতরাং, গুর ে বাক্য লঙ্ঘন করলেও মহাপাপী হতে হবে।

১৩। *"অপরের দোষ চর্চা করে যেইজন,*
হবেনা তার আত্মার মুক্তি সত্য এই বচন"

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত আপ্তবাক্যটি আত্মতত্ত্বের একটি গুর েত্বপূর্ণ অর্থ বহন করছে। গুর ে রমিজের নীতির প্রথম বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে স্রষ্টা এক এবং সর্বজীবে বিরাজমান। তাঁর মানে তিনি সর্বত্র, সর্বক্ষণ, সর্বজীবে মিশে আছেন। তা হলে সর্বজীব শ্রেষ্ঠ মানবের ক্বাল্‌বে বা হৃদয়ে তিনি বাস করছেন। তাই কোন মানুষের দোষ চর্চা করা মানে স্রষ্টারই দোষ চর্চা করা হলো। আর স্রষ্টার দোষ চর্চা করলে তাঁর অনুগ্রহ লাভ করা সুদূর পরাহত।

রমিজ তাঁর এক বাণীতে বলেন-

"রমিজ কয় চাও যদি কর্মের মুক্তি, সর্বজীবে জানাও স্তুতি,
আত্মজ্ঞানে জ্বালাও বাতি, দেখবে তুমি জিতে মরা"
... তুমি কর্মে বাধা জগৎ জোড়া। বাণী নং-৭ (অলৌকিক সুধা)

মানব সর্বজীবের শ্রেষ্ঠ জীব। সুতরাং যেহেতু মানবের হৃদয়ে স্রষ্টার বাসস্থান, সেহেতু মানুষের দোষ চর্চা করা মানেই স্রষ্টার দোষ চর্চা করার শামিল। সেজন্য রমিজ তাঁর ভক্তগণকে মানুষের দোষ চর্চা করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কারণ, সর্বজীব এবং মানুষকে ভালবাসলেই এবং মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিলেই কেবলমাত্র মুক্তি লাভ করা সম্ভব। উপরোক্ত রমিজের বাণীর ভাষায় তা-ই বলা হয়েছে।

১৪। *"আপনার দোষ যেবা ভাবে সব সময়,*
সে হইল মহাজ্ঞানী জানিও নিশ্চয়"

ব্যাখ্যা: এখানে গুরু রমিজ ভক্তদেরকে নিজের দোষ নিজে অকপটে অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। নিজের দোষ নিজে স্বীকার করলে হৃদয়ে অনুতাপ সৃষ্টি হয়। সে অনুতাপ হতে পাপ লাঘবের জন্য চোখে অশ্রু নির্গত হয়। সে অশ্রুতে বা চোখের জলে পাপ জ্বালিয়ে দেয়া যায়।

কোন এক মণিষী বলেছেন- ***"পাপ করে অনুতাপ করে যেইজন,***
সাধনা হইতে শ্রেষ্ঠ বলে মহাজন"

এখানে ইহাই সুস্পট হলো যে, নিজের ভুল (দোষ) স্বীকার করতঃ চোখের জলে অনুতাপ প্রকাশ করলে ইহা সাধনা হতেও শ্রেষ্ট। আর তা হলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ভুলের জন্য বা পাপের জন্য পাপ স্বীকার করতঃ চোখের জলে অনুতাপ প্রকাশ করা একটি মহা সাধনা।

মানুষ স্রষ্টাকে পাবার জন্য বহুরূপী সাধনায় লিপ্ত হয়ে থাকেন। স্রষ্টা এবং গুরুর নিকট যাবতীয় দোষ বা পাপ অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করতঃ অনুশোচনায় লিপ্ত হলে স্রষ্টা তাকে ক্ষমা করতে পারেন।

তাই গুরু রমিজ বলেন– ***"ত্রিবেণীর ঘাটে যেবা নিত্যস্নান করে,***
কোটি কোটি পাপে তারে গ্রাসীতে না পারে" উপদেশ-৫ (স্বর্গে আরোহণ)

এখানেও গুরু রমিজের মূল বক্তব্য হলো-একবার ভুল করে বহুবার অনুশোচনা করলে অর্থাৎ ভুল বা পাপের জন্য বহুবার অথবা বার বার চোখের জলে অনুতাপ প্রকাশ করলে অনুতাপকারীকে কোন প্রকার পাপেই গ্রাস করতে পারে না।

যিনি নিজের ভুল বা পাপ নিজেই স্বীকার করতঃ অনুশোচনায় লিপ্ত থাকেন তিনি অবশ্যই একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি। কারণ জ্ঞানীরা আত্ম সমালোচনা পূর্বক ভুল স্বীকার করতে পারেন কিন্তু অজ্ঞানীরা কখনও আত্মসমালোচনা করে না এবং নিজের ভুলও স্বীকার করে না।

রমিজের আরেকটা বাণীতে দোষ বা নিজ নিজ পাপ স্বীকার করার জন্য তাঁর ভাষায় বলেন-

"রমিজ বলে সুখ নাই আর, পুড়ে হবি ছাড়খার,
স্বীকার কর দোষ যার যার, নইলে উপায় নাই" বাণী নং-৪০ (স্বর্গের সুধা)

সুতরাং, স্রষ্টা বা গুরুর নিকট বিভিন্নভাবে নিজের ভুল বা দোষ স্বীকার করতঃ যদি পাপমুক্ত হওয়া যায় তবে ভক্তের আত্মা নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হতে পারেন।

আবার নিষ্কলুষ আত্মার অধিকারী ভক্ত সদ্‌গুরুর মাধ্যমে স্রষ্টার নিকট আমিত্বকে বিসর্জন করে স্রষ্টার জাতের সাথে মিশে অনন্তে বিলীন হয়ে যান।

এ অবস্থায় রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন যে- ***"তখন এক অনন্ত দয়া হৃদয়ে হইবে***
অনর্গল চোখের ধারা আপনি বহিবে।
হইবে তোমার মধ্যে সত্যের পরিচয়
যথায় তুমি তথায় আমি জানিও নিশ্চয়" উপদেশ-১৩,১৪ (অলৌকিক সুধা)

যিনি স্রষ্টার জাতের সাথে মিশে যান তিনিই মহাজ্ঞানী মহাজন।

১৫। *"যাহার হস্তে কি মুখের বাক্যে জীবে না পায় কষ্ট,*
তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী সর্বজীবে রাষ্ট্র"

ব্যাখ্যা ঃ এখানে গুরু রমিজ, আধ্যাত্মিকভাবে জ্ঞানী কে ? তাঁর কথাই বলেছেন। অধ্যাত্ম জগতে সর্বজীবের আত্মার সথে অনন্তরূপে স্রষ্টা মিশে আছেন। অর্থাৎ সর্বজীবের আত্মাসমূহ স্রষ্টার পরমাত্মা হতেই সৃষ্টি হয়েছে। কর্মফেরে বিভিন্ন জীবে আত্মা সমূহের বাসস্থান।

সুতরাং জীবকে ভালবাসলেই স্রষ্টাকে ভালবাসা হয়। আবার এখানে জীবকে কিভাবে ভালবাসতে হবে তা-ও বলা হয়েছে। যেমন-নিজের হাত দ্বারা যেন কোন জীবকে কষ্ট না দেওয়া হয়, নিজের কথা বা বাক্য দ্বারা যেন কোন মানব অথবা জীব কষ্ট না পায়, মুখের আদেশ বা বাক্য দ্বারাও যেন কোন লোক বা প্রাণী কষ্ট না পায়। তা হলে, যিনি নিজের জ্ঞানকে এমন সূক্ষ্মভাবে কাজে লাগাচ্ছেন যেন কোন প্রকারেই কোন জীবের কষ্টের কারণ না হয় এবং জীবের প্রাণকে নিজের প্রাণের মত মনে করেন, কেবল তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। সনাতন ধর্ম মতে আছে-

"যথা জীব তথা শিব ও নররূপে নারায়ণ"

অর্থাৎ, মানব বা জীব মাত্রই ভগবান।

ইসলাম মতে হাদীসে আছে*"ইন্নাকুলুবিল আরশিলে- মোমেনা"* অর্থাৎ মোমিনের হৃদয়ে আল-াহ্‌র বাসস্থান। মোমিন বলতে নিষ্পাপ মানুষকে বুঝায়। অর্থাৎ যিনি নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী তিনিই মোমিন ব্যক্তি। তা হলে, কোন মানব এবং প্রাণীকে কোন প্রকারে কষ্ট বা আঘাত দিলে তা স্রষ্টাকেই দেয়া হলো। তাই, কোন প্রাণীকেই কষ্ট বা আঘাত দেয়া উচিৎ নয়।

১৬। *"প্রতি জীবে আছেন প্রভু কর্মফল সত্য*
একেক কর্মের একেক ফল রূপ তার অনন্ত"

<u>ব্যাখ্যা</u> ঃ এখানে গুর" রমিজ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, প্রতিজীবে বা সর্বজীবে স্রষ্টা বিরাজিত। তাঁর মতে (দর্শনে) পূর্বজন্মে যে যেই স্বভাবের কর্ম করেছে সে সেই স্বভাব অনুযায়ী বর্তমান জন্মে চেহারা এবং রূপ ধারণ করেছে।

আবার অনেকে মানবাকারে ধরায় জন্ম নিয়ে শৃগাল, কুকুর, গর" ইত্যাদি হিংস্র প্রাণীর ন্যায় কর্ম করতঃ মানুষের ক্ষতি সাধন করে, আবার বিষধর সাপে কামড়ালে যেমন মানুষ ছটফট করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে তদ্র"প এমন স্বভাবের লোকও রয়েছে যারা অন্য মানুষের সমূহ ক্ষতি করার এমন ফাঁদ পাতে যেন তারা তিলে তিলে হৃদয় ও মনের যন্ত্রণায় প্রাণ যায়।

বর্তমান জমানায় ইতর প্রাণীর স্বভাব সুলভ মানুষের কোন অভাব নেই। সুতরাং, জন্মান্তরবাদ অনুযায়ী তারা ইতর প্রাণীর দেহ নিয়ে পুনরায় জন্ম ধারণ করবে এবং ইহাই স্বাভাবিক ও যুক্তি সংগত।

মানবগণ অনন্তরূপ কর্মে ব্যস্ত থাকে। কর্ম অনুযায়ী পৃথিবীতে পুনরায় অনন্ত কর্মের অনন্ত ফল প্রাপ্ত হয়ে অনন্ত রূপ ধারণ করতঃ সর্বজীবে জন্ম নিয়ে থাকে।

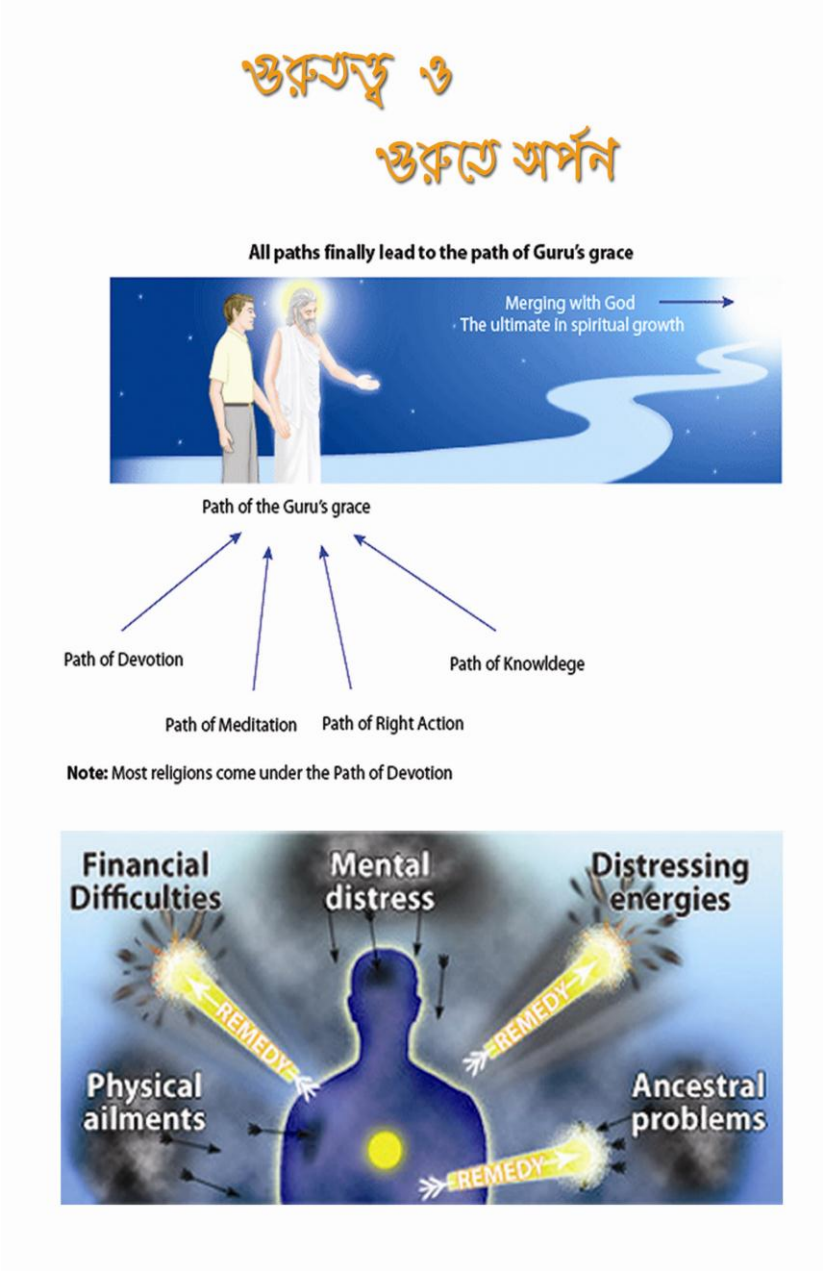

দ্বিতীয় পর্ব

"গুর"তত্ত্ব ও গুর"তে অর্পণ"

মহাগুর" রমিজ প্রথম পর্বে ভক্তদের তাঁর বিধানের আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ও দ্বিতীয় পর্বে গুর"তত্ত্ব সম্বন্ধে মহাজ্ঞান বিতরণ করেছেন।

উপরোক্ত শিরোনামের বিষয় বস্তু আলোচনার্থে প্রথমেই দু' তিনটি শব্দের কথা এসে যায়। যেমন-গুর", গুর"তত্ত্ব ও গুর"তে অর্পণ ইত্যাদি।

অভিধান মতে গুর" হচ্ছেন-

১। কর্ম-ধর্ম জীবনের উপদেষ্টা,

২। সাধন পন্থা নির্দেশক, শিক্ষক, ওস্তাদ ইত্যাদি।

মহাগুর" রমিজের মতে "গুর" হচ্ছেন একজন ভক্তের আধ্যাত্মিক জীবনের কর্মপন্থা নির্দেশক ও ভক্তকে যাবতীয় সৎকর্ম করানোর মাধ্যমে তাঁহার আত্মার ভুল সংশোধন করতঃ সর্ব প্রকার পাপ হতে মুক্ত করতে সক্ষম, নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী এক মহান ব্যক্তি"।

গুর" সম্বন্ধে আলোচনাকালে মহাগুর" রমিজ গুর"র পারমার্থিক বিশে- ষণ করতে গিয়ে গুর"কে অসাধারণভাবে সদ্‌গুর" হিসেবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যার মাধ্যমে স্রষ্টার অনন্ত সৃষ্টি কৌশল হৃদয়ঙ্গম করা যায় ও অনন্তে বিলীন হওয়া যায়।

এক প্রশ্ন-উত্তর প্রবন্ধে মহাগুর" রমিজের ভাষায় "যিনি অন্তর্যামী, তোমার মনের সমস্ত আবর্জনা দূর করতে সক্ষম, যার সেবা করলে বা যার আদেশ অনুযায়ী কর্ম করলে দৈববাণী প্রাপ্ত হওয়া যায়, যার কৃপায় জন্ম-মৃত্যু রোধ করতঃ অনন্ত সৃষ্টি-কৌশল হৃদয়ঙ্গম করে আত্মার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা যায় এবং অনন্ত শক্তির সঙ্গে মিশে অনন্ত কর্মে যোগদান করতে পারে তিনিই সদ্‌গুর"।

একই প্রবন্ধে তাঁর ভাষায় তিনি বর্ণনা করেছেন-সদ্‌গুর" হলেন আমাদের কর্মের চেয়ে বড়। "যিনি অন্তর্যামী অন্তরের ব্যাথা বেদনা বারণ করেন, যার অনুগ্রহে নিত্য দৈববাণী পাওয়া যায়, যার আদেশ পালনে পূর্বকর্ম ও ইহকালের কর্ম কর্তন হয় এবং আত্মার মুক্তি লাভ ঘটে তিনিই সদ্‌গুর"।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ-
তারপর ধারাবাহিকভাবে আসছে গুরুতত্ত্ব বিষয়টি।

গুরুতত্ত্ব- গুরু সম্বন্ধীয় পারমার্থিক জ্ঞান, মতবাদ বা দর্শন।

রমিজের বিধান মতে সদ্‌গুরু অবশ্যই নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির অধিকারী হওয়া বাঞ্চনীয়-

(ক) তিনি পারমার্থিক জ্ঞানের জ্ঞানী হতে হবে, যা তিনি ভক্তদেরকে দিতে পারবেন।

(খ) আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের মাধ্যমে নিজ কর্ম দ্বারা তিনি নিজকে নিজে চিনতে পেরেছেন এবং এই চিনার মাধ্যমে ভক্তদের কাছে তাঁর এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টার স্বরূপ প্রকাশ করতে পারেন।

(গ) ভক্ত মুক্ত করাই হবে তাঁর আরাধনার বিষয়বস্তু।

(ঘ) তাঁর আত্মাতত্ত্বের কর্ম দেখে ভক্তগণ যেন নিজ নিজ আত্মার ভুল সংশোধন করতঃ নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন পূর্বক মুক্তি লাভ করতে পারে।

(ঙ) তিনি সর্বত্যাগী ও আত্মত্যাগী হবেন।

(চ) গুরু রমিজের বিধান মতে স্রষ্টার তরফ থেকে এলহাম, অহি, দৈববাণী, স্বপ্ন ইত্যাদি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক আত্মিক বা আধ্যাত্মিক অনুমান বর্জন করতঃ সঠিক বিশে- ষণ দিবেন।

(ছ) তিনি ভক্তদেরকে আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক যথার্থ সত্য আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশ দিবেন।

প্রিয় ভক্তবৃন্দ, গুরু ও গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো শিরোনাম অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে শেষ পর্যায়ে গুরুতে অর্পণ কথাটি এসে যায়।

এখানে গুরুতে অর্পন প্রসঙ্গে আরো একটি প্রশ্ন জাগ্রত হয়। সেটি হলো-গুরুতে কিসের অর্পণ ? বা কার অর্পণ ? যেহেতু ভক্তের জন্যই পৃথিবীতে গুরুর আগমন হয়, ভক্ত ছাড়া গুরুর কোন মূল্যায়ন নেই। সৃষ্টি ছাড়া স্রষ্টার বিকাশ ঘটতে পারে না, তদ্রুপ ভক্ত ছাড়াও একজন গুরু বিকাশ লাভ করতে পারে না। একে আরেকের পরিপূরক। অর্থাৎ দুজন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

মহাগুরু রমিজের মতে, গুরুর নিকট ভক্তের পূর্ব প্রতিশ্রুতির কারণেই আত্মার মুক্তি লাভের জন্য গুরু ও ভক্ত পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে আসেন।
এখন যেহেতু গুরু ও সদ্‌গুরু সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে সেহেতু ভক্ত ও পরম ভক্ত সম্বন্ধেও আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভক্ত *(Follower)*

- যিনি গুরুকে অনুসরণ করেন।
- গুরুতে যার অনুরাগ আছে তিনিই ভক্ত। **"ভক্তিতেই মুক্তি"** এই ভক্তিবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিই ভক্ত। এর সাথে সংশি- ষ্ট হচ্ছে ভক্তিমার্গ, মার্গ হল-সাধনার একটি পথ মাত্র।
- ভক্তিমার্গ, ভক্তিপথ বা ভক্তিতত্ত্ব যে মতবাদে জ্ঞান ও কর্ম ব্যতিরেকে শুধু ভক্তি দ্বারা সাধন করলেই পরমতত্ত্বে (স্রষ্টায়) পৌঁছা যায়। ইহাও একটি দার্শনিক মতবাদ। ইহা সূফীদের তরিকা বা সূফী সাধকদের মতবাদ।

শিষ্য (Disciple / Apprentice)

- যিনি গুরুকে অনুসরণ ও অনুকরণ করেন তিনি একজন শিষ্য। গুরু আজীবন যে নীতি অনুসরণ করেন ও কর্ম করেন শিষ্যও তা হুবহু তাঁর জীবনে তাই করেন এবং জীবনে মরণে গুরুর অনুগত থাকেন।

উলে- খ্য যে, আমরা সাধারণভাবে ভক্ত ও শিষ্য শব্দের মধ্যে কোন পার্থক্য না রেখে উভয়কে একাকার করে ভক্ত হিসেবেই সম্বোধন করে থাকি।

এখন আমরা পরম ভক্ত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো

- **পরম ভক্ত:**

  যিনি গুরু এবং তাঁর বিধানের (নীতির) প্রতি অটল বিশ্বাস রেখে সারাজীবন বিধান অনুযায়ী কর্ম করে, আত্মত্যাগী হয়েছেন এবং আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে সদ্‌গুরুতে লয় হয়ে গেছেন তিনিই একজন পরম ভক্ত (Absolute Follower/Absolute disciple)

  সকল মহাজন ও মহর্ষীই স্রষ্টার সান্নিধ্য ও কৃপা লাভ করার জন্য বিভিন্ন অধ্যাত্ম তত্ত্বের উপর নির্ভর করে সাধন পথে চলার উপদেশ দিয়ে থাকেন। আবার সকল মণিষীর একই সাধারণ মত এইমর্মে যে, *গুরুই সকল তত্ত্বের মূলাধার*। সুতরাং, গুরুর বিধানে গুরুর পাদপদ্মে থাকিয়া গুরু কর্মই পরম ভক্তের মুক্তির একমাত্র পথ ও পাথেয়।

- **গুরুতে অর্পণ:**

  গুরু রমিজের মতে গুরুতে অর্পণ বলতে একজন পরম ভক্তের এ জীবনের যত পাপ আছে সেগুলো অকুণ্ঠ চিত্তে সদ্‌গুরুর নিকট প্রকাশ করা এবং তাঁর যা কিছু আছে সবই গুরুর পাদপদ্মে সমর্পণ করাকে বুঝায়।

  প্রিয় ভক্তবৃন্দ, উলে- খিত শিরোনামে মহাগুরু রমিজ যে আদেশ উপদেশ (রমিজ বিধান) দিয়েছেন তা কেবলমাত্র একজন সদ্‌গুরু ও তাঁর পরম ভক্তের জন্য প্রযোজ্য।

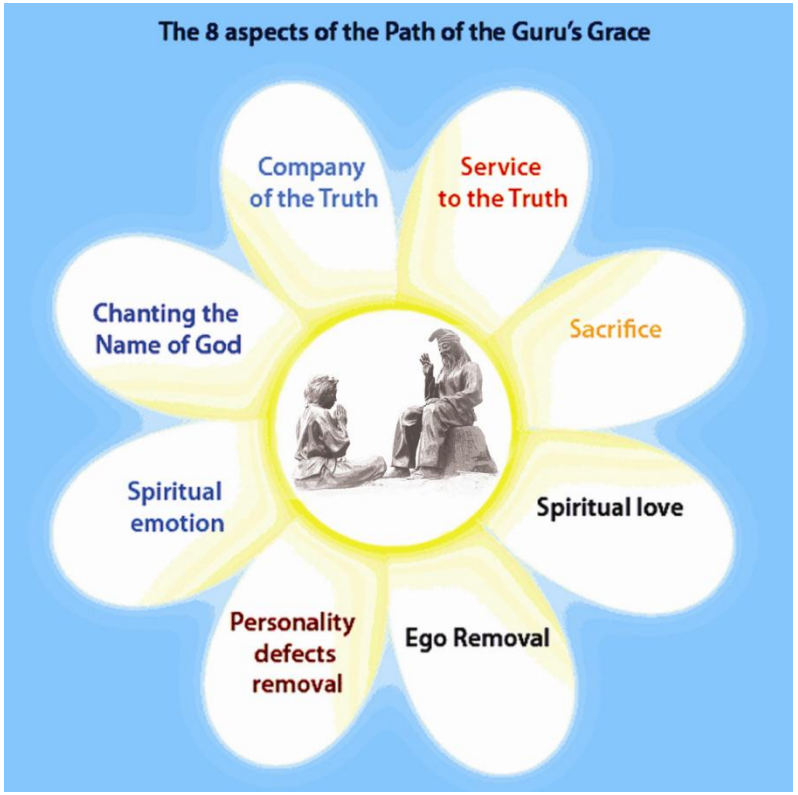

আদেশ-উপদেশ (রমিজ বিধান) এর ব্যাখ্যা

১। সৎগুরুর চরণে তোমার বিকাইও জীবন,
অন্তর্যামী অন্তরের ব্যাথা করিবে বারণ।

ব্যাখ্যা: এই সিদ্ধবাক্যে মহাগুরু রমিজ সকল পরম ভক্তকে সদ্‌গুরুর নিকট তাদের জীবনকে বিলাইয়া দেবার আদেশ দিচ্ছেন। এখানে জীবন বলতে ভক্তের সারাজীবন ব্যাপি যত পাপ এবং অপরাধ করেছেন সেই অপরাধী জীবনের সকল কর্মকান্ডকে বুঝাচ্ছেন। সদ্‌গুরুর নিকট হতে প্রাপ্ত আত্মজ্ঞান দ্বারা আত্মসমালোচনা পূর্বক নিজের সকল প্রকার পাপ নির্ণয় করতঃ অকপটে এবং অকুণ্ঠ চিত্তে তা সদ্‌গুরুর নিকট প্রকাশ করতে হবে। পরম ভক্তের জানমাল এবং যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিও গুরুর নিকট বিলীন করে দিতে হবে। তার অর্থ হলো ভক্তের সব কিছুর হেফাজতকারী হচ্ছেন পরম সদ্‌গুরু। তিনি তাঁর কৃপাগুণে ভক্তের সর্বস্ব বা সব কিছু হেফাজত করবেন। গুরুর নিকট পরম ভক্তের আর্থিক কর্ম, গুরুর ইচ্ছায় ভক্তের আর্থিক আয় হতেই করতে হবে।

সদ্‌গুরুর নিকট পরম ভক্তের আমিত্বকে বিসর্জন দেয়াই হচ্ছে সর্বস্ব অর্পণ করা। আর তা হলেই সদ্‌গুরুর পরামাত্মার সহিত পরম ভক্তের আত্মার মিলন হবে। উক্ত অবস্থায় ভক্তের আত্মাও পরমাত্মা হয়ে যাবে। পরমাত্মায় পরমাত্মার মিলন হয়ে মহা পরমাত্মায় রূপান্তরিত হবে।

এ অবস্থায় একজন সদ্‌গুরুর কৃপায় ও আবেদনে ভক্তের সকল পাপ কর্তন হয়ে যাবে এবং সদ্‌গুরুর অনুগ্রহে পরম ভক্ত নিত্য দৈববাণী প্রাপ্ত হবে। ভক্ত, গুরুর আদেশ পালন করলে পূর্ব কর্ম ও ইহকালের কর্ম কর্তন হবে এবং আত্মার মুক্তিলাভ করবে।

আর এ অবস্থায় সদ্‌গুরু ভক্তের সকল আত্মিক চাহিদা (অন্তরের ব্যাথা) মিটাইয়া দিতে পারেন। অন্তরের ব্যাথা বল্‌তে পূর্ব জন্মের এবং বর্তমান জন্মের অপরাধী মূলক যত পাপ আছে ঐ সমস্ত পাপের কর্মফল সমূহকে বুঝায়।

উক্ত সিদ্ধবাক্যে একথাই বলা হয়েছে যে, গুরুর নিকট পাপসমূহ এবং যা কিছু আছে তা নিয়ে আত্মসমর্পণ করলে ও আমিত্বকে বিসর্জন করলে সদ্‌গুরু অন্তর্যামী হিসেবে ভক্তের সকল ব্যাথা বারণ করবেন।

২। দৈববাণী পাবে তুমি যথায় তথায়,
রিপু তোমার হবে ধ্বংস শ্রীগুরুর কৃপায়।

ব্যাখ্যা: সদ্‌গুরুর নিকট ভক্তের সর্বস্ব অর্পিত হলে ইহার ফল-শ্রুতিতে ভক্তগণ যে কোন সময়, যে কোন স্থানে, যে কোন অবস্থায়, দৈববাণী বা স্রষ্টার তরফ হতে এলহাম, অহি, স্বপ্ন ইত্যাদি ঐশী বাণী প্রাপ্ত হবেন। এখানে যথায় তথায় শব্দগুলো ব্যবহার করে গুরু রমিজ বিষয়টির উপর গুরুত্বও বাড়িয়ে দিয়েছেন।

উক্ত বাক্যে আরো উলে- খ্য যে, গুর ুতে সবকিছু নিয়ে আত্মসমর্পণ করা হলে কোন প্রকার পাপ আত্মসমর্পিত ভক্তকে স্পর্শও করতে পারবে না এবং শ্রীগুর ু বা সদ্‌গুর ুর কৃপায়ই ইহা সম্ভব। ভক্তের দেহ-মন হৃদয়ের যত পাপ সবই সদ্‌গুর ুর কৃপায় ধ্বংস হয়ে যাবে।

৩। সর্বস্ব করিও অর্পণ না রাখিও বাকী,
হইবে আত্মার মুক্তি সর্বজীব সাক্ষী।

ব্যাখ্যা: এখানে মহাগুর ু রমিজ ভক্তগণকে তাদের সদ্‌গুর ুর নিকট সর্বস্ব অর্পণ করার আদেশ দিচ্ছেন। সর্বস্ব বলতে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সদ্‌গুর ুর নিকট অকুণ্ঠ চিত্তে সকল পাপ (ষড়রিপু, এগারো ধারার পাপ ও ইন্দ্রিয়াদির পাপ) প্রকাশ করা এবং *গুর ুকে বিষয়-আশয় যা কিছু আছে ইহার হেফাজতকারী হিসেবে গণ্য করা*। অর্থাৎ সদ্‌গুর ুর নিকট ভক্তের আমিত্বকে বিসর্জন দেয়া এবং কিছুই বাকী রাখা যাবে না।

তা হলেই একজন ভক্তকে সৎকর্ম করানো এবং অসৎ কর্ম হতে বিরত রেখে তার নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন করা সম্ভব হবে। ফলে, ভক্তের আত্মার মুক্তি আসবে এবং ইহার সাক্ষী স্বয়ং সর্বজীব বা স্রষ্টা। যেহেতু স্রষ্টা সর্বজীবে বিরাজমান সেহেতু সর্বজীব মানেই স্রষ্টা।

৪। তোমার মধ্যে যদি মাত্র কিঞ্চিৎ থাকে ধোকা,
আপনাকে দিলে ফাঁকি তুমি ভবে বোকা।

ব্যাখ্যা: এ আপ্তবাক্যটিতে মহাগুর ু রমিজ উপদেশ দিচ্ছেন যে, যদি কোন ভক্তের মনে নিজ গুর ু, বিধান ও কর্ম সম্বন্ধে কেবল সামান্য মাত্রও ধোকা অর্থাৎ সন্দেহ বা সংশয় থাকে তবে নিজের সাথে নিজকেই ফাঁকি দেয়া হলো। বিধান হলো নিজের জীবনাচরণের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে কর্ম করলে আত্মার মুক্তি লাভ করা যায়। সুতরাং, ইহার প্রতি সন্দ্ব, দন্দ্ব থাকলে নিজ আত্মার প্রতি আত্মঘাতী কাজ করা হলো। আত্মজগতে বা অধ্যাত্ম জগতে আত্মঘাতী কাজ আত্মার মুক্তির বিপরীত ফল বয়ে আনে। ইহার জন্য প্রবঞ্চনা জনিত পাপের ফল ভোগ করতে হবে। তাই, মহাগুর ু রমিজ বলেন এ জাতীয় লোক পৃথিবীতে সবচেয়ে বোকা, অর্থাৎ তার কোন আত্মবোধ এবং আত্মচেতনা বলতে কিছুই নেই।

৫। সৎ গুর ুর চরণে যেবা হইয়াছে লয়,
আত্মতত্ত্ব জ্ঞান পাইয়াছে ভবে মৃত্যুঞ্জয়।

ব্যাখ্যা গুর ু রমিজের মতে তিনিই সদ্‌গুর ু যিনি অন্তর্যামী, অন্তরের ব্যাথা বেদনা বারণ করেন, যার অনুগ্রহে নিত্য দৈববাণী পাওয়া যায়, যার আদেশ পালনে পূর্বকর্ম ও ইহকালের কর্ম কর্তন হয় এবং আত্মার মুক্তি ঘটে।

উক্ত সদ্‌গুর ুর চরণে অর্থাৎ বিধানে যিনি নিজকে সমর্পণ করতঃ লয় হয়েছেন এবং নিজকে বিলীন করে দিয়েছেন তিনি গুর ু সঙ্গ লাভ করে এবং তাঁর আদেশে কর্ম করে আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধে আত্মোপলব্ধি করেছেন। নিজ আত্মা বা পরমাত্মা সম্বন্ধীয় পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করেছেন। গুর ুর জীবনাচরণ ও নিজের জীবনাচরণ একাকার করতঃ আত্মতত্ত্ববিদ হয়ে গেছেন। গুর ুতে এবং তাঁর বিধানে তিনি আত্মসমর্পণ করতঃ আমিত্বকে বিসর্জন দিয়েছেন। তাই তিনি (ভক্ত) আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন।

এ অবস্থায় ভক্ত নির্বাণ লাভ করেন। অর্থাৎ তাঁর আর ধরায় জন্ম নিয়ে আসতে হবে না। আর জন্ম না নিলে তার মৃত্যুও নেই। তাই তিনি মৃত্যুঞ্জয় বা মৃত্যুকে জয় করেছেন।

৬। শ্রী গুর ুর যাহা দরকার দেখিবে চিন্তা করে,

না চাহিতে যোগাইবে আপন ইচ্ছা করে।

ব্যাখ্যা: এখানে মহাগুরু রমিজ ভক্তদের প্রতি একটি অতি উত্তম আদেশ করেছেন। আর সে আদেশটি হলো, গুরুর কখন কি প্রয়োজন তা ভক্তগণ চিন্তা করে বিবেচনা করবে। একজন ভক্তের কাছে মূলতঃ একজন সদ্‌গুরুর কি চাহিদা থাকতে পারে তা নিরূপণ করে ভক্তগণই তা যোগাইবেন। গুরু রমিজ **জীবনকে স্বীকার করেই জীবনাতীতের সাধনা করেছেন**। তিনি শাড়ী কাপড় ও থান কাপড়ের ব্যবসা করতেন এবং পরিবার পরিজনের ভরন-পোষণ করতেন। পারিবারিক জীবন চালনার জন্য তিনি কখনো ভক্তদের নিকট কিছু চাইতেন না। বার্ষিক ওরশ মাহ্‌ফিল ও মাসিক বা সাপ্তাহিক মাহ্‌ফিলের খরচাদি ভক্তরাই ব্যবস্থা করতেন।

তাহলে, তাঁর আর কি চাওয়ার ছিল, তাঁরই বিধান মতে একজন পরম ভক্তের কাছে গুরু কেবল ভক্ত দর্শন, আন্তরিক ভালবাসা, আন্তরিক ভক্তি ও তাঁর চোখের জলই পেতে চায়। এগুলোই হচ্ছে সদ্‌গুরুর প্রাণ ও হৃদয়ের খোরাক। এ খোরাক ছাড়া সদ্‌গুরু প্রাণ রক্ষা করতে পারেন না।

মহাগুরু রমিজ তাঁর অতিপ্রিয় একটি বাণী ও সঙ্গীতে তাঁর ভাষায় বলেছেন- *বন্ধু বিনে কে আছে আর বলরে সুবল*
বন্ধু বিনে কে আছে আর বল।

(৫) সুবলরে, রমিজ কয় সে থাকেগো ধারে,
চিনিয়া না চিন তারে গো,
বাঁধ তারে ভক্তির ডোরে রে সুবল,
চরণে দিয়া চোক্ষের জল।

বাণী-২৮ এর অংশ (অলৌকিক সুধা)

উক্ত বাণীতে ভক্তি ও চোখের জল দ্বারা গুরু ও স্রষ্টাকে স্মরণ করার কথাই বলা হয়েছে। রমিজের এরকম অনেক বাণীতে অনুতপ্ত হৃদয়ে চোখের জল দ্বারা সাঁঈ ও স্রষ্টাকে স্মরণ করতঃ আপন করে নেয়ার কথা বলা হয়েছে।

৭। গুরুর সম্পর্কের সহিত সম্পর্ক নাই ভবে,
সবার সংগের সম্পর্ক তোমার ত্যাগ করিতে হবে।

ব্যাখ্যা: এখানে মহাগুরু রমিজ গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন।

পৃথিবীতে আমাদের ছেলে মেয়েদের সাথে এবং বংশের অন্যান্য সদস্যদের সাথে রক্তের সম্পর্ক বিদ্যমান। তাদের সাথে আমাদের জাগতিক বন্ধন আছে। কিন্তু কোন আত্মিক, পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক সম্পর্ক নেই।

কিন্তু সদ্‌গুরুর সাথে আমাদের (ভক্তের) মহান আত্মজগতের সম্পর্ক বা আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান, যাহা মৃত্যুর পরও অনন্তকাল বিদ্যমান থাকবে। এ সম্পর্কের কারণেই গুরু ভক্তের মুক্তির জন্য ধরায় আগমন করেন।

এই সম্পর্কের সাথে জাগতিক ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বন্ধু ইত্যাদির সম্পর্ক অতি তুচ্ছ। গুরুর সম্পর্কের সাথে অন্য কারো সম্পর্ক তুলনাই করা যায় না।

এ প্রসঙ্গে গুরু রমিজ তাঁর প্রশ্নোত্তর পর্বে

৮৩ নং প্রশ্নউত্তর গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ কি ?

তার জবাবে বলেন- *গুরু হচ্ছে শিষ্যের জীবন দাতা।*

৫৫ নং প্রশ্নোত্তর-সৎগুরুর সংগে সম্পর্ক কি ?
উত্তরে বলেন- *আশ্রয়দাতা ও মুক্তিদাতা।*

৫৪ নং প্রশ্নোত্তর-সৎগুরুর মালিক কে ?
উত্তরে বলেন- *পরম ভক্ত।*

এরকম গুরুশিষ্য নিয়ে অনেক প্রশ্নোত্তর ভক্তদের জন্য মহাগুরু রমিজ রেখে গেছেন এবং এগুলোর বিশদ ব্যাখ্যাও রয়েছে।

নিজ আত্মাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সদ্‌গুরুর মহান সম্পর্ক বজায় রাখতে গিয়ে যদি পারিবারিক, বংশীয় বা বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য যে কোন সম্পর্ক ত্যাগ করিতেও হয় পরম ভক্তের তাই করতে হবে। ইহাই সদ্‌গুরুর নিকট একজন পরম ভক্তের কর্তব্য।

৮। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে যাবে গুরুর পাশ,
মনেতে রাখিবা তুমি চির কৃত দাস।

ব্যাখ্যা: এখানে গুরু রমিজ উপদেশ দিচ্ছেন যে, ভক্ত যখন গুরু সঙ্গ করতে যাবে বা গুরু দর্শনে যাবে তখন তাঁর দেহ, মন, হৃদয়, আত্মাকে পরিস্কার পরিচ্ছন অর্থাৎ ভেজাল মুক্ত করে নিতে হবে। এগুলো যদি কোন প্রকার বিকারগ্রস্থ থাকে তবে তা দূর করতঃ শুদ্ধ করে নিতে হবে। দেহ-মনে বা চিন্তা-ভাবনা-চেতনায় গুরু ও বিধান সম্বন্ধে কোন সন্দ-দন্দ্ব বা সংশয় থাকতে পারবে না।

নিজকে সর্বপ্রকার পাপ ও পাপাচার হতে বিরত/মুক্ত করে নিতে হবে। শুধু তাই নয়, আরো বলা হয়েছে যে, মনের সকল ভেজাল দূর করে তার পরিবর্তে নিজের মনে প্রাণে নিজকে সদ্‌গুরুর চির কৃতদাস স্বীকার করতঃ সদ্‌গুরুর নিকট আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে তাঁর নৈকট্য লাভ করতে হবে।

৯। তাহা হলে সর্বজীবের কৃপা তুমি পাবে,
সত্য জ্ঞান হৃদয়ে তোমার ফুটিয়া উঠিবে।

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত সিদ্ধবাক্য (৮নং) অনুযায়ী একজন ভক্ত সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে যদি গুরু কর্ম করতে পারেন তবেই সর্বজীব তথা স্রষ্টার কৃপা লাভ করতে অবশ্যই সক্ষম হবেন। আর সর্বজীব বা স্রষ্টার কৃপা লাভ করলেই পরম ভক্তের হৃদয়ে সত্য জ্ঞান বা পরম জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান ফুটে উঠবে বা জাগ্রত হবে। এ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করলেই পরম সত্যের সন্ধান পাবেন। তার বিধানে কর্ম করতঃ আত্ম পরিচয় লাভ করে আত্মার মুক্তি লাভ করতে পারবেন।

১০। দেখিবে জ্ঞানের আলো খুলিবে দর্শন,
বিশ্বমাঝে আর কিছু নয় শুধু একজন।

ব্যাখ্যা: উপরোলি- খিতভাবে পরম ভক্তের হৃদয়ে যখন আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের উন্মেষ হবে তখনই তাঁর দিব্যচক্ষু খুলে যাবে এবং এ দিব্যজ্ঞানের মাধ্যমে তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক দর্শন (Spritual phyloshophy) বা পারমার্থিক দর্শন খুলে যাবে। এ পর্যায়ে তিনি হয়ে যাবেন আধ্যাত্মিক দার্শনিক। দিব্যজ্ঞানরূপ আলোতে তিনি অধ্যাত্ম বিষয়ক সবই দেখতে পাবেন। এ অবস্থায় তিনি ইহাই অনুভব করতে পারবেন যে, এ বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে স্রষ্টা ছাড়া আর কিছুই নেই। সর্বভূতে, সর্বত্র, সর্বসময়, সর্বজীবে কেবলমাত্র স্রষ্টাই বিরাজমান- অন্য কেহ নয়।

১১। হইবে আত্মার মুক্তি লয় সৃষ্টি হাতে,
মিশিবে অনন্তের সাথে আপনার ইচ্ছাতে।

ব্যাখ্যা: ১০নং আপ্তবাক্য মতে পরম ভক্ত যখন পারমার্থিক দর্শন লাভ করবেন তখনই তিনি আত্মার মুক্তি লাভ করবেন এবং সৃষ্টিতে লয় হয়ে যাবেন। মুক্তি লাভ করার আরো একটি অর্থ হচ্ছে- বিধানে বিলীন হওয়া, গুরুতে বিলীন হওয়া আর সৃষ্টিতে লয় হওয়া।

এ অবস্থায় দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত ভক্তগণ নিজ ইচ্ছাতে মহাবিশ্ব-সৃষ্টি ও অনন্তের সাথে মিশে যাবেন।

ইচ্ছাশক্তি প্রাপ্ত আত্মা, সৃষ্টির স্রষ্টা, তাঁর আত্মা ও সর্বজীবের আত্মা সমূহ মহা-পরমআত্মায় মিশে গিয়ে একাকার হয়ে যাবে।

১২। ভাল-মন্দ যাহা তোমার হইবে দরকার,
জ্ঞানের চক্ষে দেখিবে তুমি ইচ্ছায় আপনার।

ব্যাখ্যা: ১১নং সিদ্ধবাক্য অনুযায়ী পরম ভক্ত ইচ্ছাশক্তি প্রাপ্ত হলে পরে মহাগুরু রমিজের উপদেশ ও আদেশ মতে তাঁর জ্ঞানের চক্ষু বা দিব্যচক্ষুর মাধ্যমে ভাল-মন্দ বিবেচনা করে দেখার মত ক্ষমতাও পাবেন। নিজ ইচ্ছায় তিনি জ্ঞানের চক্ষু দ্বারা সবই দেখতে পাবেন।

সব কিছু দেখাই তাঁর ইচ্ছাধীন থাকবে। তাঁর ইচ্ছায় সবকিছু দেখতে পাইলে ভাল-মন্দ বিচার করতঃ তিনি সকল কর্ম সমাধা করতে পারবেন। আর তখন তাঁর কর্মে কোন ভুল থাকবে না। সকল সময় নির্ভুল কর্ম করতে পারবেন।

অধ্যাত্ম জগতের একজন ভক্ত ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন জ্ঞানের চক্ষু বা দিব্যচক্ষু লাভ করার সুকামনাই থাকে।

১৩। তখন এক অনন্ত দয়া হৃদয়ে হইবে,
অনর্গল চক্ষের ধারা আপনি বহিবে।

ব্যাখ্যা: মহাগুরু রমিজ এই সিদ্ধবাক্যে বলতেছেন "তখন এক অনন্ত দয়া হৃদয়ে হইবে। প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই তখন-সময়টি বা সময়গুলো কখন ? মহাগুরু রমিজ এ পর্বে (গুরুতত্ত্ব ও গুরুতে অর্পণ) ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২ নং সিদ্ধবাক্যের মর্ম অনুযায়ী একজন পরম ভক্তের জন্য এ মুহূর্তগুলো হচ্ছে- তিনি যখন সৎগুরুর কৃত দাসে পরিণত হয়, সত্যজ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান যখন হৃদয়ে ফুটে উঠে, যখন নিজ ইচ্ছায় অনন্তের সাথে মিশে যান এবং যখন পরম জ্ঞানের ইচ্ছাশক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। এ সবগুলো অবস্থার প্রেক্ষিতেই গুরু রমিজ বলছেন "এ অবস্থায় একজন পরম ভক্তের মধ্যে অনন্ত দয়া সৃষ্টি হবে। যিনি অনন্তের সাথে মিশে গিয়েছেন তিনি স্রষ্টার অনন্ত কর্মে যোগ দিতেছেন। তাই, তাঁর মধ্যে বা তাঁর হৃদয়ে অনন্ত দয়াইতো সৃষ্টি হবে। তবে এ দয়া কার প্রতি হবে ? দয়া হবে, যত কিছু দেখা যায়, যত কিছু বুঝা যায়, আবার যা কিছু আছে দেখা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায়। অর্থাৎ সকল প্রকারে-আকারে সাকারে, নিরাকারে, দূরে অথবা কাছে, যা কিছু আছে সব কিছুর প্রতিই"।

এ অবস্থায় দয়াল স্রষ্টার সাথে লয় হয়ে পরম ভক্তের পরমাত্মা স্রষ্টায় সৃষ্টিতে একাকার হয়ে দয়াল নাম ধারণ করেন। আর দয়ালের এ অবস্থায় স্রষ্টা-প্রেম, সর্বজীব প্রেম এবং সর্ব আত্মার মঙ্গল কামনায় অনন্ত প্রেমে অনর্গল চক্ষের জল আপনি বহিবে। যিনি অনন্তে মিশে আছেন তাঁর আশা-আকাঙ্খা, হাসি-কান্না অনন্তে যাহা আছে তাদের জন্যই।

১৪। হইবে তোমার মধ্যে সত্যের পরিচয়,
যথায় তুমি তথায় আমি জানিও নিশ্চয়।

ব্যাখ্যা: অত্র পর্বের (গুরুতত্ত্ব ও গুরুতে অর্পণ) সিদ্ধবাক্য ০১ হতে ১৩ পর্যন্ত মহাগুরু রমিজ নির্দেশিত আদেশ ও উপদেশাবলী যে পরম ভক্ত তাঁর জীবনে ও জীবনাচরণে, মন ও মননে, কর্মে ও স্মরণে বাস্তবায়িত করেছেন তাঁর প্রেক্ষাপটে মহাগুরু রমিজের আত্মিক আদর্শ ও পারমার্থিক তত্ত্ব মতে তিনি পরম সত্যের বা স্রষ্টার পরিচয় লাভ করবেন এবং ইহাও নিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে যে, পরম ভক্ত যেহেতু সদ্‌গুরুতে এবং স্রষ্টাতে বিলীন হয়েছেন, সেহেতু এই ভক্ত যেখানে স্রষ্টাও সেখানে অবস্থিত।

অর্থাৎ, নিষ্কলুষ চরিত্রের আত্মা যেখানে তাঁর স্রষ্টাও সেখানে আছেন। আরো বলা হয়েছে যে, উক্ত অবস্থায় পরম ভক্ত, গুরু ও স্রষ্টা অনন্ত অসীমের মাঝে একাকার হয়ে আছেন।

১৫। ধর্মের নামে হত্যা কেন সেই ধর্ম কি বলনা,
না বুঝিয়া করে কাজ আত্ম প্রবঞ্চনা।

ব্যাখ্যা: এখানে গুরু রমিজ বিভিন্ন ধর্মের লোকদের তাদের নিজ নিজ ধর্মের শাস্ত্র অনুযায়ী নির্বিচারভাবে যে সমস্ত পশু হত্যা করছেন তার ঘটনাই উলে- খ করেছেন।

তাঁর মতে পশু হত্যা বলতে নিজ দেহের ষড় রিপু (যথা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য) দেহের ইন্দ্রিয়াদি (যথা জ্ঞানেন্দ্রিয়, কামেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়) এর অশুভ আসক্তি নাশ করা। কোরবাণী এবং বলিদান করার নামেই এসমস্ত প্রাণী বধ করার রেওয়াজ বহুকাল পূর্ব হতেই চলে আসছে।

নিজ আত্মার বা মনের পশু প্রবৃত্তিগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করাই হচ্ছে কোরবাণী বা পশু বলিদান। গুরু রমিজের মতে- নিজ দেহের পশু প্রবৃত্তিগুলোকে ত্যাগ না করে বা ধ্বংস না করে জাগতিক জীবন্ত অন্যান্য পশুকে হত্যা করা নিজের বিবেকের সাথে নিজে আত্ম প্রবঞ্চনা করার শামিল।

কারণ, হত্যাকৃত বা বলিদানকৃত পশুগুলো জন্মান্তরবাদ মতে পূর্ব জন্মে তারা আমাদের মত মানবদেহ নিয়েই জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু তখন মানুষ হয়েও পশু সুলভ কর্ম করেছে বলে পুনরায় তারা পশু দেহরূপ আকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। তাদের আত্মা এবং আমাদের আত্মা একই পরমাত্মা হতে সৃষ্ট। হত্যা কাজে এক পরম আত্মা অপর পরম আত্মার সাথে জড়িত। তাই, হত্যার কাজে আত্মায় আত্মায় একে অপরকে না চিনার কারণে আত্মপ্রবঞ্চনা করা হচ্ছে।

১৬। যাগ যজ্ঞে নাহি হয় ঈশ্বর উপাসনা,
অরণ্য রোদনে কিন্তু কেহ শোনেনা।

ব্যাখ্যা: পৃথিবীতে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন মতে বিভিন্ন লোক বহুরূপী সেঁজে স্রষ্টাকে (ঈশ্বরকে) পাবার জন্য লোক ভুলানো আচার অনুষ্ঠান করার মধ্যে লিপ্ত আছে। অসচেতন লোক সমূহ এহেন কুসংস্কারের মাঝেই মগ্ন থাকেন।

গহীন অরণ্যে বা জঙ্গলে রোদন বা কাঁদলে যেমন কেহই শোনতে পায়না তদ্রূপ উপরোক্ত আচার অনুষ্ঠান বা যাগ যজ্ঞেও স্রষ্টা শোনবেন না। সব কিছুই নিস্ফল চেষ্টা মাত্র। স্রষ্টাকে পাবার জন্য লোক দেখানো ও লোক ঠকানো বিরাট আচার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই।

স্রষ্টা মানব হৃদয়ে বাস করেন, হৃদয়েই তাঁর স্থান। হৃদয় ভরে তাঁকে ভালবাসলে এবং তার সৃষ্ট যত প্রাণী সব কিছুকে ভালবাসলে তাঁকেই ভালবাসা হলো।

আরো মনে রাখতে হবে যে, স্রষ্টা মানবের সকল সৎকর্মের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি সবই দেখেন, শুনেন এবং বুঝেন।

১৭। পিতার সামনে পুত্র বধ করে যেইজন,
তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট পিতা হবেনা কখন।

ব্যাখ্যা: এখানে মহাগুরু রমিজ জীবহত্যা যে স্রষ্টার পছন্দনীয় নয় তার একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন।

গুরু রমিজ যা বলতে চেয়েছেন তা হলো-পৃথিবীতে কোন লোক যদি অন্য কোন লোকের উপস্থিতিতে ঐ লোকের পুত্রকে বধ করেন বা হত্যা করেন তবে কোন দিনই পিতা তাঁর পুত্রকে যিনি বধ করেছে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

তদ্রূপ, এ বিশ্বব্রহ্মান্ডে মানবসহ প্রত্যেকটি প্রাণীই স্রষ্টার সন্তান। তাই, যিনিই জীবহত্যা বা বধ করবে তার প্রতি স্রষ্টা কোন সময়ই সন্তুষ্ট হতে পারেন না। আর সে জন্যেই মহাগুরু রমিজ তাঁর ভক্তদেরকে জীব বা প্রাণী হত্যা না করার আদেশ দিয়েছেন এবং সে জন্যই তাঁর ভক্তগণ আজীবন নিরামিষভোজী থাকেন এবং আছেন।

১৮। পিতার নিকটে পুত্র প্রত্যেকে সমান,
মূর্খ, কুপুত্র কিংবা যদি হয় বিদ্যান।

ব্যাখ্যা: এখানে মহাগুরু রমিজ তাঁর বিধানের একটি বিশেষ সিদ্ধ বাক্য উদ্বৃত করেছেন। স্রষ্টার নিকট প্রত্যেকটি প্রাণীই সমঅধিকার ভোগ করছেন তা-ই বলা হয়েছে। তা তিনি পিতা-পুত্রের একটি উপমা বা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন।

একজন পিতার যদি একাধিক পুত্র থাকেন এবং কেহ বিদ্যান, কেহ মূর্খ, কেহ অন্ধ, কেহ কানা, কেহ বোবা ইত্যাদি এমন থাকেন, তবে সকল ধরণের পুত্রই পিতার নিকট সমান এবং সমঅধিকার প্রাপ্য। সবাই পিতার নিকট একই রকম আদর আপ্যায়ন পেয়ে থাকেন। কেহ কম, কেহ বেশী এমন নয়। সবাই সমঅধিকার ভোগ করতেছে।

এখন যেহেতু সকল প্রাণীই স্রষ্টার নিকট সমান, সেহেতু প্রত্যেকটি প্রাণী একই মাটি, একই জল, একই বাতাস, একই বায়ূ এবং একই বসুন্ধরা হতে সৃষ্ট নিজ নিজ প্রয়োজনীয় খাদ্য পেতেছে।

প্রত্যেক প্রাণীই স্রষ্টার নিকট সমান। বাঁচিয়া থাকার অধিকারও প্রত্যেক প্রাণীরই সমান সমান। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণীই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম-এই পঞ্চভূতে সমঅধিকার নিয়ে বিচরণ করছে।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষ, ইতর প্রাণী এবং সর্বজীব প্রকৃতিগত ভাবেই (by nature) স্রষ্টার নিকট থেকে বেঁচে থাকার সমঅধিকার পাচ্ছে। সুতরাং মানুষ মানুষের সাথে যে রকম মানবীয় আচরণ করে তদ্রূপ অন্যান্য প্রাণী ও জীবের সাথেও একই আচরণ করা উচিৎ। ইহাই রমিজের উক্ত সিদ্ধবাক্যের মূল বিষয় বস্তু।

১৯। মানবকে করিলে হত্যা বিচারে হয় ফাঁসী,
জীবকে করিলে হত্যা ঈশ্বর কি হবেন খুশি ?।

ব্যাখ্যা: মহাগুরু রমিজ এখানে মানবকে উপমা দিয়ে ইহাই বুঝাচ্ছেন যে, জীব হত্যা করলে ঈশ্বর (স্রষ্টা) কখনো খুশি হতে পারেন না।

পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কোন মানুষকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে হত্যা করলে আদালতের রায় হিসাবে হত্যাকারীর ফাঁসী হয়।

পৃথিবীর সকল প্রাণীর আত্মাই নিজ কর্মফেরে প্রাণী দেহে দেহান্তরিত হয়ে থাকে। কেবল কর্ম দোষে মানবাত্মা বিভিন্ন পশুর আকার ধারণ করেছে। গুরু রমিজের আধ্যাত্মিক বিবেচনায় এবং আলমে আরওয়ায় সকল প্রাণীর আত্মাই মানবাত্মা রূপে বিরাজ করে।

সুতরাং যে কোন জীবের আত্মা মানে মানবেরই আত্মা। সকল আত্মা স্রষ্টার নিকট মানবাত্মা হিসাবে বিবেচিত হয়।

এ পৃথিবীতে মানবকে হত্যা করলে উহার জন্য কেহই খুশি হতে পারেন না। বিচারে হত্যাকারীর ফাঁসী হয়। তাই, জীবকে (মানব সম আত্মা) হত্যা করলে ঈশ্বর খুশি বা আনন্দিত হতে পারেন না। অর্থাৎ জীব হত্যায় স্রষ্টা সন্তুষ্ট নন। জীব হত্যাকারী মানবের আত্মাকে পরজন্মে জীবদেহে দেহান্তরিত করে হত্যার দায়ে স্রষ্টার বিচারে হত্যা হতে হয়। ইহাই উপরোক্ত সিদ্ধ বাক্যের মূল বিষয়বস্তু।

২০। বধ করিলে হবে বধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ,
মানবের বিচারের মত সমান সমান।

ব্যাখ্যা: এখানে মহাগুরু রমিজ মানবের বিচারের উপমা দিয়ে বলেছেন যে, মানবকে হত্যা করলে পৃথিবীর বিচারকের বিচারে আইনতঃ হত্যাকারীর ফাঁসী হয়। তদ্রূপ, কোন প্রাণীকে হত্যা করলে স্রষ্টাও মানবের মত সমান সমান বিচার করবেন।

অর্থাৎ, হত্যাকারীও পরবর্তী জীবনে আত্মজগতের বিচারে বা পারমার্থিক বিচারে প্রাণে বধ হতে হবে। ইহাই রমিজের মতে *আধ্যাত্মিক বিধানের বিচার*।

২১। কর্মফল বিশ্বমাঝে যদি হয় সত্য,
জীবে দয়া না থাকিলে কেহ নয় মুক্ত।

ব্যাখ্যা: এ সিদ্ধবাক্যে মহাগুরু রমিজ মানবের কর্মফল সম্বন্ধে একটি চির সত্য (Universal truth) মহামূল্যবান উক্তি করেছেন।

"কর্ম অনুযায়ী ফল" এ কথাটি যথার্থ সত্য এবং সর্ববাদীসম্মত সত্য। ইহা সর্ব ধর্ম-মত ও পথের গ্রহণযোগ্য বটে। আমাদের সমাজে প্রচলিত একটি অত্যন্ত সুন্দর প্রবাদ বাক্য আছে যে **"যেমন কর্ম তেমন ফল"**।

কোন কোন মণিষী বলেছেন **"কর্মই ধর্ম"**। অর্থাৎ যে যেই ধর্ম বা তরিকায় আছেন সেই ধর্ম বা তরিকা অনুযায়ী যতটুকু কর্ম করবেন ততটুকু কর্মের ফলই তিনি পাবেন। এরকম কর্মফল নিয়ে কবি, দার্শনিক ও মণিষীদের অনেক উক্তি আছে। ইহাতে **"কর্মফল সত্য"** এ কথাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহাগুরু রমিজও তাই বলছেন যে *"এ বিশ্ব মাঝে যদি কর্মফল সত্য প্রমাণিত হয় তবে জীবে দয়া না থাকিলে কেহই মুক্ত হতে পারবে না। আর এ মুক্তি হচ্ছে আত্মার স্বভাব মুক্তি বা আত্মার ভুলের মুক্তি"।*

প্রত্যেকটি জীব বা প্রাণী স্রষ্টার সন্তান এবং তাদের লালন পালন স্বয়ং স্রষ্টাই করছেন। সর্বজীব বেঁচে থাকার সম অধিকার নিয়ে এ বিশ্বচরাচরে বিচরণ করছে। ইহা বিশ্ব স্রষ্টার এক অপরূপ লীলা। তাঁর লীলা বা খেলার কোন শেষ নেই। বিশ্বব্রহ্মান্ড স্রষ্টার খেলার মাঠ। স্রষ্টা এ খেলার মাঠের নিয়ন্ত্রক। সকল সৃষ্ট জীব তার খেলোয়াড়। জীবের কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাঁর হারজিত নির্ভর করে। স্রষ্টা কেবল দেখেন এবং কর্মগতি বা কর্মফল লিখেন। যারা ভাল কর্ম করেন তাঁরা ভাল ফল পাবেন "ইহাইতো ধ্রুব সত্য তত্ত্ব"।

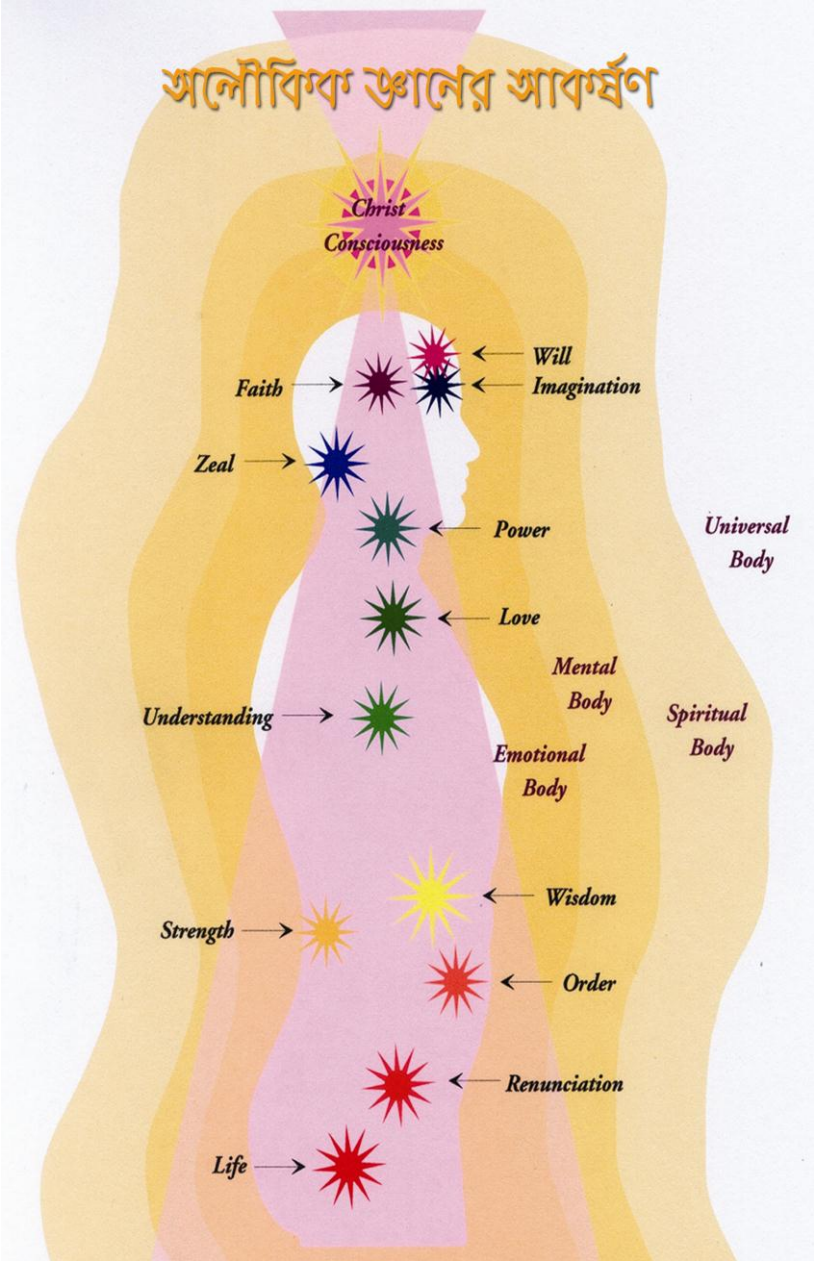

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন-

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুজেছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেইজন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

সুতরাং, সর্বজীবকে ভালবাসলেই স্রষ্টাকে ভালবাসা হলো। ইসলাম ধর্ম মতে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

"সকল সৃষ্টিই আল-াহ্‌র আপনজন। অতএব, তিনিই আল-াহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় যিনি তাঁর পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করেন"।

অর্থ- যে ব্যক্তি আলাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি দয়া করেন, আলাহ্‌ও তাঁহার প্রতি দয়া করেন।

[সূত্র ঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ নবম-দশম শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত ইসলাম ধর্ম শিক্ষা বহি- ৬নং হাদীস]

সবশেষে ইহাই সত্য বলে বলা যায় যে, সর্বজীবকে দয়া করলেই স্রষ্টার অনুগ্রহ পাওয়া যাবে। আর ইহাই মুক্তির একমাত্র পথ।

মহাগুরু রমিজের মূলনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো "সর্বজীবে দয়া প্রর্দশন। আর ইহাতেই রয়েছে মানুষের মুক্তি"।

স্বর্গের সুধা ও সত্যের সন্ধ্যান

বাণী বইয়ে লিখিত আদেশ ও উপদেশ (রমিজ বিধান) এর শিরোনাম ও ইহাদের ব্যাখ্যা।

"অলৌকিক জ্ঞানের আকর্ষণ"

ব্যাখ্যাঃ

জ্ঞান- সঠিকভাবে জানা, বোধ, পান্ডিত্ব, পরমতত্ত্ব ইত্যাদি।

অলৌকিক- যাহা লোকালয়ে পাওয়া যায় না।

অলৌকিক জ্ঞান- যে জ্ঞান বা পরমতত্ত্ব লোকালয়ে পাওয়া যায় না।
অর্থাৎ, পারমার্থিক জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, বিধাতা সম্বন্ধীয় জ্ঞান, পরম সত্য জ্ঞান, শ্রেষ্ট সত্য জ্ঞান ইত্যাদি।

তাহলে, "অলৌকিক জ্ঞানের আকর্ষণ" হলো-

সেই পারমার্থিক জ্ঞান, আধ্যাত্মিক জ্ঞান, বিধাতা সম্বন্ধীয় জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, পরমসত্য জ্ঞান, শ্রেষ্ট সত্যজ্ঞান যার গুণের দ্বারা অন্য কারো মন প্রলুব্ধ হয়।

[একজন সদ্‌গুরুর নিকট সঙ্গ করতঃ সদ্‌গুরুর ন্যায় কর্মাচরণ করে এ মহাজ্ঞান অর্জন করতে হয়।]*

অতএব, উক্ত শিরোনামে যা কিছু লিখা আছে, তা একজন আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন মহাজ্ঞানী মহাপুরুষের দ্বারাই সম্ভব। তিনি তার ভক্তদের আত্মাকে নিজের আত্মার সাথে নিজগুণে আকর্ষণ বা প্রলুব্ধ করে নেন বা টানিয়া নেন। সুতরাং, যারা নিজের আত্মার ভুল সংশোধনের ইচ্ছা করে তারাই উক্ত মহাপুরুষদের অলৌকিক জ্ঞান দ্বারা বা পরম সত্য জ্ঞান দ্বারা আকর্ষিত হয় এবং তাদের সংস্পর্শে এসে উক্ত মহাজ্ঞান লাভ করতঃ আত্মার মুক্তির পথ বা বিধান পায়।

মহাগুরু রমিজ তাই তার বিধানগুলো বিভিন্ন শিরোনামে আপ্তবাক্য ও সিদ্ধবাক্যর ছন্দের মাধ্যমে ভক্তদের হিতার্থে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন।

এ সমস্ত বাক্যের অন্তর্গত আদেশ উপদেশ বা বিধানগুলো নিজ কর্মক্ষেত্রে ও জীবনাচরণে কার্যকর করে ভক্তগণ আত্মার ভুল সংশোধন করতে পারেন। এ পর্বের বিধানগুলো নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো।

১। প্রতিবেশীর প্রতি কর ভাল ব্যবহার,
বিপদে সম্পদে তাদের করিও উদ্ধার।

ব্যাখ্যাঃ মহাগুরু রমিজ প্রতিবেশীর সুখ দুঃখের সময় বা যে কোন প্রকার বিপদের সময় তাদের সহায্য সহযোগিতা করার আদেশ দিচ্ছেন।

তবে প্রশ্ন হলো প্রতিবেশী কারা ? আমরা সাধারণত আমাদের পার্শ্ববর্তী যারা বসবাস করেন তাদেরকেই প্রতিবেশী বলি। কিন্তু সর্বজীবের আত্ততাভুক্ত মানব ছাড়া আরও অনেক জীব আমাদের অতি নিকটে অহরহ বসবাস করছে। যেমন- পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, মাটির নিচে, পানিতে, বায়ুমন্ডলে এমনকি আমাদের বিছানার নীচেও ছাড়পোকা, তেলাপোকা ইত্যাদি অনেক জীব বিচরণ করছে। ইহারা সবাই আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী।

মহাগুরু রমিজের ভাষায় মানবসহ উক্ত সকল প্রতিবেশী জীবজন্তুকে তাদের বিপদে সম্পদে আমাদের সাধ্যমতে সাহায্য, সহায়তা ও রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করতে হবে।

তদুপরি প্রতিবেশীদের সাথে উত্তম ব্যবহার বা মার্জিত আচরণ করার আদেশও দেয়া হয়েছে।

২। নিজে বুঝ নিজে কর এই তোমার কর্ম,
বাদ-বিসম্বাদ কেন বুঝনা যার মর্ম।

ব্যাখ্যা: এখানে মহাগুর ্ রমিজ তাঁর ভক্তবৃন্দকে আদেশ ও উপদেশ দিচ্ছেন যে, কোন আত্মকর্ম বা সাধনা করতে হলে তার পূর্বে সংশি- ষ্ট বিষয়ের সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

কর্ম-ধর্ম পালন করার বিষয়েও সঠিক জ্ঞান লাভ করতঃ কর্ম-ধর্মের জীবনাচরণ করতে হবে। নতুবা বাস্তব জগতে অপরের সাথে তর্কাতর্কি, ঝগড়া-বিবাদ, আত্মকলহ ইত্যাদি সৃষ্টি হবে।

আমাদের দেশে বা সমাজে প্রায়ই দেখা যায় যে, শরীয়ত, তরিকত, হাকিকত, মারেফত ইত্যাদি নিয়ে সম্যক জ্ঞানের অভাবে মানুষে-মানুষে বিরাট তর্কা-তর্কি, বাক-বিতন্ডা ইত্যাদিতে মানুষ অযথা জড়িত হয়ে যায়। এতে নষ্ট হয়ে যায় মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, সৃষ্টি হয়ে যায় মানুষে মানুষে বিরাট বিভেদের প্রাচীর।

তাই গুর ্ রমিজ বলেছেন আত্মজ্ঞান লাভ করতঃ বাদ-বিসম্বাদ, ঝগড়া-কলহ ইত্যাদি পরিহার করতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতঃ নিজের কর্ম নিজে করতে হবে- ইহাই রমিজের আদেশ ও উপদেশ।

উক্ত সিদ্ধবাক্যে ইহাও বুঝা যায় যে, যার যার ধর্মীয় পুস্তকের মর্ম উপলব্ধি করত সম্যক জ্ঞানার্জন করে ধর্ম-কর্ম করলে কোন প্রকার কলহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে না এবং সর্বত্র শান্তি বজায় থাকবে।

৩। বুঝ না যাহার কর্ম না কর পালন,
হেন উপদেশ কিন্তু না দিও কখন।

ব্যাখ্যা: সমাজে এমন কোন কোন লোক পাওয়া যায় যারা আত্মজগত বা আধ্যাত্মিক জগতের মর্ম ও কর্ম এবং নিজ ধর্ম-কর্ম নিজে বুজেওনা পালনও করে না। অথচ দেখাদেখি বা অন্যের কাছে শুনে অন্য আরেকজনকে উক্ত কর্ম-ধর্ম পালন করার উপদেশ দিতে পছন্দ করেন।

যে কর্ম নিজে বুঝে না এবং পালনও করে না তাহা অন্যকে পালন করার উপদেশ না দেওয়ার জন্যই গুর ্ রমিজ উক্ত সিদ্ধবাক্যে বলেছেন।

৪। না বুঝিয়া ধর্ম কথা বল যদি কারে,
তোমার মত বোকা আর কেহ নাই সংসারে।

ব্যাখ্যা: সমাজে যারা ধর্ম-কর্ম প্রচার করেন তাঁরা অবশ্যই ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত। এ শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে উত্তম চরিত্র গঠন ও স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করার উদ্দেশ্য নিহীত থাকে। আবার যারা বিভিন্ন তরিকা মতে কর্ম-ধর্ম পালন করেন তাঁরাও সংশি- ষ্ট তরিকায় সুশিক্ষিত একজন সদ্গুর ্র নিকট নিজকে সমর্পণ করে থাকেন এবং পরবর্তীতে তিনিও তরিকার শিক্ষা দীক্ষা দিতে পারেন।

কিন্তু এমন কোন কোন লোক পাওয়া যায় যে, তারা ধর্ম-শিক্ষা ছাড়াই নিজ মনগড়া মতে, বেশভুষা ধারণ করে, লোক ঠকানোর উদ্দেশ্যে সরল প্রাণ মানুষগুলোকে ভুল বুঝিয়ে প্রতারণা করছে। ইহা মূলতঃ একটি আত্ম প্রবঞ্চনামূলক কাজ।

তাই, গুর ্ রমিজ উক্ত প্রবঞ্চনাকারী লোকদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং বোকা বলে উলে- খ করেছেন। এখানে তিনি তাঁর ভক্তদেরকে এ জাতীয় কর্মে জড়িত না থাকার জন্যই উপদেশ দিয়েছেন।

৫। ধর্ম কর্ম কোনটি সত্য দেখিও ভাবিয়া,
না বুঝিয়া মিথ্যা কথা যাইওনা বলিয়া।

ব্যাখ্যা: ধর্ম হলো কোন গোত্র, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের প্রতি সৃষ্টিকর্তার উপর ও পাপ পূণ্যাদি বিষয়ক বিশ্বাস এবং ইহলৌকিক শান্তি ও পারলৌকিক পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে অনুসৃত আচার-আচরণ, উপাসনা পদ্ধতি এবং সাংসারিক দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্পর্কিত কার্যাবলি।

তবে সাধারণতঃ ধর্ম বলতে কোন সম্প্রদায়ের আচার অনুষ্ঠান এবং কর্ম কান্ডকে বুঝায়। কর্ম ছাড়া কোন ধর্মেরই প্রকাশ ঘটে না। কর্ম সমূহ ধর্মেরই বহিঃ প্রকাশ মাত্র। মানুষের ভালমন্দ বিচার করা হয় তার কর্মকান্ড দেখে, ধর্ম দেখে নয়। মানুষের আত্মকর্মের প্রকাশ ব্যতীত তার ভালমন্দ মূল্যায়ন করা যায় না। একজন লোক কতটুকু ধর্ম পালন করলো তা তাঁর কর্মের দ্বারাই নির্ণয় করা যায়। সুতরাং ধর্মের জন্য কর্মই সত্য। কর্ম ব্যতীত ধর্মের মূল্য নেই। কর্মহীন কোন ধর্ম হতে পারে না।

ধর্মীয় পুস্তকে যত কিছুই লিখা থাকুক আর ধর্মবিদগণ যত ভাল ভাল বয়ান বা উপদেশ দিয়ে থাকুক না কেন মানুষ তাদের বক্তব্যের বা বয়ানের উপদেশ মতে কর্ম না করলে ধর্মোপদেশের কোন ফলই আসবে না। সবই বিফলে যাবে। সুতরাং, ধর্মের নামের চেয়ে কর্মই সত্য। কর্ম না করলে শুধু শুধু ধর্মের নামের দোহাই দিয়ে লাভ হবে না।

আবার যার যার ধর্ম তাঁর তাঁর পরম মতবাদ বা পরম তত্ত্ব। যদি কেহ এ পরম তত্ত্ব বা মতবাদ না বুঝে মনগড়া মতে সম্প্রদায়ের মানুষকে অতি উৎসাহ নিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করে তবে তা একদিন না একদিন মিথ্যাতে পর্যবসিত হবে। না বুঝে এ মিথ্যা কথা না বলাই শ্রেয়।

মহাগুরু রমিজ এখানে তার পথের মানুষকে এজাতীয় মনগড়া মিথ্যা কথা না বলার জন্য আদেশ/উপদেশ দিয়েছেন। ধর্মের অর্ন্তগত কর্ম গুলোকে চিন্তা ভাবনা করে সঠিক কর্ম করার তাগিদ দিয়েছেন।

উলে- খ্য যে, কর্মাচরণ ও ধর্মাচরণ একে অপরের সম্পূরক। কর্মাচরণ সঠিক হলে ধর্মাচরণ আপনাআপনিই সঠিক হয়ে যাবে। কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে **"কর্মই ধর্ম"** একথাটির প্রচলন আছে। কর্ম-ধর্ম সম্বন্ধে মহাগুরু রমিজ বলেছেন-

"সবচেয়ে বড় হল আপনার কর্ম,
বিশ্বমাঝে কর্মছাড়া নাহি কোন ধর্ম"

পরম স্রষ্টার সাথে লয় হতে হলে প্রথমে সদ্‌গুরুর মাধ্যমে সৎ-সত্য এবং পরম কর্মের সন্ধান লাভ করতঃ উক্ত কর্মের কর্মাচরণ করতে হবে।

৬। "শোনা কথা না দেখিয়া করোনা বিশ্বাস,
কোন সময় হতে পারে মিথ্যাতে প্রকাশ"

ব্যাখ্যা: এই সিদ্ধবাক্যে গুরু রমিজ তাঁর পন্থীদের কোন প্রকার ভিত্তিহীন শোনা কথা বিশ্বাস না করার উপদেশ দিচ্ছেন। ধর্মীয় বিষয়েও মানুষের শোনা কথা বিশ্বাস করা ঠিক নয় বর্তমান সময়ে আমাদের কোরআন, হাদীস ইত্যাদির সুন্দর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত আছে। নিজেরা উহা পড়ে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত সহজ।

পূর্বে আমরা দেখেছি আমাদের সমাজে এক ধরণের মৌলভী সাহেবগণ যা বয়ান করেছেন তাই শুনে ধর্মপ্রাণ লোকেরা ধর্ম-কর্ম করতেন। সাধারণ লোকেরা (অশিক্ষিত) মৌলভী বা হুজুরদের মৌখিক কথা বা তাঁদের মাহ্‌ফিলের বয়ান শুনে মূহিত হয়ে যেতেন। স্থান-কাল পাত্র ভেদে বয়ানকারীগণ মন মাতানো কিচ্ছা কাহিনী বলে ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদের মতলব হাসিল করে নেন। এমনকি মুখরোচক সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত কাহিনী বয়ান করতঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়ে নিরীহ লোকদের নিকট হতে হাজার হাজার টাকা আদায় করার রেওয়াজ ছিল। বর্তমানে শিক্ষিত লোকের হার বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এ ধরণের প্রবণতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলো হচ্ছে লোক ঠকানোর একটি বিশেষ প্রক্রিয়া মাত্র।

দেশের প্রচলিত আইনের বাইরে এখনো প্রত্যন্ত অঞ্চলে অর্ধশিক্ষিত হুজুর নামধারী লোকদের ফতোয়া দ্বারা নিরীহ লোকগণ নিপিড়িত ও নির্যাতিত হচ্ছেন।

গুরু রমিজ এধরণের ধর্ম ব্যবসায়ী লোকদের কথা না শোনার জন্যই সরল প্রাণ লোকদেরকে আহ্বান করছেন।

তাঁর মতে সৎ যুক্তি ও প্রমাণ ছাড়া যে কোন শোনা কথাই বিশ্বাস করা সমিচীন নয়।

৭। দেখা দেখি কোন কাজ করিওনা আর,
আত্মজ্ঞানে নিজকে চিন করিয়া বিচার।

ব্যাখ্যা: আমাদের সমাজে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনেক কর্মকান্ড বহুকাল পূর্ব হতেই চলে আসছে। যুগ যুগ ধরে মানুষ এগুলো করে আসছে। পুরুষানু-ক্রমে এসমস্ত কুসংস্কার (Superstition) আমাদের ধর্মীয় ও জীবনা-চরণের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছিল এবং এখনো কোন কোন স্থলে আছে। বর্তমান চেতনার যুগে মানুষ যেমন সুশিক্ষিত হচ্ছে তেমনিভাবে ঐ সমস্ত কুসংস্কারগুলো ক্রমে ক্রমে কমছে।

ব্রাহ্মণ পুরোহিত, নামমাত্র আরবী পড়া মৌলভী, নামধরা লোকেরাই ধর্মাদি বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐ সমস্ত যুক্তিহীন বিশ্বাসের বীজ রোপণ করে আসছিল।

অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ, অশিক্ষিত মৌলভী, অশিক্ষিত ভন্ডপীর, অশিক্ষিত ওঝা-বৈদ্য তারাই এগুলোর জন্য দায়ী।

সাধারণ লেখাপড়ার সাথে ধর্মীয় লেখাপড়া অন্তর্ভুক্ত করে জ্ঞানী লোকের পেছনে শিক্ষানবীস হয়ে, আদব কায়দা শিখে, সুষ্ঠু অনুকরণ ও অনুস্মরণ করে প্রকৃত মাওলানা, ব্রাহ্মণ ও পীরের গুণাবলী অর্জন করতঃ অপর মানুষকে আলোর পথ দেখাতে পারে।

সে জন্যেই গুরু রমিজ দেখাদেখি কোন কাজ না করে জ্ঞানী লোকের পেছনে দীক্ষা ও শিক্ষা নিয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করতঃ আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে সবকিছু বিচার করে চলার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

উলে- খ্য যে, আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে আত্মতত্ত্বের জ্ঞানের অধিকারী এমন একজন মহাজ্ঞানী মহাজনের সাহচর্যে আসতে হবে এবং তাঁকে অনুস্মরণ অনুকরণ ও তাঁর আদেশ-নির্দেশ পালন করতে হবে।

এই ধরণের মহাজ্ঞানী লালন বলেছেন- *"আত্মতত্ত্ব জানে যারা,*
সাঁঈর নিগূঢ় লীলা দেখ্ছে তাঁরা"

মহাগুরু রমিজ বলেছেন- ***"রমিজ বলে জানলে তত্ত্ব, হবিরে তুই অনাসক্ত,***
পাবিরে তুই জীবন মুক্ত, এই ধরা তলে"

এইভাবে লালনের মতে যিনি সাঁঈ বা স্রষ্টার নিগূঢ় লীলা দেখেছেন এবং রমিজের মতে যিনি জন্ম, জীবন, মৃত্যু, স্রষ্টা ও সৃষ্টির সকল তত্ত্ব জেনে রিপু আদির প্রতি অনাসক্ত হয়ে জীবন মুক্তি লাভ করেছেন তাদের মত মহাজনদের সংস্পর্শে এসে নিজকে নিজে চিনে সকল কর্ম বিচার করতঃ সৎকর্ম করার জন্য রমিজ তাঁর পন্থীদের আহ্বান করছেন।

৮। তোমার মধ্যে যত ভেজাল করিলে বর্জন,
স্রষ্টার অনুগ্রহ তুমি পাইবে তখন।

ব্যাখ্যা: উক্ত সিদ্ধবাক্যে মহাগুরু রমিজ স্রষ্টার অনুগ্রহ বা দয়া পাবার জন্য পরম ভক্তগণকে তাদের দেহ, মন, হৃদয়, আত্মা, জ্ঞান ইত্যাদির যত ভেজাল বা ভুল রয়েছে সবকিছুই বর্জন বা ত্যাগ করার আদেশ দিচ্ছেন।

ভেজাল বলতে ভক্তের যত প্রকার জানিত অজানিত পাপ, ষড়রিপু জনিত সকল পাপ, রমিজ নির্দেশিত এগার ধারার পাপ এবং ইন্দ্রিয় তাড়িত পাপগুলোকে বুঝায়।

আত্ম সমালোচনা পূর্বক উক্ত সকল পাপ সদ্‌গুরুর নিকট অকুণ্ঠ চিত্তে প্রকাশ করতে হবে এবং গুরুর নিকট আত্মার আত্মসমর্পণ ও আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে সর্বস্ব অর্পণ করতে হবে। তবেই সদ্‌গুরুর আদেশ মতে সৎকর্ম করতঃ আত্মসংযমের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি বা আত্মারভুল সংশোধন করতে পারবে।

তখনই রমিজের মতে স্রষ্টার অনুগ্রহ, দয়া বা কৃপা পাওয়া যাবে ও মুক্তির পথ সুগম হবে।

৯। শ্রী গুরুর শ্রীচরণ লইবে স্মরণ,
মন প্রাণ যাহা আছে করিবে অর্পণ।

ব্যাখ্যা: এই আপ্তবাক্যে গুরু রমিজ ভক্তদেরকে সৎগুরুর নির্দেশিত পথ বা বিধান মনে প্রাণে মেনে নিয়ে উহা পালন করার উপদেশ দিচ্ছেন। তাঁর বিধান স্মরণ করার অর্থ হচ্ছে বিধানের আদেশ উপদেশ যা কিছু আছে সবকিছু হৃদয়ঙ্গম করতঃ তার মতে আত্মকর্ম সাধন করা।

কর্মও করতে হবে এবং বিধানের প্রতি মন-প্রাণে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। বিধান অনুযায়ী সদ্‌গুরুর নিকট নিজকে সমর্পণ করতে হবে।

উলে- খ্য যে, আমিত্বকে বিসর্জন দিয়েই গুরুর প্রতি নিজকে সমর্পণ করা যায়। এই অর্পণের কথাই গুরু রমিজ উক্ত বাক্যে উলে- খ করেছেন।

আরও উলে- খ্য যে, গুরুর নিকট আমিত্বকে বিসর্জন এবং অর্পণ বলতে ভক্তের সর্ব পাপ অকুণ্ঠ চিত্তে গুরুর নিকট প্রকাশ করা এবং তাঁর আদেশ অনুযায়ী দাসত্ব গ্রহণ করাকে বুঝায়।

১০। তাহা হইলে সত্যজ্ঞান উঠিবে ফুটিয়া,
সত্যের সন্ধান তিনি দিবেন দেখাইয়া।

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত আপ্তবাক্য (৯ নং) মতে ভক্ত গুরু ও বিধানের প্রতি মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে সর্বদা কর্মরত থাকলে তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্যজ্ঞান প্রস্ফুটিত হবে। এ অবস্থায় মহাগুরু তাঁর ভক্তের হৃদয়ে সত্যজ্ঞান রূপে আবির্ভূত হবেন এবং পরম ভক্ত সকল সত্যের সন্ধান ইচ্ছা করলেই পেয়ে যাবেন। তার ইচ্ছা এবং গুরুর ইচ্ছা তখন একাকার হয়ে যাবে। তখন ভক্তের অন্তরে থেকেই গুরু সত্য জ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান উন্মোচিত করবেন।

১১। সত্য যাহা করবে ব্যক্ত হৃদয়ে থাকিয়া,
তোমার মধ্যে আছেন যিনি যাইবেন বলিয়া।

ব্যাখ্যা: যে পরম ভক্ত গুরু ও বিধানের প্রতি নিবেদিত প্রাণে সর্বদা আত্মকর্মে রত থাকেন তাঁর হৃদয়ে অবস্থান নিয়েই সদ্‌গুরু অধ্যাত্ম বিষয়ক সকল সত্য ব্যাক্ত করবেন।

ভক্তের আবেদনে গুরু তাঁর হৃদয়ে থেকেই জাগ্রত কিংবা শয়নে স্বপনে সকল সত্য প্রকাশ করতঃ জানিয়ে দিবেন।

১২। যে কর্ম সত্য বলি পেয়েছ প্রমাণ,
ভুলিওনা যে পর্যন্ত দেহে আছে প্রাণ।

ব্যাখ্যা: সদ্‌গুরুর সংস্পর্শে গিয়ে যে সকল ভক্ত তাদের আত্মিক, আধ্যাত্মিক ও গুরু-শিষ্যের করণীয় সকল কর্ম, সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, ঐ সকল কর্মের কথা দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত না ভুলার জন্য গুরু রমিজ তাঁর ভক্তদেরকে উক্ত সিদ্ধ বাক্যের মাধ্যমে আদেশ-উপদেশ দিয়েছেন। উলে- খ্য যে, গুরুসঙ্গ করাকালীন গুরুর আদেশ এবং বিধান মতে কর্ম করলে উক্ত কর্মের সুফল অবশ্যই বাস্তবে পাওয়া যায়। এল্‌হাম-যোগে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এল্‌হামই বাস্তব প্রমাণ। গুরুবাক্যের মাধ্যমেও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

সুতরাং, প্রমাণিত সত্য কর্ম সমূহ কখনো না ভুলার জন্য গুরু রমিজ উক্ত উপদেশ এবং আদেশ দিয়েছেন।

যিনি পরম ভক্ত তিনি কখনো গুরুকর্ম বা গুরুর আদেশ অমান্য করতে পারেন না এবং গুরুকে ভুলতেও পারেন না। আর এ কথাই উক্ত সিদ্ধবাক্যে বলা হয়েছে।

১৩। নির্দিষ্ট রয়েছে যাহা তোমার কর্মের বিধানে,
তাহাই ভূগিতে হইবে আনন্দিত মনে।

ব্যাখ্যা: প্রত্যেক মহাপুরুষই পৃথিবীতে সর্বজীব ও মানবকল্যাণে বিরাট ভূমিকা রেখে যান। তাঁদের কর্মকান্ড সমূহ কতগুলো বিশেষ বিশেষ আধ্যাত্মিক মতবাদ বা দর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রচারিত হয়েছে যা তাঁদের এবং পন্থীদের কর্মাচরণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উপরোক্ত সিদ্ধবাক্যের সারমর্ম মহাগুরু রমিজের একটি মতবাদ বা দর্শন বিশেষ। তাঁর মতে, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে মানব জীবনে যা কিছু ঘটেছিল, ঘটছে এবং ঘটবে সকলই প্রত্যেকের কর্মফলের ফসল। নিজ নিজ সুখ, দুঃখ, জরামৃত্যু সকলই বর্তমান বা পূর্ব কর্ম দ্বারা নির্ধারিত। ইহা গুরু রমিজের "কর্মবাদ" নীতির-ইঙ্গিত বহন করে। অর্থাৎ **"কর্ম অনুযায়ী ফল"** ইহাই মহাগুরু রমিজের কর্মবাদের মতবাদ। কর্মফলকে কেহই রোধ করতে পারে না এবং পারবে না। সুতরাং, আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটছে তা আনন্দিত মনেই গ্রহণ করতঃ কর্মফল ভোগ করা কল্যাণকর। তার জন্য অন্য কাহাকেও দোষারোপ বা দায়ী করা ঠিক নয়। মানবের সকল কর্মফলই স্রষ্টা দ্বারা নির্ধারিত। স্রষ্টাই মানবের সকল কৃতকর্মের বিচারক। কর্মফলকে গুরু রমিজ স্রষ্টার দয়া হিসেবে উলে- খ করেছেন।

গুরু রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন-

"স্রষ্টার দয়া কর্মফল যে জানে সত্য,
ইচ্ছাকৃত জীবন মরণ সেই ভবে মুক্ত"

উপদেশ-৩ (স্বর্গে আরোহণ)

প্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্যেও কর্ম এবং কর্মফল সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে **"যেমন কর্ম তেমন ফল"**। তা হলে, কর্ম করলে তার একটি ফল পাওয়া যায়। কর্মফল লাভ করাই স্রষ্টার দয়া। কর্মফল পাওয়া আর লাভ করা এক কথা নয়। স্রষ্টা ইচ্ছা করলে কর্মফল ভোগ করার অধিকার দিতে পারেন অথবা নাও দিতে পারেন। যিনি এ সত্যটি বুঝেন এবং অনুভব করতঃ স্রষ্টা ও সদ্‌গুরুর কাছে আজীবন আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে কর্মফল সহজে ভোগ করার কৃপা প্রার্থী হতে পারেন তিনি সারাজীবন কর্মফল ভোগ করার ক্ষমতা লাভ করতে পারেন। তবেই তিনি আনন্দিত মনে বা আনন্দিত চিত্তে কর্মফল ভোগ করতে পারবেন।

১৩নং সিদ্ধবাক্য গুরু রমিজের কর্মবাদ নীতির (Doctrin of action of the Principle of Guru Ramiz) পরিচয় বহন করে। ভক্তগণ এ বাক্যটির মর্মার্থ অনুযায়ী সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে আত্মকর্ম, গুরুকর্ম ও অধ্যাত্ম বিষয়ক কর্ম সম্মত জীবনাচরণ করার জন্য গুরু রমিজ নিম্নোক্ত বহু সংখ্যক ভাবমিশ্রিত গানের ছন্দ রেখে যান। এ ছন্দগুলো রমিজ রচিত তিনটি গ্রন্থের বাণীতে (গানে) লিপিবদ্ধ আছে। কর্ম, কর্মফল ও কর্মাচরণ অর্থাৎ কর্মবাদ সম্বন্ধে ভক্তদেরকে সঠিক ধারণা দেয়ার জন্য গুরু রমিজ বহু বাণী রচনা করেছেন, তন্মধ্যে সুধী পাঠক বৃন্দের বুঝার সুবিধার জন্য নিম্নে মাত্র কয়েকটি বাণী/বাণীর অংশ উদ্ধৃত করা হল।

মন দেখে শুনে কেন আছ ভুলে,
আসা যাওয়া তোর হলনা বন্ধ,
খেটে মরবি ভবের জেলে।

১। আসা যাওয়া জীবের কর্মগতি,
কেহ নয় কার সাথী, ভালমন্দ সব কর্ম ফলে।

২। ----------

৩। ----------

৪। ----------

৫। রমিজ কয় এইসব শোনা কথা, এ কথার নাই আগামাথা
ঠিক করে নেও কর্ম খাতা, মুক্তি পাবে ধরা তলে।

বাণী-০১ (অলৌকিক সুধা)

আসা যাওয়া জীবে সর্বদায়,
কর্ম ফেরে-এ সংসারে,
ঠেকিয়াছ বিসম দায়।

১। চৌরাশি করিও লক্ষ্য, কর্ম সত্য দেখবে স্পষ্ট
জীবের জীবন মহা কষ্ট,বন্দী সবে জেলখানায়।

২। সর্বজীবে বিরাজমান, দেখে নেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ
শোনা কথায় না দিও কান, দেখ যার যে কর্ম খাতায়।

৩। কর্ম জীবের আসলতত্ত্ব, কর্মবলে জীবন মুক্ত
সত্য যাহা হবে ব্যক্ত, বিশ্বাস হবেনা কার কথায়।

৪। রমিজ কয় কর কর্ম তালাশ, আসা যাওয়ার পাবি খালাস
জন্ম মৃত্যু করবিরে পাশ, ভয় পাবিনা চিনা রাস্তায়।

বাণী নং-২ (অলৌকিক সুধা)

আমি বুঝিনা বুঝাব কিসে,
মন্দ করলে হয়রে মন্দ,
ফল ভোগে তার অবশেষে।

১। .....

২। .....

৩। না দেখিয়া মিথ্যা প্রমাণ, হাশরে কাটা যাবে জবান,
পূর্ব কর্মের নাই পরিত্রাণ, পুনঃ জন্ম অন্য বেশে।

৪। রমিজ কয় কর্মফল, এইমাত্র আছে সম্বল
শয়তানে কি দোষী বল, পথহারালি অবিশ্বাসে।

বাণী নং–৪ (অলৌকিক সুধা)

তুমি কর্মে বাঁধা জগৎ জোড়া,
তুমি আমি এক সূতে বাঁধা,

মন দেখে যা তুই এ সংসারে,
বলি তোরে তোর কর্ম ফেরে,
আসা যাওয়া বারে বারে।

১। যার হয়েছে আত্মবোধ, তার হইল কর্মরোধ
হইল সে খোদেখোদ, যখন যা তার ইচ্ছায় করে।

২। আত্মজ্ঞানে হয় নির্বান, এই হইল বিধির বিধান,
কর্মরোধ তার হবে প্রমাণ, নিত্য সংবাদ দিবে যারে।

৩। কর্ম ছাড়া নাহি ধর্ম, কর্ম দিয়া রোধ কর কর্ম,
ডাকা ডাকিতে হয় না ধর্ম, না দেখিয়া ডাক কারে।

৪। রমিজ কয় তার সকল ফাকি, ঠিকানা নাই কারে ডাকি,
সর্বজীবে দেখ সাক্ষী, অনন্ত রূপে বিরাজ করে।

বাণী নং -১৩ (অলৌকিক সুধা)

জায়গা নাই তোর আমি ছাড়া।

১। যার যে কর্মে আসে পুনঃ, কর্মমতে হয় গঠন,
কর্মফল হয় না কর্তন, এই হইল বিধানের ধারা।

২। তুমি বল জগৎ চলে ধর্মে, আমি বলি সব চলে কর্মে,
পাপ পুণ্য যার যে কর্মে, কিছু নাই আর কর্ম ছাড়া।

৩। যদি বল তুমি,"আমি একা", আমি বলি তুমি নিতান্ত বোকা,
আমি বিনে তোর কেথায় যায়গা, বিশ্বাস করবে সব অন্ধ যারা।

৪। রমিজ কয় চাও যদি কর্মের মুক্তি, সর্বজীবে জানাও স্তুতি,
আত্মজ্ঞানে জ্বালাও বাতি, দেখবে তুমি জিতে মরা।

বাণী নং-৭(অলৌকিক সুধা)

দেখলিনা মন বিচার করি,
তোর যেমনি কর্ম তেমনি জন্ম,
ঘটে ঘটে ঘুরাফিরি।

১। আসলি কর্মের পাইতে মুক্তি, প্রাণী হত্যা তোর নিত্যি নিত্যি,
দেখে শুনে কর ডাকাতি, আর কত কর বাহাদুরি।

২। চৌরাশি করিয়া ভ্রমন, পেয়েছ এবার মানব জনম,
জন্ম মৃত্যু কিসে বারন, তালাস কর তারাতারি।

৩। কর্ম দিয়া কর্মমুক্ত, দৈববাণীতে হবে ব্যক্ত,
তোমার মধ্যে যে সেই সত্য, আর কিছু নয় সব ছল চাতুরী।

৪। রমিজ কয় এবার মান প্রবোধ, কর্ম দিয়া জন্ম রোধ
দেখবে নিজে খোদে খোদ, দখল হবে জমের কাচারী।

বাণী নং-১৫(অলৌকিক সুধা)

যার যে কর্ম তার নিজের গড়া,
কেউ জমিদার কেউ ভিক্ষাসার,
পথে পথে কেঁদে সারা।

১। দেখ একবার আজব কারবার, ভোগে জীবে কর্ম যার যার,
কর্ম মতে হল আকার, বিশ্বাস করবেনা অন্ধ যারা।

২। পাঠায় খবর যা হয় যখন, বিশ্বাস হয়না বল স্বপন,
ফলপাইলে তার বুঝ তখন, কতক্ষণ হও আত্ম হারা।

৩। হলি অন্ধ তুই আরো বেঈমান, কেবা দিল খবর করলি না সন্ধান,
নিত্য নিত্য খবর প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবিশ্বসে তোর ডুবল ভরা।

৪। রমিজ কয় আছে মনিপুর থানা, আত্মজ্ঞানে তাঁর কর ঠিকানা,
পূর্ব কর্ম জীবের যাইবে জানা, দেখবে কি আছে বিধানের ধারা।

বাণী নং- ৭৮ (অলৌকিক সুধা)

ঠেকলি মন তুই ভবমাঝে আসিয়া,
দেখনা চাইয়া দিন যায় গইয়া কে রাখবে আর ধরিয়া।

১। মনরে বুঝলি না বুঝাইলাম যত, কারো কথায় হলিনা রত,
বদল হবে নিজ সুরত, মানব জনম বাদ দিয়া
বলি তোরে বারে বারে আসবি যাবি দুনিয়া।

২। মনরে আসলি ভবে প্রতিশ্রুতে, কর্ম করবি দিনে রাতে,
তরী ডুবালি নিজ ইচ্ছাতে, বিধির বিধান বাধ দিয়া
যুগে যুগে রাখি সংগে, কেন গেলে ভুলিয়া।

৩। মনরে পাপে বোঝাই ছিল তরী, পাড়ি দিলাম তারাতাড়ি,
ঘাটে এসে ডুবল তরী, রাখতে নারি ধরিয়া
রমিজ বলে কর্ম ফলে, ঘটে ঘটে যাবি চলিয়া।

বাণী নং- ১৩ (স্বর্গের সুধা)

শোনরে কোথায় যাবি বলনা
আছ ভুলে মায়াজালে ভেবে দেখলিনা।

মনরে তুই হোসনে বেইমান,
ধর্ম কর্ম কোনটি সত্য, জানিয়া তুই রাখিস ইমান।

১। ধর্মে আছে মন্ত্রেভরা, প্রাণী বধের এই এক ধারা
পাপ পূণ্য হয় কর্মের দ্বারা, সে কর্মের আর নাই পরিত্রাণ।

২। ....., ...

৩। ....., ...

বাণী নং- ০১ (স্বর্গের সুধা)

১। ....., ...

২। ....., ...

৩। রমিজ বলে মান কর্ম, কর্ম মতে যার যে জন্ম
বুঝে নেও তারি মর্ম কোথায় ঠিকানা।

বাণী নং- ৩২ (স্বর্গের সুধা)

ওরে রঙ্গিলা গাঙ্গের নাইয়া,
কতকাল চালাবি নৌকা, রঙ্গের বাদাম দিয়া।

১। ....., ...

২। ....., ...

৩। রমিজ বলে তাল বেতালে তোর নৌকা চলি- বাইয়া,
কর্ম ফেরে ভব সাগরে বেড়াবি ঘুড়িয়া।

বাণী নং ১৭৮ (স্বর্গে সুধা)

মা তুমি দিওনা ফেলে,
তোমার চরণে এই প্রার্থনা দয়া করে নেওগো কোলে।

১। মাগো আমার কর্মের ধারা, সুখ নাই ভবে দুঃখ ছাড়া
পথ পাবনা তুমি ছাড়া, কে আছে আর ধরা তলে।

২। ....., ...

৩। ....., ...

বাণী নং ০৮ (স্বর্গে আরোহণ)

কি যন্ত্রণা এ সংসারে,
ভুলতে চাই ভুলতে পারিনা ঠেকিয়াছি মায়া ফেরে।

১। ..... , ...

২। ..... , ...

৩। রমিজ বলে কর্মফলে, আসা যাওয়া ধরা তলে,
রাখ মাগো চরণ তলে, কর্মের মুক্তি দেও আমারে।

বাণী নং -১০ (স্বর্গে আরোহণ)

মাগো এবার কর বিচার,

আর আমি বুঝাব কত
ইচ্ছা করে করিলে পাপ খেটে মরবি অবিরত।

১। থাকতে চওনা আসল পথে, ঘুরে বেড়াও নিজের মতে,
যাবে কিন্তু খালি হাতে, চেয়ে দেখ দিন হল গত।

২। দেখে শুনে হলি কানা, কর্মফল তোর সকল জানা,
কর্মফল কাটা যাবে না, পারিনা করিতে ব্যক্ত।

৩। রমিজ বলে বলব কি আর, কর্ম মতে যার যে বিচার
সৃষ্টি জীব যত প্রকার কারো ফাঁসি কেও মুক্ত। -বাণী নং -২৭ (স্বর্গে আরোহণ)

চেয়ে দেখ আর নাই বাকী,
কত কাল দিবি ফাঁকি।

১। ..... ২। .....

৩। রমিজ কয় দেও দাসখত, সকল কর্মের পাবি মুক্ত
সত্য যাহা হবে ব্যক্ত, দেখ তোর হৃদয়ে থাকি। -বাণী নং–৫১ (স্বর্গে আরোহণ)

কেমনে তুই কাল যমুনা হবি পার
পারের সম্বল নাই তোর হাতে আসবি যাবি বারেবার।

১। কাল নদীর স্রোতের টান, বাচবেনারে কারো প্রাণ

কেটে দেওগো মায়ার বাঁধন জানাইগো চরণে তোমার।

১। মা তুমি থাক অন্তরে, জান তুমি যে যা করে,
জানইব চরণ ধরে, মিথ্যার সঙ্গে ছিন্ন গো আমার।

২। প্রবঞ্চনা বিধান বিরোধি–, অসৎ কর্ম মিথ্যাবাদী,
তারা মহা অপরাধী, শান্তি ভবে দিওনা কার।

৩। রমিজ বলে সব গোপন, জান তুমি কে কার আপন
কেটে দেওগো কর্মের বন্ধন, পুরা কর বাসনা তার।

বাণী নং ১৩ (স্বর্গে আরোহণ)

রাজা প্রজা সকল সমান, কর্ম মতে হয় বিচার।
দিলে পাড়ি আসবি ফিরি, কোথায় যায়গা নাইরে তোর।

২। .....,৩।..... -বাণী নং–৫৬ (স্বর্গে আরোহণ)

উপায় কি করবি বল,
সদায় পরবে চোখের জল।

১। উপায় নাই তোর পৃথিবীতে, আসা যাওয়া কর্ম মতে
লুটিবে মাল তস্করেতে, খাটবেনা কোন কৌশল।

২। থাকবেনা তোর বাহাদুরি, যত করলি ছলচাতুরি,
শহর বাজারে আহাজারি, হারা হবি সব সম্বল।

৩। রমিজ বলে গুরুর চরণ, সব সময় যে করে স্মরণ,
তার কাছে যায়না সমন, কর্ম মতে পায়সে ফল। -বাণী নং- ২২৩ (স্বর্গে আরোহণ)

১৪। সৎগুরুর শ্রীচরণ লইলে স্মরণ,
তাহা হইলে কর্মের কিছু হইবে কর্তন।

ব্যাখ্যা: গুরু রমিজের কর্মবাদ নীতি (Doctrin of action of the priniple of Guru Ramiz) বা মতবাদ অনুসারে কর্ম অনুযায়ী ফল পাওয়া যায়। সৎকর্ম অনুশীলন করে মন্দ কর্ম ফলের কিছুটা রোধ করা যেতে পারে।

উলি- খিত ১৪নং সিদ্ধবাক্যে সদ্‌গুরুর শ্রীচরণ বলতে তাঁর বিধান বা মতবাদের কথাই উলে- খ করা হয়েছে। সদ্‌গুরুর বিধান মতে পরম ভক্তগণ গুরুর প্রতি নতশিরে কর্ম করলে এবং সর্বদা গুরুর প্রতি বিনয়ী, নম্রতা, আজিজি, ভদ্রতা, আশ্রয় দাতা, মুক্তিদাতা ইত্যাদি হৃদয় নিংড়ানো ভাব বজায় রেখে তাঁর প্রতি দাসত্ববোধ সৃষ্টি করতঃ কর্মাচরণ করলে কর্ম ফলের কিছুটা মাত্র কর্তন করতে পারে। উক্ত বাক্যে এমনি একটি আশ্বাস দেয়া হয়েছে মাত্র। ভক্তের সৎকর্ম এবং আমিত্বকে বিসর্জন ব্যতীত, গুরু ইচ্ছা করলেই তার সকল মন্দ কর্মফল কর্তন করতে পারবেন- এমনটি নয়।

১৫। জীবে দয়া আত্মদান করে যেইজন,
তার প্রতি সন্তুষ্ট প্রভু থাকেন সর্বক্ষণ।

ব্যাখ্যা: গুরু রমিজের নীতির প্রধান ১০টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সর্ব প্রথম হলো- স্রষ্টা এক এবং সর্বজীবে বিরাজমান। অর্থাৎ সকল জীবের মধ্যেই স্রষ্টা সর্বত্র সর্বদা বিরাজিত। মানুষ সর্বজীবের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। মানবের আত্মা ও অন্যান্য প্রাণীর আত্মা একই জিনিস বা একই আত্মা। আত্মা হচ্ছে প্রাণীর দেহে (মানব ও অন্যান্য জীবসহ) ব্যাপৃত চৈতন্যময় সত্বা যাহা সর্বস্তরেই এক এবং অভিন্ন।

আমরা আমাদের চারদিকে যে সমস্ত প্রাণী বা জীব কিংবা ইতর প্রাণী দেখতেছি ইহারাও পূর্ব জন্মে মানব ছিল। ইহারা তখন সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানবাকারে থেকেও মানবতার কাজ কর্ম না করে ইতর প্রাণী সুলভ কাজ কর্ম করেছে। তাই, তারা গুরু রমিজ বিবৃত জন্মান্তরবাদ অনুযায়ী বর্তমান জন্মে পশু বা নিম্নস্তরের ইতর প্রাণীর দেহে দেহান্তরিত হয়ে কর্ম অনুযায়ী জন্মগ্রহণ করেছে।

তাই মানবাত্মা এবং সর্বজীবের আত্মা একই আত্মা। স্রষ্টা সর্বজীবে বিরাজমান। সর্বজীবকে দয়া করা মানেই স্রষ্টাকে দয়া করা। জীবের প্রাণ ও আত্মাকে নিজের প্রাণ বা আত্মার সমান মনে করতঃ সর্বজীবকে সম অধিকার দান করা ও নিজের প্রাণের বিনিময়ে অন্যান্য জীবের প্রাণকে রক্ষা করার নামই জীবে দয়া আত্মদান।

আবার সদ্‌গুরু ও স্রষ্টার নিকট আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে আত্মসমর্পণ করাই হচ্ছে আত্মদান করা। সুতরাং যিনি সর্বদা জীবে দয়া আত্মদান করেন প্রভুও (স্রষ্টা) তাকে দয়া করেন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

আত্মদানের আরেক অর্থ সর্বজীবের সাথে প্রেম করা। আর সর্ব জীবের সাথে প্রেম করা মানেই স্রষ্টার সাথে প্রেম করা।

সে জন্যেই গুরু রমিজ তাঁর আরেক আপ্তবাক্যে বলেছেন-

"কর্মফল বিশ্বমাঝে যদি হয় সত্য,
জীবে দয়া না থাকিলে কেহ নয় মুক্ত"

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন-

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুজেছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেইজন,
সেজন সেবিছে ঈশ্বর"

স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির মাঝেই বিদ্যমান আছেন। তাঁকে আলাদাভাবে কোথাও তালাশ না করে, সৃষ্টির মাঝেই সর্ব সৃষ্ট এবং সর্বজীবের ভালবাসাতেই পাওয়া যাবে। পরম আত্মাই স্রষ্টার আবাসস্থল। নিজের জীবত্ব বোধকে পরিহার করতঃ পরমত্ববোধ সৃষ্টি করলে পরমের সন্ধান পাওয়া যাবে।

১৬। উপাসনা কর কার বল অভিপ্রায়,
যাহার তালাশ কর ঠিকানা কোথায়।

ব্যাখ্যা: এই উপদেশ বাক্যে আমরা যার উপাসনা করছি তাঁর ঠিকানা কোথায় এবং তিনি কে এই প্রশ্নই করা হচ্ছে।

এ পৃথিবীতে সবাই স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করার জন্যই বিভিন্ন মত ও পথে উপাসনা করে আসছেন এবং তাঁর তালাশ করছেন। উক্ত বাক্যে স্রষ্টা কোথায়, কিভাবে কি অবস্থায় বিরাজ করছেন তার ঠিকানা জানার ইচ্ছা, অভিপ্রায় বা মত প্রকাশ করার জন্য বলা হয়েছে।

স্রষ্টাকে জানা ও চিনার জন্যই গুরু রমিজ এ কথা বলেছেন। কারণ, স্রষ্টাকে না চিনে অন্ধভাবে উপাসনা করার কোন ফল আসতে পারেনা। স্রষ্টাকে না চিনে উপাসনা করা বা তাঁরে ডাকা আর অন্ধের হাতী দেখা একই কথা।

রমিজ ছাড়াও অনেক মহামানব স্রষ্টাকে প্রথমত চিনা ও জানার জন্য তাগিদ দিয়েছেন।

১৭। ঠিকানা জানিয়া তাঁর কর উপাসনা,
নতুবা হবেনা পূরণ তোমার বাসনা।

ব্যাখ্যা: এখানেও গুরু রমিজ বলছেন যে, স্রষ্টার উপাসনা করতে হলে তাঁর ঠিকানা বা অবস্থান জানিয়া নেয়া বিশেষ প্রয়োজন।

উলে- খ্য যে, স্রষ্টার ঠিকানা বা তিনি কোথায় কিভাবে বিরাজ করছেন তা জানা মানেই স্রষ্টাকে চিনা।
স্রষ্টাকে না চিনে তাঁর উপাসনা করার কোন ফল পাওয়া যাবেনা এবং উপাসকের কোন বাসনা বা ইচ্ছা পূরণ হবেনা।

১৮। সাকার কি নিরাকার দেখ চিন্তা করে,
বিশ্বব্যাপি বিরাজ করে প্রতি ঘরে ঘরে।

ব্যাখ্যা: এখানে গুরু রমিজ স্রষ্টার আকার ও রূপ সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। স্রষ্টার আকার আছে কি নাই এ সম্বন্ধে চিন্তা করার জন্য ভাবুক ভক্তদের উপদেশ দিয়েছেন।

স্রষ্টা আকারে না নিরাকারে আছেন তা নিয়ে সৃষ্টির আদি হতেই বিষয়টির পক্ষে বিপক্ষে বহুমত বহুপথ সৃষ্টি হয়েছে। স্রষ্টাকে আকার নিরাকার উভয় ভাবেই মানবজাতি উপাসনা করে আসছেন। এ বিষয়টির চূড়ান্ত মিমাংসা ভাবুক ও চিন্তাবিদদের অনুভূতি, ধারণা ও ধ্যানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

তবে তিনি (স্রষ্টা) সর্বময় বিশ্বব্যাপি, প্রতি ঘরে ঘরে মানে প্রতি জীবে বা সর্বজীবে, সর্বভূতে, সর্বত্র অনন্ত কালের জন্য বিরাজমান অবস্থায় আছেন এ কথায় সকল মহামানব একমত পোষণ করেন। গুরু রমিজও এ মতে বিশ্বাসী।

বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সর্বজীব ও সকল সৃষ্টিকে ভালবাসলেই স্রষ্টাকে ভালবাসা হল- ইহাই গুরু রমিজের নীতির মূল বিষয়বস্তু।

১৯। নিরাকার অর্থ কি সবাকে জানাই,
যাহার চেহারার সাথে অন্যের মিল নাই।

ব্যাখ্যা: এই সিদ্ধবাক্যের মর্ম মতে গুরু রমিজ তাঁর ভক্তদের নিকট স্রষ্টার নিরাকার অবস্থার যুক্তি সহকারে একটি জ্ঞানগর্ভ বিশে- ষণ দিয়েছেন। তাঁর মতে পৃথিবীতে একজন মানুষের চেহারা অন্য কোন লোকের চেহারার সাথে হুবহু কোন মিল পাওয়া যায় না। প্রত্যেকটি লোকই বেমিছাল চেহারা নিয়ে বিচরণ করছে। যেমন একজনের নাম আবুল কাসেম। পৃথিবীতে হয়তোবা আর একজন বা অনেকজন আবুল কাসেম নামের লোক আছে। কিন্তু প্রথম আবুল কাসেমের চেহারার সাথে হুবহু মিল আছে এমন আবুল কাসেম আর একজনও নাই। সে অদ্বিতীয় আবুল কাসেম এবং বিশিষ্ট অদ্বিতীয় আবুল কাসেম। এরূপ প্রত্যেকটি মানুষই বিশিষ্ট অদ্বিতীয় অর্থাৎ বিশেষভাবে

একক বা অদ্বিতীয়। তাহলে স্রষ্টা একই চেহারার হুবহু আর একজন সৃষ্টি করেন নাই। এ বিশ্বে একই রকম আর একজনও দেখানো যাবেনা। তাহলে একজনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ আর একজনও দেখানো যায় না। একজনের দৃষ্টান্ত সে নিজেই। অর্থাৎ, এভাবে যাহাকে পৃথিবীতে আর দেখানো যায় না ইহাই নিরাকার। এ রকম প্রতিটি জীব বা প্রাণীই নিরাকার। এভাবেই স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির মাঝে বেমিছাল রূপ ধারণ করে উপরোলি- খিত ভাবে নিরাকার হয়ে অনন্তে মিশে আছেন।

২০। একের সংগে আরেকের তুলনা না হবে
বেমিছাল ভাবে তিনি আছেন প্রতি জীবে।

ব্যাখ্যা: এখানে গুর" রমিজ মানুষের একজনকে অন্য একজনের সাথে তুলনা করলে কোন দিক দিয়েই সমতুল্য করা যায় না। একে আরেকের সাথে তুলনাবিহীন হয়ে পরে। একজন আরেকজনের সাথে সদৃশ হয়না। বেমিছাল প্রমাণিত হয়। একজনের রূপ এবং গুণাবলী আরেকজনের রূপ ও গুণাবলীর সঙ্গে মিল পাওয়া যায় না। ইহাই স্রষ্টার সৃষ্টি-কৌশল। স্রষ্টা প্রতিটি জীবেই বেমিছালভাবে নিরাকার হয়ে সৃষ্টির মাঝে বিদ্যমান আছেন।

২১। প্রতি ঘটে আছেন যদি বলে সব লোকে,
সুখ-দুঃখ জরা-মৃত্যু সকলই সে ভোগে।

ব্যাখ্যা: এখানে গুর" রমিজ স্রষ্টা সর্বজীবে বিরাজিত অবস্থায় তাঁর ভোগ সম্বন্ধে বিবৃতি দিয়েছেন। ঘট মানে পাত্র, দেহ, মূর্তি বা আঁধার। স্রষ্টার বাসস্থান হচ্ছে মানবের হৃদয় (ক্বাল্‌ব)। প্রতি ঘটে মানে প্রতিটি মানুষের মধ্যে। প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে (ক্বাল্‌বে) স্রষ্টা বাস করছেন। ইহা সর্বজন স্বীকৃত সত্য।

উপরোক্ত সিদ্ধবাক্যে একথা বলা হয়েছে যে, স্রষ্টা যেহেতু মানবের মধ্যে অবস্থান করছে সেহেতু মানবাকারে তিনিই সুখ-দুঃখ, জরা-মৃত্যু সকল কিছুই ভোগছেন। তেমনিভাবে সৃষ্টির স্রষ্টাও সকল প্রাণীর মধ্যে বিরাজমান হয়ে সব কিছু ভোগছেন। ইহা স্রষ্টার একটি লীলা বিশেষ।

২২। স্ত্রী পুত্র আছে তাঁর আহার বিহার
নিত্যানন্দে দিন কাটায় বুঝা উঠা ভার।

ব্যাখ্যা: স্রষ্টা সর্বজীবে বিরাজমান। সকল প্রাণীই বংশ বিস্তার বা প্রজননে অংশ নেয়। তাহলে স্রষ্টাও সর্বজীবে বিরাজিত হয়ে প্রজননে অংশ নিচ্ছেন। অতএব, তাঁর স্ত্রী পুত্র সবই আছে। তাঁহার আহার বিহার সবই আছে।

ইসলাম ধর্ম মতে স্রষ্টা মানবের দিলে (ক্বাল্‌বে) অবস্থান করেন।

মহান আল- াহ্ পবিত্র কোর-আনে ঘোষণা করেন-

"আমি তোমাদের দিলে (ক্বাল্‌বে) অবস্থান করি, তোমরা কি দেখনা ?"

(সূরা জারিয়াত, ২১ আয়াত)

সনাতন ধর্ম মতে **"নর র"পে নারায়ণ"**। আবার **''যথা জীব তথা শিব"** তাও বলা হয়।

ঈসাই ধর্ম/খৃষ্টান ধর্ম মতে তো- ঈসা (আঃ) স্রষ্টার পুত্র। তাই গুরু রমিজ বলেছেন যে, স্রষ্টার স্ত্রী পুত্র আহার বিহার সবই আছে। সকল জীবে থেকেই তিনি নিত্যানন্দে দিন কাটাচ্ছেন। কারণ, মানব এবং অন্যান্য প্রাণী দেহ নিয়ে বহুরূপীভাবে পৃথিবী নামক খেলার মাঠে আনন্দ চিত্তে সর্বদা খেলছে। সাধারণ কথায় আমরা এই খেলাকে আল-াহ্‌র লীলা বলে থাকি।

এই লীলা সম্বন্ধে লালন বলেছেন-

"আল-াহ্ কে বুঝে তোমার অপার লীলে,
তুমি আপনি আল-াহ্, ডাক আল-াহ্ বলে"

এখানে, আল-াহ্ (স্রষ্টা) মানবের ক্বাল্‌বে (হৃদয়ে) সর্বদা অবস্থান করতঃ তিনি নিজেই নিজকে ডাকাডাকি (আরাধনা) করছেন। ইহা তাঁর এক সীমাহীন (অপার) লীলা বা খেলা বিশেষ। মহা গুরু রমিজের উক্ত আপ্তবাক্য লালনের কথার সাথে যেমন মিল পাওয়া যায় তেমনি হাদীসে কুদ্‌সীতেও হুবহু মিল পাওয়া যায়। এ হাদীসে মানুষের সাথে আল-াহ্‌র সম্পর্ক ও মমত্ববোধের বিষয়ে তিনি নিজেই এরশাদ করেন-

"মানুষ আমার রহস্য আর আমি মানুষের রহস্য"

[বিঃ দ্রঃ *রহস্য-> দূর্বোধ্য গুপ্ত তথ্য*]।

২৩। আমি সুখি, আমি দুঃখী আমাতে সে আছে,
আমার আহারে তাঁর আহার নইলে কেমনে বাঁচে।

ব্যাখ্যাঃ স্রষ্টা পরম আত্মা। মহাগুরু রমিজও সকল প্রকার কলুসতা দূর করেছেন, জীবত্ববোধকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেছেন, সর্বজীব ও সর্ব সৃষ্টিকে ভালবেসে নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হয়ে আমিত্বকে বর্জন করতঃ পরমের (স্রষ্টার) সাথে বিলীন বা লয় হয়ে গেছেন।

স্রষ্টার আহার হচ্ছে আত্মজগতের আহার তাই মহাগুরু রমিজের আত্মিক আহার স্রষ্টার আহারে পরিণত হয়েছে এই আহার বস্তু জগতের আহার নয় ইহা নিত্যান্তই আত্ম জগতের আহার।

২৪। সর্বস্থানে আছেন তিনি যদি কর মনে,
জানিয়া সত্যের সন্ধান বধিবা কেমনে।

ব্যাখ্যাঃ সর্বধর্ম, সর্বমত, সর্বপথ, সর্বশাস্ত্র এবং বিবেকবান মণিষীদের বিবেক শাস্ত্র অনুযায়ী স্রষ্টা সর্বজীবে, সর্বভূতে, সর্বক্ষণ বিরাজিত। যারা এ কথা সত্য বলে উপলব্ধি করেছেন ও সাধনার মাধ্যমে আত্ম জগত বা আধ্যাত্মিক জগতের সন্ধান লাভ করেছেন তাঁরা কোন সময়ই এ সত্যকে অস্বীকার করতে পারবেন না। সত্য সত্যই সত্য কোন সময়ই মিথ্যায় পর্যবসিত হয় না এবং হতে পারে না।

২৫। গুরুর নিকটে যার সর্বস্ব অর্পণ,
গুরু ভিন্ন অন্য কিছু জানেনা যে জন।

২৬। তার মধ্যে ছয় রিপু হবে বিসর্জন,
ইহার নাম সত্য কোরবান রাখিও স্মরণ।

২৭। *তখনই স্রষ্টার স্থান হৃদয়ে হইবে,*
তোমার ইচ্ছাতে তার ইচ্ছা পূরণ করিবে।

২৮। *হইবে তোমার মধ্যে ইচ্ছাময়ের স্থান,*
নিজ ইচ্ছাতে হবে কাজ দেখিবে প্রমাণ।

২৯। *তোমার ইচ্ছাতে তাঁর ইচ্ছা হৃদয়ে তাঁর স্থান,*
তোমার মুখ তাঁর মুখ প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

৩০। *তুমি যাহা বল তাহা রদ না হইবে,*
ভূত ভবিষ্যত সব জানিতে পারিবে।

(**বিশেষ দ্রষ্টব্য**- আপ্তবাক্য- ২৫-৩০ পর্যন্ত একটির মর্মার্থ পরবর্তীটির মর্মার্থের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই, ইহাদের ব্যাখ্যা আলাদাভাবে না লিখে একত্রে লিখা হয়েছে)।

ব্যাখ্যা: এ সিদ্ধ বাক্যগুলোর প্রথমটিতে সৎগুরুর নিকট সর্বস্ব অর্পণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। অপর সিদ্ধ বাক্যগুলোতে সর্বস্ব অর্পণ করার পর পরম ভক্ত অধ্যাত্ম বিষয়ের কি ফলাফল পাবে তাই বিশদভাবে উলে- খ করা হয়েছে।

এখন, সর্বস্ব অর্পণ বলতে একজন ভক্ত তার সারাজীবনে রমিজ বর্ণিত **১১** ধারার পাপ ও ষড়রিপু জনিত পাপ সদ্গুরুর নিকট অকুণ্ঠ চিত্তে প্রকাশ করতঃ তাঁর আমিত্বকে বিসর্জন দেয়াকে বুঝায়।

অতঃপর সদ্গুরু ভক্তের সকল প্রকার পাপ অবগত হয়ে রমিজ বিধান অনুযায়ী ভক্তকে সৎকর্ম করার আদেশ দিবেন এবং সকল নিষিদ্ধ ও অবৈধ কর্ম হতে বিরত রাখার সুব্যবস্থা করবেন।

এমন অবস্থায় পরম ভক্ত গুরু ভিন্ন অন্য কাহারো স্মরণাপন্ন হতে পারেন না এবং হয় না। তখন আত্মিক জগতে পরম ভক্তের এমন একটি মূহুর্ত এসে যায় যে, তিনি তখন গুরুর আদেশ রক্ষা করতে যদি স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলকেও ছাড়তে হয় তাই তিনি করবেন। মনে রাখতে হবে যে, ইহাই একজন পরম ভক্তের লক্ষণ।

পরম ভক্ত সম্বন্ধে গুরু রমিজ বলেছেন-

"গুরুর সম্পর্কের সাথে সম্পর্ক নাই ভবে,
সবার সংগের সম্পর্ক তোমার ত্যাগ করিতে হবে"

উক্ত মন-মানসিকতা নিয়ে যখন একজন ভক্ত সদ্গুরুর নিকট উলে- খিত সর্বস্ব অর্পণ করে তখন তাঁর মধ্য হতে আপনাআপনি ষড়রিপু বিসর্জন হয়ে যায়। কোন রিপুই এ অবস্থায় ভক্তকে স্পর্শ করতে পারে না। ইহাই মানব জীবনে ***"প্রকৃত কোরবান"***।

রমিজের কথায় ষড়রিপু এবং ইন্দ্রিয়াদির আকর্ষণ জনিত অনৈতিক বিষয় সমূহকে বিসর্জন দেওয়াকেই ***"কোরবান"*** বলা হয় এবং ইহাই মানব জীবনে সত্য কোরবান।

ভক্তের উপরোক্ত কোরবান স্রষ্টার নিকট গৃহীত হলে তিনি তখন পরম ভক্তের মহান হৃদয়ে স্থান করে নেন। এমন অবস্থায় ভক্তের সকল সৎ ইচ্ছাই স্রষ্টা দয়া পরবশ হয়ে পূরণ করে থাকেন।

মহাগুরু রমিজ আরও বলেন-

উক্ত অবস্থায় ভক্তের হৃদয়ে (ক্বালবে) ইচ্ছাময় রূপী স্রষ্টার স্থান হবে এবং ভক্তের নিজ ইচ্ছাতে সকল আধ্যাত্মিক কাজ সমাধা হবে। এর প্রমাণ ভক্ত নিজেই পাবেন।

গুর" রমিজ আরো বলেছেন যে, ভক্তের ইচ্ছাতে স্রষ্টার ইচ্ছা হয়ে যাবে। তার মানে ভগবান ভক্তের অধীন হয়ে যাবে। ভক্তের মুখ ও জবান স্রষ্টার মুখ ও জবান হয়ে যাবে। এই অবস্থা আধ্যাত্মিকভাবে বা মারফতের অত্যন্ত উচ্চস্তরের অবস্থা। তখন সদ্‌গুর"র কৃপায় ভক্ত স্রষ্টার সাথে অনন্তে মিশে যায়।

উলে- খ্য যে, স্রষ্টার সাথে অনন্তে বিলীন হয়ে যাওয়া বা অনন্তে লয় হয়ে যাবার চারটি স্তর অতিক্রম করতে হয়।

শাস্ত্রে আছে- ১। ফানাফিস শেখ
২। ফানাফির রাসূল
৩। ফানাফিল- াহ্ ও
৪। বাকাবিল- াহ্।

অর্থাৎ- ১। গুর"তে বিলীন হও
২। রাসূলে বিলীন হও
৩। আল- াহ্‌তে বিলীন হও এবং
৪। তাঁর (আল- াহ্‌র) জাতের সঙ্গে মিশিয়া যাও।

এভাবে গুর"র আদেশে ও কৃপায় ভক্ত আধ্যাত্মিক জগতের ৪র্থ স্তরে বা মারফতের শেষ স্তরে স্রষ্টার জাতের সঙ্গে মিশে যায়। এ অবস্থায় পরম ভক্তের হাত স্রষ্টার হাত হয়ে যায়, ভক্তের পা স্রষ্টার পা হয়ে যায়, ভক্তের চক্ষু স্রষ্টার চক্ষু হয়ে যায়, ভক্তের মুখ ও জবান স্রষ্টার মুখ ও জবান হয়ে যায় এবং ভক্তের সর্বাঙ্গ স্রষ্টার সর্বাঙ্গ হয়ে যায়।

ভক্ত তাঁর ধ্যান, ধারণা, স্বপ্ন, এলহাম ও কাশ্‌ফ এর মাধ্যমে সব কিছুরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পায়। ভক্ত যাহা বলবে তাহা কোনদিন রদ হবেনা। তিনি এ অবস্থায় আধ্যাত্মিক দর্শনের দার্শনিক হয়ে যান। এ দর্শনের মাধ্যমে তিনি ভুত ভবিষ্যৎ সবই বলতে পারেন।

৩১। রোগী কি ঋষি কিংবা যদি হয় রাজন,
খালি হাতে তাদের কাছে না যাইও কখন।

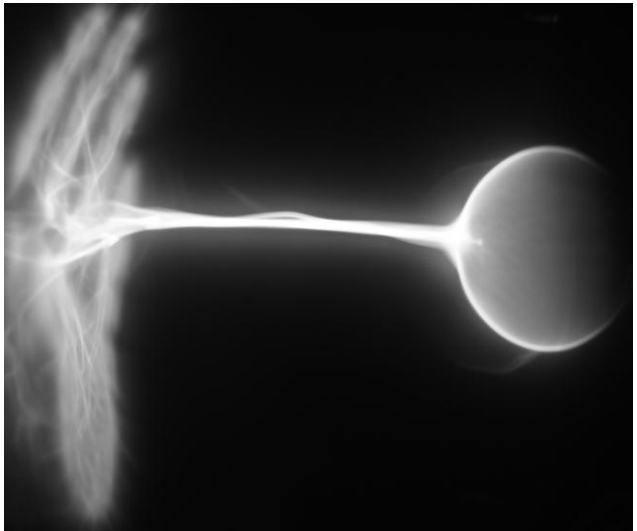

ব্যাখ্যা: এই সিদ্ধবাক্যে মহাগুর" রমিজ একটি অতিমূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। মানুষের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা পছন্দনীয় কোন লোক রোগে আক্রান্ত হলে অনেকেই তাদের দেখতে যায়। ইহাতে রোগী মানসিক শান্তি পায়। অনেকে প্রয়োজনে রোগীকে আর্থিক সাহায্য সহায়তা দিয়ে থাকেন।

গুর" রমিজ এ জাতীয় রোগী, আত্মীয়-স্বজন, গরীব, বন্ধু-বান্ধব, কিংবা প্রতিবেশীও যদি হয় তাকে সেবা করার জন্য সাধ্য মতে সবই করার জন্য জর"রী ঘোষণা করেছেন। ভক্তগণ এ জাতীয় কর্মে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে।

যাহারা আধ্যাত্মিক মন মানসিকতার লোক তাহারা এ জাতীয় কর্ম করবেন ইহা রমিজের আদেশ।

উলে- খ্য যে, রোগী যদি অলি, ঋষি, মুণি, রাজা-বাদ্‌শা বা তদস্থানীয় কোন লোক হয় তবে তাদের জন্য, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের নিমিত্তে, কিছু খাদ্যদ্রব্য বা তবার"ক (বরকত পূর্ণ খাদ্য) নিয়ে হাজির হতে

হবে। কেননা তবারক রাজা-বাদ্শা, আমীর সওদাগর, শিল্পপতি ইত্যাদি ব্যক্তিগণ সবাই গ্রহণ করতে পারেন।

কোন মতেই রোগী কিংবা রাজন যেই হোক তাদের কাছে খালি হাতে হাজির হওয়া উচিৎ নয় ইহা মহাগুরু রমিজের একটি বিশেষ আদেশ ও বিধান।

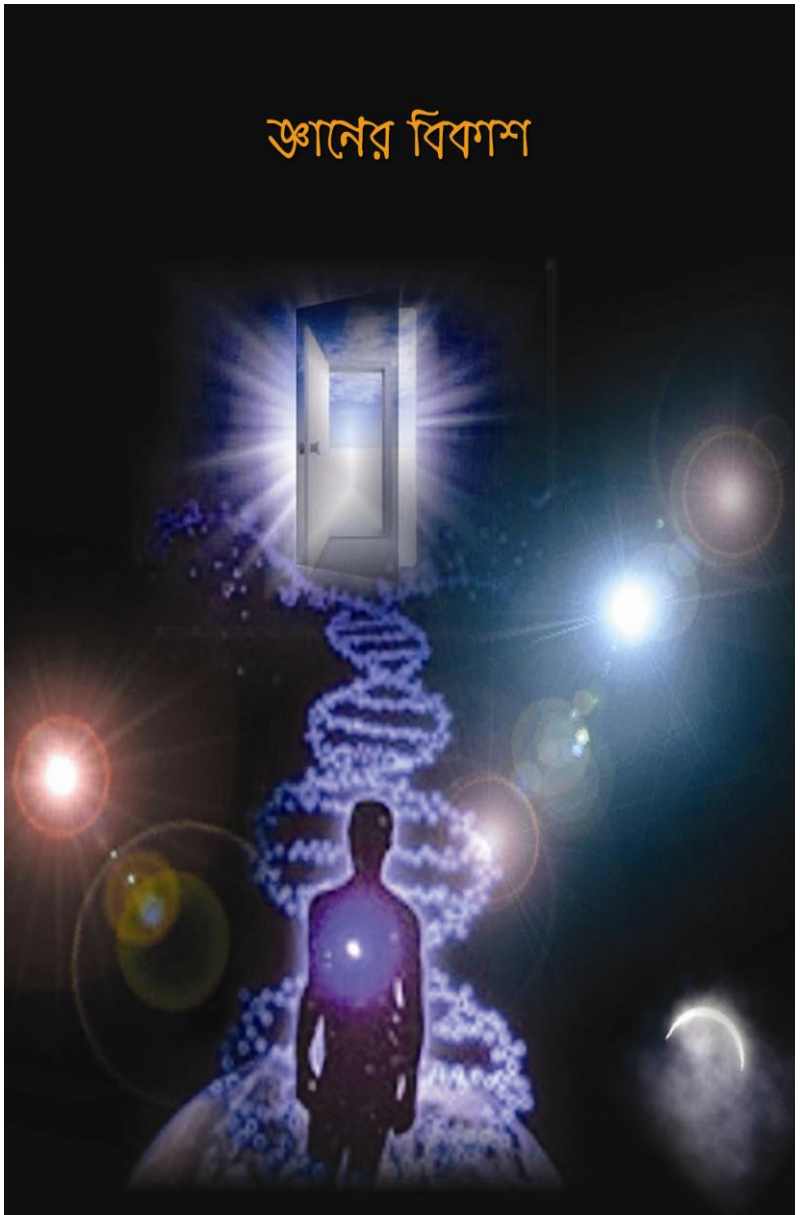

'স্বর্গে আরোহণ ও সত্যে পরিণত' পুস্তকে লিখিত আদেশ ও উপদেশ (বিধান) সমূহের শিরোনাম ও ব্যাখ্যা

শিরোনাম- জ্ঞানের বিকাশ :

ব্যাখ্যা : মহাগুরু রমিজ প্রণীত ১। *অলৌকিক সুধা ও সত্যের অনুসন্ধান*

২। *স্বর্গের সুধা ও সত্যের সন্ধান*

-এ পুস্তকদ্বয়ের শিরোনামগুলি যথাক্রমে-

(ক) আত্মতত্ত্বজ্ঞান ও জ্ঞানের জ্যোতি

(খ) গুরুতত্ত্ব ও গুরুতে অর্পণ

-এর বিশে- ষণ এবং ইহাদের অন্তর্ভুক্ত আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমুহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশে- ষণ এ পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। বিশেষ করে আত্মতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, ভাব ও প্রেমতত্ত্ব ইত্যাদি এ পুস্তকে স্থান পেয়েছে।

গুরু রমিজ ভক্তদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্মেষ ঘটানোর নিমিত্তেই অতি সহজ ও সরল ভাষায় বিভিন্ন তত্ত্বমুলক উপদেশ ও আদেশাবলী (রমিজ বিধান) রচনা করেছেন।

উক্ত তত্ত্বসমুহের বিস্তারিত বিশে- ষণ যারা পড়েছেন এবং তত্ত্বগুলোর কথাসমুহ (বিধানগুলো) নিজের মন ও মননে এবং জীবন ও জীবনাচরনে হুবহু কাজে-কর্মে লাগিয়েছেন তাদের অর্জিত জ্ঞানের বিকাশ (উন্মেষ) সম্বন্ধেই রমিজ পরিশেষে 'স্বর্গে আরোহণ ও সত্যে পরিণত' পুস্তকখানি প্রণয়ন করত: উক্ত পুস্তকে মানুষ জন্ম নেয়ার পূর্বে কোথায় ছিলো আবার মৃত্যুর পর কোথায় যাবে এ সম্বন্ধে যুক্তি সহকারে এক অভিনব আধ্যাত্মিক দর্শন এবং অধ্যাত্ম বিষয়ক মতবাদ প্রণয়ন করেছেন। ইহাতে পার্থিব মানব জীবন অতিক্রম করার পর অপার্থিব

মানব জীবন সম্বন্ধে যুক্তি ও উপমা সহকারে বিশেষ জ্ঞান অর্জনের বিষয়াবলী স্পষ্টভাবে উলে- খ করেছেন।

তাই তাঁর প্রণীত *"স্বর্গে আরোহণ ও সত্যে পরিণত"* পুস্ড়কে শিরোনাম হয়েছে *"জ্ঞানের বিকাশ"*। এ জ্ঞান সাধারণ জগতের নয়–এ হচ্ছে পারলৌকিক বা অপার্থিব জগতের জ্ঞান। এ জ্ঞান অর্জন করত: ভক্তগণ তাদের আধ্যাত্মিক স্ড়রের জীবন ও জীবনাচরণে ইহার ব্যবহারিক প্রতিফলন ঘটিয়ে বা কাজে লাগিয়ে অনন্ড় অসীম স্রষ্টার সাথে বিলীন হয়ে যাবেন- ইহাই রমিজের কামনা।

পৃথিবীর প্রত্যেকটি ধর্মমত ও পথের (তরীকার) নবী, রাসুল, ধর্মযাজক, ধর্মগুর", মুনি, ঋষি, অবতার, আউলিয়া, আম্বিয়া, মহামানব এবং মহাজন সকলেই অনন্ড় অসীম স্রষ্টার সাথে বিলীন হওয়ার দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। মহাগুর" রমিজও তাই করেছেন।

আদেশ ও উপদেশ (রমিজ বিধান) এর ব্যাখ্যা ও বিশে- ষণ

১। কোথায় ছিলে কোথায় এলে যাবে কোথা বলো,
যাবার কালে তোমার সংগে কি যাবে সম্বল।

ব্যাখ্যা : এই সিদ্ধবাক্যে গুর" রমিজ মানব জাতির আধ্যাত্মিক চিন্ড়াশীল ব্যাক্তিদের প্রতি অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ এবং সনাতন চারটি প্রশ্ন উপস্থাপন করেছেন। আর এই চারটি প্রশ্ন যথাক্রমে মানব আত্মা–

১. জন্মের পূর্বে কোথায় ছিলো?
২. জন্মের পরে কোথায় এসেছে?
৩. মৃত্যুর পর কোথায় যাবে?
৪. মৃত্যুপরবর্তী সময়ে সাথে কি সম্বল নিয়ে যাবে?

জীববিজ্ঞানীরা জীবের জীবনচক্রের সূত্র আবিষ্কার করে 'জীবনের' চমৎকার তথ্য মানুষকে উপহার দিয়েছেন। আর মহাগুর" রমিজ উক্ত সিদ্ধবাক্যে মানবাত্মার কর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আত্মার জীবনচক্র সম্বন্ধে ইংগিত দিয়েছেন।

মহাগুর" রমিজের মৌখিক বর্ণনা মোতাবেক জানা যায় যে, আত্মার জীবনচক্র অনুযায়ী জন্মের পূর্বে সকল আত্মাই র"হের দেশ আলমে আরওয়ায় অবস্থান করতে হয়। উক্ত র"হের দেশ বা আলমে আরওয়া অগণিত সৌরজগৎ, অগণিত ছায়াপথ, অগণিত নক্ষত্ররাজি, অসীম মহাশূণ্যসমূহ ইত্যাদি যা কিছু আছে তার অনেক বাইরে অবস্থিত। সেখানে জীবন্ড় অবস্থায় কেহ বা কোন কিছুই যেতে পারেনা। উক্ত র"হের দেশ সকল পার্থিব দেশ এবং সকল জড় জগৎ ও অজড়জগতের বাইরে থাকছে। এখানে সকল কিছুই সম্পূর্ণ অপার্থিব। বস্তুজগতের দেহধারী হয়ে সেখানে কেউ যেতে পারেনা।

স্রষ্টার আদেশে উক্ত র"হের দেশ বা আলমে আরওয়াহ উহার সর্বাধিপতি দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। নব নতুন আত্মা পৃথিবীতে প্রথম মানব আকারে জন্ম নিয়ে থাকে। জন্মান্ড়রবাদ মতে বহু যোনী (৮৪ লক্ষ) ভ্রমণ করতঃ বা ক্রমান্বয়ে জন্ম নিয়ে পুনরায় মানবদেহ নিয়ে ধরা ধামে জন্ম নেয়। অতঃপর উক্ত আত্মার মানবাকারে কর্ম শুর" হয়। কর্মফল নিয়ে উক্ত মানবাত্মা আলমে আরওয়ায় মৃত্যুর ছলে চলে যায়।

রমিজ মতে আত্মার কোন মৃত্যু নেই এবং ধ্বংশও নেই। কর্ম অনুযায়ী পুনরায় জীবদেহে বা প্রাণীদেহে ধরায় এসে কর্মফল ভোগতে হয়। সকল আত্মাই স্রষ্টা হতে সৃষ্ট। আত্মার জীবত্ববোধকে সৎকর্মের মাধ্যমে পরিহার করতঃ আত্মার পরমত্ববোধ সৃষ্টি করতে হবে। আত্মা সম্পূর্ণ পরম হয়ে আবারো স্রষ্টার পরমাত্মার সাথে বিলীন

হতে পারলে আর উক্ত আত্মাকে জন্ম নিতে হবেনা। উক্ত আত্মা সম্পূর্ণ জীবাত্মার স্বভাবমুক্ত হয়ে গেলো। সুতরাং জীবের স্বভাব নিয়ে তাকে আর জন্মগ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। মুক্ত আত্মা সর্বাধিপতির আদেশমতে বা আলমে আরোওয়ার নিয়ম অনুযায়ী সুখভোগ করবে।

পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে বারবার ষড়রিপু এবং ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা অসৎকর্মে জড়িত হলে মৃত্যুর পর আবারো কর্মফল অনুযায়ী দেহ গঠিত হয়ে ধরায় জন্ম নিয়ে তার ফল ভোগ করতে হবে। জন্মান্ড়রবাদ ও কর্মবাদ সম্পর্কে মহাগুর" রমিজের সাথে প্রত্যক্ষ আলোচনার প্রেক্ষিতে অতি সামান্য কিছু এখানে (আপ্তবানী নং ১) লিখা হলো। এ প্রসংগে এ পুস্ড়কে বিস্ড়রিত আরো অনেক কিছু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উলে- খ্য যে, এ পুস্ড়কে যা কিছু লিখা হয়েছে সবই গুর" রমিজের কথা বা উক্তি। লিখকের কোন উক্তি নেই।

২। যে পর্যন্ড়স্রষ্টার তুমি না পাও পরিচয়,
তোমার আরাধনা পুরা হবেনা নিশ্চয়।

ব্যাখ্যা : আরাধনা বলতে প্রার্থনা, উপাসনা, সেবা ইত্যাদি বুঝায়। তবে প্রশ্ন থেকে যায় যে, কার কাছে প্রার্থনা করব, কার সেবা করব অর্থাৎ কার আরাধনা করব। আমাদের স্বাভাবিক কাজকর্মে কারো বিশেষ প্রয়োজন হলে তার সাথে যোগাযোগের একটি ঠিকানা জানতে হয়। ঠিকানাবিহীন কোন চিঠিও তার কাছে যাবেনা। আত্মীয়স্বজনদের সাথে যোগাযোগ করতেও নির্দিষ্ট ঠিকানা জানতে হয়। মোবাইল বা টেলিফোনে যোগাযোগ করতে হলেও সংশি- ষ্ট একটি নাম্বার জানতে হয়। ঠিকানা না জানলে কারো সাথে সাক্ষাৎ বা যোগাযোগ করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

তাই গুর" রমিজ বলেছেন যে, স্রষ্টার নিকট প্রার্থনা বা তাঁর সেবা অথবা তাঁর আরাধনা করতে হলে সর্বপ্রথম স্রষ্টার পরিচয়, তাঁর ঠিকানা, অবস্থান, তাঁর র"প ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। সর্বোপরি আরাধনার জন্য স্রষ্টাকে আগে চিনতে হবে। গুর" রমিজের উক্ত আপ্তবাক্যে ইহাই প্রকাশ পায় যে, স্রষ্টাকে না চিনে বা তাঁর পরিচয় লাভ না করে অর্থহীন আরাধনা করলে *অন্ধের হাতি দেখার* শামিল হবে এবং প্রকৃত কোন ফলই পাওয়া যাবেনা।

স্রষ্টার অবস্থান সম্বন্ধে রমিজ বলেন মানবের হৃদয়েই তিনি বাস করেন। তাই সর্বদাই তিনি "নিজকে নিজে চিনা"র জন্য ভক্তদের উপদেশ দিয়েছেন। নিজ পরমাত্মার পরিচয় লাভ করাই এখানে মূল বিষয়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে-*"মান্ আরাফা নাফছাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু"* -অর্থ : *"যে নিজেকে চিনেছে সে তার প্রভুর পরিচয় পেয়েছে"*।

মহাগুর" রমিজ সদ্গুর" বা চেতন গুর"র সংগ করতঃ তাঁর আদেশে আধ্যাত্মিক কর্ম করে নিজকে নিজে চিনে স্রষ্টার স্বর"প উপলব্ধি করা ও দিব্য চক্ষু দ্বারা স্রষ্টাকে দেখার কথা ও চিনার কথা বলেছেন।

৩। স্রষ্টার দয়া কর্মফল যে জানে সত্য
ইচ্ছাকৃত জীবন মরণ সেই ভবে মুক্ত।

ব্যাখ্যা : গুর" রমিজের এই সিদ্ধবাক্যটিতে তাঁর কর্মবাদনীতির কর্মের ফলাফলের কথাই বলা হয়েছে। একটি বাংলা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, *যেমন কর্ম তেমন ফল।* কর্ম অনুযায়ী ফল পাওয়া যায়। তবে রমিজ তাঁর উক্ত সিদ্ধবাক্যে কর্মফলকে ***"স্রষ্টার দয়া"*** হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তার মানে কর্মফল লাভ করাই স্রষ্টার দয়া।

কর্মফল পাওয়া আর কর্মফল লাভ করা এক কথা নয়। স্রষ্টা ইচ্ছা করলে কর্মফল ভোগ করার অধিকার ও ক্ষমতা দিতে পারেন আবার নাও দিতে পারেন।

কর্মবাদ অনুযায়ী প্রত্যেক কর্মের একটি ফল আছে, সে ফল যিনি কর্ম করেন তিনি প্রাপ্য হন। এই ফল পাওয়ার প্রাপ্যতা তার অধিকার, তিনি বিধান অনুযায়ী সে ফল পাবেন। আর সে ফল ভোগ করার ক্ষমতা অর্পণকরা স্রষ্টার হাতে। স্রষ্টা কর্মফল ভোগ করার ক্ষমতা কর্মীদের দিতে পারেন আবার নাও দিতে পারেন। স্রষ্টা দয়া করে ফলভোগ করার ক্ষমতা দিয়ে থাকেন। *সেজন্যই গুরু রমিজ কর্মফলকে স্রষ্টার দয়া হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।*

কোন কর্মী যদি এ কথা মনে করেন যে, ***"আমি কর্ম করেছি, স্রষ্টা তার ফল আমাকে দিতে বাধ্য"***-এ জাতীয় মনোভাব যাদের মধ্যে আছে-***তাদের মধ্যে মূলত একটি অনাকাংখিত অহমিকা কাজ করে***। ইহাতে কর্মীদের কর্মাভিমুখীতা নিচু স্তরে চলে যায়। ইহার ফলশ্রুতিতে কর্মী বা ভক্ত রমিজ বিধান হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই বিচ্ছিন্নতার ফলাফল যে কি হয় তা রমিজ ভক্ত সবাই জানেন। এ জাতীয় লোক ধীরে ধীরে গুরুবিরোধী হয়ে যায়।যারা কর্মফল ভোগ করার ক্ষমতাটি স্রষ্টার দয়া হিসাবে বিশ্বাস করেন ও বুঝেন তাঁরা অতি সহজেই তা পেয়ে থাকেন।

উলে- খ্য যে খারাপ কর্মের খারাপ ফল ভোগ করার ক্ষমতা যদি স্রষ্টা না দিতেন তবে কারো অস্তিত্ব থাকার কথা নয়। সুতরাং মহান স্রষ্টার দয়ায়ই মানব এবং সর্বজীবের অস্তিত্ব বজায় রয়েছে। কর্মফল ভোগ করার ক্ষমতা এবং ধৈর্য্য স্রষ্টা দয়া করে দিলে তবে মানুষ তা আনন্দচিত্তে ভোগ করতে পারেন।

তাই উক্ত সিদ্ধবাক্যটি যিনি সত্য হিসেবে সম্যক বুঝেছেন এবং যার কর্মাচরনে ইহার প্রতিফলন ঘটেছে গুরু রমিজ মতে তিনিই মুক্ত এবং জীবন মরণ তার ইচ্ছায় হবে।

৪। দৈব বাণী এলহাম ওহী পাবে নিত্য নিত্য
যখন যাহা হবে তাহা জানাইবে সত্য।

ব্যাখ্যা : এই সিদ্ধবাক্যটিতে গুরু রমিজ স্রষ্টার তরফ হতে ভক্তদের প্রতি নিত্য সংবাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছেন। যিনি স্রষ্টার দয়া কর্মফলে বিশ্বাসী, সর্বদা সদ্‌গুরু ও স্রষ্টার ধ্যানে মগ্ন থাকেন তাকে মহান স্রষ্টার তরফ হতে নিত্য নিত্য বা দৈনন্দিন এলহাম, ওহী বা দৈববাণী দ্বারা সবকিছুই জানানো হবে। গুরু রমিজ ইহার সত্যতাই নিশ্চিত করেছেন।

৫। ত্রিবেণীর ঘাটে যেবা নিত্যস্নান করে
কোটি কোটি পাপে তারে গ্রাসিতে না পারে।

৬। হৃদয় ত্রিবেণী নদী ঘাট হল তার আঁখি
সেই জলেতে স্নান কর স্রষ্টা তোমার স্বাক্ষী।

(**বিঃদ্রঃ-** উপদেশবাণী নং ৫ ও ৬ এর মর্মার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে ইহাদের ব্যাখ্যা একত্রে লিখা হলো)

ব্যাখ্যা : মহাগুরু রমিজ উক্ত সিদ্ধবাক্যে ভক্তবৃন্দকে ত্রিবেণীর ঘাটে নিত্যস্নান করার উপদেশ দিয়েছেন। মানবের *'হৃদয়'*কে ত্রিবেণী আখ্যায়িত করা হয়েছে। জন্ম, জীবন, মৃত্যু, সৃষ্টি ও স্রষ্টা বিষয় এবং অধ্যাত্ম বিষয়ের চিন্তাশীল ও গবেষণা কার্যে লিপ্ত মহান ব্যক্তিদের জন্যই উক্ত আপ্তবাক্য রমিজ তাঁর লিখনীতে লিখেছেন।

স্বীয় এবং সর্বজীবের বিচিত্র কর্মরাজির কর্মফল ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা ও ধ্যান করতঃ হৃদয়ে হৃদয়ে তা অনুভব করে সর্বদা নিজ আত্মার ভুল সংশোধন করার নিমিত্তে চোখের জলে স্রষ্টার নিকট আরাধনা করার কথাই এখানে বলা হয়েছে।

নিত্যস্নান করা বলতে নিজের ভুল সংশোধনের জন্য প্রত্যহ চোখের জলে স্রষ্টা ও সৎগুরুকে স্মরণ করে অনুতাপ প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে জনৈক মহাজনের একটি সুন্দর আপ্তবাক্য আছে যার উদ্ধৃতি মহাগুরু রমিজ প্রায়ই তাঁর ভক্তদের কাছে করতেন, আর সেটি হচ্ছে-

"পাপ করে অনুতাপ করে যেইজন
সাধনা হইতে শ্রেষ্ঠ বলে মহাজন।"

তাই যিনি তার নিজের পাপের জন্য এবং পাপ যেন তাকে স্পর্শ না করতে পারে সেজন্য অনুতাপ করতঃ চোখের জলে স্রষ্টার কাছে সর্বদা আরাধনায় মশগুল থাকেন তাহলেই স্রষ্টা তার সকল পাপ ক্ষমা করতে পারেন। রমিজও তাঁর সিদ্ধবাক্যে এই উপদেশই দিয়েছেন।

এ জাতীয় অনুতাপ এবং চোখের জল কেবল স্রষ্টাই দেখেন। কারণ এ আরাধনা অত্যন্ড় গোপনে এবং অন্যদের চোখের আড়ালেই করা হয়। তাই ইহার স্বাক্ষী কেবলমাত্র স্রষ্টাই, অন্য কেহ নয়।

৭। সূর্যের কিরণ দেখ আছে দিনে রাতে
আবরে ঢাকিয়া কিন্তু পারেনা রাখিতে।

ব্যাখ্যা : এ সিদ্ধবাক্যটিতে গুরু রমিজ ইহাই বুঝাতে চাচ্ছেন যে, সত্য চিরদিন সত্যই থাকে। সত্যকে কোন সময়ও মিথ্যা দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না। সূর্য্যের আলো দিবারাত্র পৃথিবীর দিকে আসছে। মেঘে সাময়িকভাবে সূর্যকিরণ ঢাকা থাকতে পারে। কিন্তু যখন মেঘ কেটে যায় তখন সূর্য্যের কিরণ পুনরায় পূর্ববত দেখা যায়।

তদ্রূপ লোকচক্ষুর অন্ড়রালে কিংবা গোপনে যত সৎকর্ম অথবা অসৎকর্ম সংঘটিত হোক না কেন তা একদিন ধরা পরবেই। আর স্রষ্টার কাছে কিংবা গুরুর নিকট কোন কিছুই গোপন থাকেনা। সুতরাং পূর্বাপর সবকিছু বিবেচনা করে সকল কর্ম সমাধা করা শ্রেয়।

৮। সত্য যাহা হবে ব্যক্ত হৃদয়ে থাকিয়া
নিজকে নিজে কর বিশ্বাস আত্মজ্ঞান দিয়া।

ব্যাখ্যা : মহাগুরু রমিজ এখানে পরম ভক্তের হৃদয়ের কথা বলেছেন। স্রষ্টা মানব হৃদয়ে অবস্থান করেন। এ বিষয়টি যিনি অনুভব করতে পেরেছেন তিনি অধ্যাত্ম বিষয়ক একজন সাধক। রমিজ গুরু তা অনুভব করেই এক বাণীতে তাঁর ভাষায় বলেছেন : *"কাজ কি আমার তাঁরে ডেকে*
সে তো হৃদয়ের ধন খোদ মহাজন
ঘরের মালিক ঘরে থাকে"।

যিনি সাধনার মাধ্যমে নিজকে নিজে চিনতে পেরেছেন ও স্রষ্টার নিগুঢ়তত্ত্ব জানতে পেরেছেন তাঁর হৃদয়েই স্রষ্টার বাসস্থান। তাঁর হৃদয়ে থেকেই স্রষ্টা সকল সত্য ব্যক্ত করেন। তিনিই হৃদয়ে বাসরত স্রষ্টার নির্দেশে মহাজ্ঞান দ্বারা আত্মজ্ঞান অর্জন করতঃ নিজের প্রতি কাজে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারেন। এ আত্মবিশ্বাস বা আত্মপ্রত্যয় যিনি নিজের উপর নিজে স্থাপন করতে পারেন তাঁর হৃদয়েই পরম স্রষ্টার সকল সত্য ব্যক্ত হবে।

৯। নিজকে নিজে তুমি যদি কর একটু সন্দ
তাহলে জানিতে হবে তুমি ভবে অন্ধ।

ব্যাখ্যা : 'সন্দেহ' শব্দটি তখনই ব্যবহৃত হয় যখন কোনকিছু নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। 'নিজ' মানে আপনি। আমার মাঝে কেবল আমিই আছি, ইহা হতে পারে না। নিবির পরিবেশে ধ্যান বা চিন্ড়া করলে দেখা যায় যে, আমার ভিতর আরও একটি সত্তা আছে যিনি যে কোন বিষয়ে হাঁ অথবা না সুচক অবস্থা জানাচ্ছেন। এই সত্তাটি কে? ইহা চিন্ড়া করলে-মন, জ্ঞান, বিবেক, রিপু, ইন্দ্রিয়, হৃদয়, স্রষ্টা ইত্যাদির কথা স্মৃতিতে চলে আসে।

আমার মাঝে যা কিছুই আছে সব মিলিয়েই আমার আমিত্ব। আবার আমার আমিত্বের মালিক স্বয়ং স্রষ্টা যিনি হৃদয়ে বাস করেন। এ বিষয়ে যদি কোন ভুল থাকে তখনই দ্বিধা, দ্বন্দ, সন্দ ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। আমার মাঝে জ্ঞান বা বিবেকরূপী স্রষ্টা বিরাজমান হয়ে আমাকে দিয়ে সকল কর্ম করাচ্ছেন। সেই স্রষ্টাকে আমার চিনতে হবে। তবেই তিনি আমার হয়ে যাবেন। আবার আমি নিজকে চিনতে পারলে অথবা আমাকে আমি চিনতে পারলে স্রষ্টাকে চিনা হয়ে যাবে।

এই চিনার মাঝে যদি কোন ভুল বুঝাবুঝি থাকে তবে স্রষ্টাকে নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হবে। আর স্রষ্টাকে চিনা হলো না। অর্থাৎ আমাতে আমার সন্দেহ সৃষ্টি হবে। এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে গুরু রমিজের উক্ত সিদ্ধবাক্য মতে, *আমি ভবে অন্ধ বলে পরিগণিত হয়ে গেলাম*।

তাই নিজের প্রতি নিজের বিশ্বাস থাকতে হবে। নিজের কর্ম বা আত্মকর্মের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। সৎগুরু হতে মহাজ্ঞান অর্জন করতঃ সর্বকর্ম সমাধা করলে উপরোক্তভাবে আর অন্ধ খেতাব নিতে হবে না।

১০। অন্ধের সামনে ধরিলে দর্পণ দেখেনা নিজ মুখ
ত্রিজগতে অন্ধ লোকের কিছুতে নাই সুখ।

ব্যাখ্যা : সাধারণতঃ অন্ধ বলতে যার চোখ নাই অথবা চোখ থাকলেও চোখ কাজ করে না বা অকেজো, কিছুই দেখতে পায় না তাকে বুঝায়। তাঁর সামনে আয়না ধরলেও সে দেখতে পাবে না।

কিন্তু উক্ত আপ্তবাক্যে মহাগুরু রমিজ মানুষের দেহের মাংসল চোখের কথা বলেননি এবং বস্তুজগতের আয়নার কথাও বলেননি। এখানে তিনি মানবের জ্ঞানচক্ষু বা অন্তর্চক্ষুর কথা বলেছেন। আয়না হলো পরম আত্মা। যার জ্ঞান নাই সে জীবত্ববোধজনিত সকল কাজই বুঝে এবং করতে পারে। তার মধ্যে পরমত্ব বা পরমতত্ত্ব নেই। সে অধ্যাত্ম বিষয়ে নির্বোধ। আধ্যাত্মিক জগতের কিছুই সে দেখবেনা, বুঝবে না, বোধ করতে পারবে না, কারণ সেই অন্তর্চক্ষু তার নেই। অধ্যাত্ম বিষয়ক বা স্রষ্টা ও সৃষ্টি বিষয়ে তার কাছে কিছু তুলে ধরা আর অন্ধের সামনে দর্পণ ধরা একই কথা। তাই, তার আত্মজগতে কোন আনন্দ বা সুখ নেই।

উলে- খ্য যে, যাদের অন্তর্চক্ষু নেই তারা একজন সৎগুরুর সংগ করতঃ মহাজ্ঞানী হতে জ্ঞান অর্জন করতে পারলে এক সময় অন্তর্চক্ষু খুলে যেতে পারে। সৎগুরুর শিষ্যত্ব বরণ করলে এবং তাঁর আদেশ অনুযায়ী সৎকর্ম করলে অবশ্যই জ্ঞানার্জন করা সম্ভব এবং অন্তর্চক্ষু খুলে যাবে। একই সাথে তার আত্মার জীবত্ববোধ অপসারিত হয়ে পরমত্ব সৃষ্টি হবে। এ উদ্দেশ্যেই মহাগুরু রমিজ উক্ত সিদ্ধবাক্যটি লিখেছেন।

১১। মানুষের সংগে যদি স্রষ্টার সংস্রব আছে
জ্ঞানের আঁখি খুলে দেখ পাবে নিজের কাছে।

ব্যাখ্যা : গুরু রমিজ মতে স্রষ্টা পরম আত্মা এবং মানুষ পরম আত্মার জাত। একই গুণসম্পন্ন জাতের সাথে জাতের মিশামিশি হয়। এক জাতের সাথে সমজাতের বন্ধুতা সৃষ্টি হয়। একই জাত না হলে জাতে জাতে মিশামিশি হয় না এবং হতে পারে না। রাসুল আল- াহর জাত বলেই রাসুল (হযরত মোহাম্মদ সঃ) আল- াহর বন্ধু হয়েছিলেন। রাসুল একজন মানুষ। তাই, কোন মানুষ রাসুল এবং আল- াহর বন্ধু হতে পারেন।

সুক্ষ্ম জ্ঞান এবং বিবেক দ্বারা চিন্তা করলে দেখা যায় যে, শুদ্ধ আত্মার (পরম আত্মার) মানবের হৃদয়ে স্রষ্টার আবাসস্থল। যিনি শুদ্ধ আত্মার অধিকারী তিনি নিজেই তাঁর মধ্যে স্রষ্টার উপস্থিতি অনুভব করতে পারেন। আর এই অনুভূতি আত্মীক দর্শন দ্বারা হয়ে থাকে। এ অবস্থায় তিনি তাঁর এবং স্রষ্টার সম্পর্ক, সম্বন্ধ, সংস্রব ইত্যাদি সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন। কারণ তখন স্রষ্টা তাঁর অতি কাছের একটি সত্তা হয়ে যান।

গুরু রমিজ তাঁর '*অলৌকিক সুধা*' নামক পুস্তকে বলেন, ***"দেখিবে জ্ঞানের আলো খুলিবে দর্শন***
বিশ্বমাঝে আর কিছু নয় শুধু একজন"।

তাই যিনি শুদ্ধ আত্মাসম্পন্ন লোক বা যিনি পরম আত্মার অধিকারী তার মাঝে আধ্যাত্মিক দর্শন খুলে যাবে। সাথে সাথে রমিজ বর্ণিত জ্ঞানের আঁখিও খুলে যাবে এবং স্রষ্টাকে তিনি তাঁর মধ্যেই দেখতে পাবেন।

স্রষ্টার সাথে মানুষের সংস্রব আছে এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে,

"ওয়াহুয়া মায়াকুম আইনামা কুনতুম"।

অর্থ : "আর তোমরা যেখানে থাকো তিনি (আল-াহ) তোমাদের সাথে আছেন"। (সুরা- হাদিদ, আয়াত-৪)

অন্যত্র আরো এরশাদ হয়েছে,

"ওয়ানাহ্নু আকরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ"।

অর্থ : "আমি তার (মানুষের) শাহ রগের চেয়েও নিকটে"। (সুরা- কাফ, আয়াত-১৬)

মানুষের সাথে আল-াহ্‌র সম্পর্কের কথা তিনি নিজেই হাদীসে কুদ্‌সীতে এরশাদ করেন,

"আল্ ইনছানু সিররী ওয়া আনা সিররুহু"।

অর্থ : "মানুষ আমার রহস্য আর আমি মানুষের রহস্য"।

১২। আরও দেখবে অনন্তরূপ অনন্ত জীবে স্থান
জাতে জাতে মিশামিশি প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ব্যাখ্যা : এখানে গুরু রমিজ শুদ্ধ আত্মার ইচ্ছাক্ষমতার কথাই আলোচনা করেছেন। যিনি পরিশুদ্ধ আত্মার লোক তিনি নিষ্কলুশ চরিত্রের অধিকারী এবং তিনি পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত আছেন। অধ্যাত্ম বিষয়ক বা স্রষ্টা বা সৃষ্টি সম্বন্ধে জানেন। এ জাতীয় লোক প্রকৃত জ্ঞান দ্বারা স্রষ্টা ও মানবের সম্পর্ক বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা মূলতঃ স্রষ্টার সংগে লয় হয়ে আছেন। এ অবস্থায় তাঁরা স্রষ্টা অনন্তরূপী ও অনন্তজীবে বিরাজিত, ইহাও তাঁদের দিব্যচক্ষু বা দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখতে পান।

সকল জীবের আত্মা মানব রূপেই জন্ম নিয়ে থাকেন। কর্মফলের কারণে ও কর্মবৈচিত্রের কারণে মানব আত্মা যে যেই গঠন ও রূপের অধিকারী হওয়া উচিৎ স্রষ্টা ঐ রূপেই তাকে পুনরায় পৃথিবী নামক কর্মক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেন।

কর্মফল ভোগ করতঃ পুনরায় মানব জন্ম ধারণ করতে পারে। সকল জীব বা সর্বজীবের আত্মা মানব আকারে জন্ম নেয় এবং সকলেই স্রষ্টার জাত। কর্ম-ফেরে অন্য প্রাণী বা জীবে জন্ম নিতে পারে। এই ভাবে মানবাকার অথবা জীবাকার হয়ে স্রষ্টা অনন্তরূপে, অনন্তজীবে, অনন্তে লয় হয়ে আছেন।

১৩। সাইন্টিস্ট দেখিয়া নেয় কোথায় কি রয়েছে
তোমরা প্রমাণ কর স্রষ্টা কোথায় আছে।

ব্যাখ্যা : মহাগুরু রমিজ এই আপ্তবাক্যটিতে অধ্যাত্ম বিষয়ক চিন্তাশীল রমিজ পন্থীদের উদ্দেশ্যে আদেশ ও মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। পৃথিবীর বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীসহ অনন্ত বিশ্বের কোথায় কি রয়েছে তা বের করে বা আবিষ্কার করে মানবজাতির কল্যাণার্থে চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করে যাচ্ছেন। এ সমস্ত তথ্য ও আবিষ্কার সবই স্রষ্টার সকল সৃষ্টির কল্যাণের জন্য। গুরু রমিজ তাঁর ভক্তবৃন্দকে ও সকল চিন্তাবিদকে স্রষ্টা কোথায় কিভাবে বিরাজমান আছেন তা প্রমাণের জন্য তথ্য প্রকাশ করার তাগিদ দিয়েছেন।

প্রশ্ন থেকে যায় যে, গুরু রমিজ কি স্রষ্টা সম্বন্ধে সকল তথ্য এবং মতবাদ প্রকাশ করেননি? হাঁ, তিনি অবশ্যই স্রষ্টার অবস্থান, তাঁর সৃষ্টি কৌশল, কিভাবে নিজকে নিজে চিনা যায় ও স্রষ্টাকে লাভ করা যায় সবই উলে- খ করেছেন। এগুলো তিনি তাঁর বাণী, উপদেশ, আদেশ এবং অন্যান্য লিখনীর মাধ্যমে সহজ সরল ভাষায় ভক্তদের বুঝানোর জন্য চেষ্টা করেছেন।

গুরু রমিজের সাথে আমরা যারা তাঁর আধ্যাত্মিক আলোচনায় এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে দলগত এবং ব্যক্তিগতভাবে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছি এমন সব ভক্তের সাথে একত্রে রমিজ মতবাদের উপর গবেষণা ও আলোচনা সভা করতঃ অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করা যায় এবং এ পুস্তকে তা-ই করা হয়েছে।

রমিজের জীবন ও জীবনাচরনের ব্যখ্যা করলে, তাঁর বাণী ও উপদেশাবলী বিশে- ষণ ও গবেষণা করলেও অনেক তথ্য বের হয়ে আসবে। গুরু রমিজের মতবাদের ১০ টি বৈশিষ্ট্য বিশে- ষণ করতঃ ধ্যান ও চিন্তার মাধ্যমে তদমতানুযায়ী জন্ম, জীবন, মৃত্যু, সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়।

গুরু রমিজ বিজ্ঞানীদের নব নব আবিষ্কারের প্রতি খুবই কৌতুহুলী ছিলেন। বিজ্ঞানীদের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। বিজ্ঞানীদের মহাকাশ গবেষণার কথা দৈনিক পত্রিকায় বা ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হলে তা পড়ে তিনি খুবই আনন্দিত হতেন। রমিজের মতে অজানা অনন্ত মহাবিশ্বে অনেক গ্রহে আমাদের ন্যায় মানুষ ও প্রাণী আছে। আবার কোন কোন গ্রহে আমাদের চেয়ে নিম্নমানের মানব এবং কোন কোন গ্রহে আমাদের চেয়েও উন্নত সভ্য মানুষ রয়েছে এবং উদ্ভিদ-বৃক্ষ সহ অন্যান্য প্রাণীও আছে।

গুরু রমিজ আধ্যাত্মিক জগতের একজন মহাবিজ্ঞানী ও দার্শনিক ছিলেন। তাই তাঁর মতবাদে বিশ্বাসী ভক্তদের মধ্যে যারা চিন্তাশীল, গবেষক ও লিখক আছেন তাঁরা তাঁর বাণী, উপদেশাবলী, জীবন ও জীবনাচরণ পর্যবেক্ষণ, গবেষণা, চিন্তা ও ধ্যান করতঃ স্রষ্টা কোথায়, কিভাবে বিরাজমান, তাঁর সাথে কিভাবে লয় হওয়া যায়, ইহার চমকপ্রদ বিবরণ লিখে পুস্তক আকারে পন্থী ও ভক্তদের কাছে উপহার দিতে পারেন। গুরু রমিজ সেই কথাই অত্র সিদ্ধবাক্যে প্রকাশ করেছেন।

১৪। গুরুপাদ পদ্মে যিনি হয়েছেন গ্রহণ
তিনিই ভাগ্যবান স্বর্গে আরোহণ।

ব্যাখ্যা : গুরু রমিজের মতবাদ অনুযায়ী মানুষের সৎগুরুকরণ বা সৎগুরু ধরা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। কারণ রমিজনীতির ১০ টি বৈশিষ্ট্যের ৪র্থ বৈশিষ্ট্যে সদ্‌গুরুর প্রতি আত্মনিবেদন করার কথা বলা আছে। একজন সদ্‌গুরুর মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক জীবনে মানুষ সহজভাবে নিজকে নিজে চিনতে পারেন এবং স্রষ্টার সন্ধ্যান লাভ করতে পারেন। এ জগতে একজন সদ্‌গুরু পাওয়া অত্যন্ত কঠিন বিষয়।

গুরু রমিজের গুরুতত্ত্ব অনুযায়ী সদ্‌গুরুর সংজ্ঞা নিরূপ :

"যিনি অন্তর্যামী, মনের সকল আবর্জনা দূর করতে সক্ষম, যার সেবা করলে বা যার আদেশ অনুযায়ী কর্ম করলে দৈববাণী, এলহাম পাওয়া যায়, যার কৃপায় জন্ম-মৃত্যু রোধ করতঃ অনন্ত সৃষ্টি-কৌশল হৃদয়ংগম করে আত্মার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে এবং অনন্তশক্তির সংগে মিশে অনন্ত কর্মে যোগদান করার ক্ষমতা অর্জন করা যায় তিনিই সদ্‌গুরু"।

আবার সদ্‌গুরু পেতে হলে একজন সৎ এবং সত্যের সন্ধ্যানকারী, ষড়রিপু এবং ইন্দ্রিয়াদির আসক্তিবিহীন স্বচ্ছ ও নিষ্কলুশ চরিত্রের মানুষ হতে হবে। সদ্‌গুরু এবং শিষ্য (ভক্ত) উপরোক্ত সদ্‌গুরু ও সত্যের সন্ধ্যানকারীর গুণাবলীর অধিকারী হলেই উভয়ে উভয়কে পাবার যোগ্যতা রাখেন। তারপরও রমিজনীতি অনুযায়ী উভয়ের পূর্ব কর্মের প্রতিশ্রুতি থাকতে হবে।

উভয়ের বহুদিন সাধনা ও তালাশ করার পর আপনা আপনি কিংবা দৈববাণী, এলহাম-ওহীর মাধ্যমে গুরু-ভক্তের মিলন ও যোগাযোগ হয়ে যাবে। সে মূহুর্তে সদ্‌গুরুকে চিনে ভক্ত গুরুর নিকট তার আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে সর্বস্ব অর্পণ করলে সদ্‌গুরু অবশ্যই তা গ্রহণ করবেন। তাহলেই ঐ ভক্ত সদ্‌গুরু প্রাপ্ত হলেন। এবং সদ্‌গুরুর মাধ্যমে তিনি বিশ্বস্রষ্টা ও অনন্তের সাথে মিশে যাবেন। আর তাহলেই তিনি আধ্যাত্মিকভাবে ভাগ্যবান হলেন এবং তাঁর স্বর্গে আরোহণ করা হলো। ইহাই গুরু রমিজের অত্র সিদ্ধবাক্যের মূল বিষয়।

১৫। স্বর্গ-নরক বেহেস্ত দোযখ কেহ দেখে নাই
না দেখিয়া এত কেন কর মন বড়াই।

ব্যাখ্যা : ইসলাম ধর্ম মতে মৃত্যুর পর সুখের জন্য বেহেস্ত এবং দুঃখের জন্য দোযখ আবার হিন্দু ধর্ম মতে সুখের জন্য স্বর্গ আর দুঃখের জন্য নরকে গমন করতে হবে। স্বর্গ বা বেহেস্তে যারা যাবে তাদের সুখের অনেক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নরক ও দোযখের অশান্তি ও দূর্ভোগের নানারকম কাহিনী ধর্মগ্রন্থগুলোতে বর্ণিত আছে।

এ সুখ-ভোগ আর দূর্ভোগের কাহিনী শুনে বহু বহু লোক সুখ-ভোগের লোভে আর দূর্ভোগের ভয়ে ধর্ম-কর্ম করছে। বর্তমান সময়ে বিবিধ কারণে মানুষ ধর্ম-কর্ম হতে কিছুটা দূরে সরে যাচ্ছে।

এরপরও মানুষ উপরোক্ত কারণে বেহেস্ত-দোযখ এবং স্বর্গ-নরক না দেখেও অনেক বড়াই করে থাকে। এগুলো মানবের কল্পনার বিষয়বস্তু মাত্র।

গুরু রমিজ এগুলোকে কেবলমাত্র কল্পনার বিষয়বস্তুর মাঝে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁর মতে বহু মানুষ কানা, লেংড়া, বয়রা ইত্যাদি হিসাবে এবং জন্তু-জানোয়ার বা পশু হিসাবে প্রকৃতিতে ভয়ংকর কষ্টভোগ করছে এবং ইহারাই দোযখের প্রকাশ্য উদাহরণ।

রাজা-মন্ত্রী, আমীর, উচ্চপদস্থ অফিসার ইত্যাদি বেহেস্তের প্রকাশ্য উদাহরণ। নবী, রাসুল, ধর্মযাজক, ধর্মাবতার, অলী, ঋষি, মুনি ইত্যাদি মহামানবগণ অতি উচ্চ স্তরের বেহেস্তি।

১৬। শোনা কথা না দেখিয়া না নিও কানে
এই ভবে সব আছে চিন আত্মজ্ঞানে।

ব্যাখ্যা : গুরু রমিজ এখানে ইহাই বলতে চেয়েছেন যে, উপরোক্ত ১৫ নং উপদেশবাণীতে উলে- খিত স্বর্গ-নরক, বেহেস্ত-দোযখ সম্বন্ধে মানুষের মুখে মুখে শোনা ভিত্তিহীন কথায় যেন কোন ভক্ত বিশ্বাস না করেন। তবে তিনি এই ভবেই বেহেস্ত-দোযখ, স্বর্গ-নরক বিদ্যমান আছে তাই বলছেন। আত্মজ্ঞান দ্বারা এইগুলো চিনার জন্য তিনি ভক্তদের উপদেশ দিচ্ছেন। তাঁর মতে আত্মজ্ঞান অর্জন করতে হলে একজন চেতনগুরু বা মোর্শিদ-এর সংগে সংগ করতে হবে। চেতনগুরু বা মোর্শিদ সম্বন্ধে ১৪ নং সিদ্ধবাক্যে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

১৭। রুহের দেশ আছে একটি পেয়েছি প্রমাণ
আসা যাওয়া করে জীব সেই খানে তার স্থান।

১৮। মৃত্যুর আগে বলে লোকে "আমি যাই বাড়ি"
তৎক্ষণাত চলে যায় সে নিজ দেহ ছাড়ি।

১৯। পূণ্যাত্মা যেই জন আসে না আর ফিরে
কর্মফলে পাপাত্মার জন্ম বারে বারে।

(**বিঃদ্রঃ- ১৭, ১৮ ও ১৯** নং আপ্তবাক্যগুলো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলে ইহাদের ব্যাখ্যা একত্রে করা হলো)

ব্যাখ্যা : গুর" রমিজ উক্ত সিদ্ধবাক্য সমূহে 'র"হ' সমূহের দেশ সম্বন্ধে তাৎপর্য বিশে- ষণ ও বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে মৃত্যুর পর সকল জীবের আত্মা র"হের দেশ (আলমে আরওয়াহ) নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান করে।

আবার সে স্থান হতে যার যার কর্ম অনুযায়ী গঠিত দেহ ধারণ করে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসে। এই আসা-যাওয়ার জীবনচক্রকে অতিক্রম করতঃ জীবন ধারণ না করার বিষয়টিকে আত্মার মুক্তি লাভ করা বলা হয়। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জীবন লাভ করার চক্র হতে মুক্তি পাওয়াই হলো "*আত্মার মুক্তি*" কিংবা "*আত্মার জীবনচক্র হতে বের হয়ে আসা*"। এই চক্র হতে মুক্তি লাভ না করা পর্যন্ড় আত্মা সমূহকে বারবার আসা-যাওয়া করতে হয়।

জন্ম নেয়াটা আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাই। আবার মৃত্যুর সময় অনেকেই বলে যে, "আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি"। এই বাড়ি হচ্ছে আত্মাসমূহের মূল বাসস্থান বা "*আলমে আরওয়াহ*"। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে 'আমি বাড়ি চলে যাই' বলে তৎক্ষণাত মৃত্যু হয়ে যায়। এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে, মৃত্যুর পর আরেকটি দেশ আছে।

২০ নং সিদ্ধবাক্যটিতে পূণ্যাত্মা এবং পাপাত্মার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। যে সকল মানুষ পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে উত্তম কর্ম সাধন করে, সর্বজীবকে ভালবাসে, নিজ আত্মার সম্যক পরিচয় পেয়ে স্রষ্টাকে চিনেছে এবং আত্মতত্ত্ব ও গুর"তত্ত্ব সাধনার মাধ্যমে পূণ্যাত্মা হয়ে যায় তারা বারবার জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে আসে না। আর যারা সারাজীবন পাপকর্ম করে পাপাত্মা হয়ে যায় তারা বারবার বিভিন্ন দেহাকৃতিতে জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে চলে আসে।

২১। পৃথিবীতে প্রজা থাকে রাজার শাসনে
শত শত ডিপার্টমেন্ট আছে স্থানে স্থানে।

২২। সেই রকম ডিপার্টমেন্ট আছে র"হের দেশে
শত শত মুক্ত লোক কাজ করে নিজ খোশে।

(**বিঃদ্রঃ-** এখানে দুটি বাক্যে একটির মর্মার্থ আরেকটির সাথে সরাসরি জড়িত বলে ইহাদের ব্যাখ্যা এক সাথে করা হলো)

ব্যাখ্যা :

মহাগুর" রমিজ উক্ত দুটি সিদ্ধ বাক্যে পৃথিবীর কাজের সাথে র"হের দেশের কাজের বা কর্মকান্ডের নীতির যে একটি চমৎকার মিল রয়েছে তাই দৃষ্টান্ড় দ্বারা উপস্থাপন করেছেন।

পৃথিবীতে যেমন বিভিন্ন দেশের সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার সুবিধার জন্য এবং জনগণের কল্যাণার্থে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের ব্যবস্থা রাখেন এবং প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের কাজে শত শত সরকারী লোক নিয়মিত কর্মরত আছেন, তেমনি বিশ্বব্রহ্মান্ডের এবং অন্যান্য ভূমের (গ্রহের) সকল আত্মার কর্মকান্ডের হিসাব-নিকাশ এবং বিশ্বব্রহ্মান্ড সহ সকল ভূমের পরিচালনার জন্য র"হের দেশেও (আলমে আরওয়ায়) তদ্র"প শত শত মুক্ত লোক নিয়মিতভাবে স্রষ্টার দেওয়া ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিজ ইচ্ছায় বা নিজ খোশে সুনির্ধারিত কার্য সম্পাদন করছেন।

এখানে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর কর্মকান্ড আত্মার রাজ্যের (আলমে আরওয়ার) কর্মকান্ডের অনুরূপ ও অবিকল নকল মাত্র।

মহাগুরু রমিজের মতে বেহেশ্‌ত ও দোযখের বিবরণ

মহাসূফী খন্দকার রমিজউদ্দিন এ পৃথিবীতেই সাতটি দোযখ ও মোট আটটি বেহেশ্‌ত বা স্বর্গের মধ্যে তিনটির নমুনা বা দৃষ্টান্ড় রয়েছে বলে তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেছেন।তিনি বলেন, *"এই দেশ আমাদের নহে। আমাদের দেশ 'আলমে আরোওয়াহ' বা স্বর্গ (বেহেশ্‌ত)। এই দেশ কর্মক্ষেত্র। কর্মময় এ জীবন। কর্ম অনুযায়ী জীবকে আসা যাওয়া করতে হয়। বিধির বিধান অনুসারে যে যেই কর্ম করে সেই কর্মফলে কেহ রাজা, কেহ মন্ত্রী, কেহ বড় চাকুরীয়া, জমিদার, তালুকদার, মার্চেন্ট, শিল্পপতি ইত্যাদি হোন। আবার কেহ খোঁড়া, কেহ কালা, অন্ধ, কানা, বোবা, কেহ খাইতে পায় না, রাস্ড়ায় রাস্ড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়, কেহবা নপুংশক হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং যার যে কর্ম অনুযায়ী দেহ ধারণ করিয়া থাকে।*

সর্বজীবের সাতটি ঘর, সাতটি দোযখ বা সাতটি জাতি। মৃত্যুর পর মানবগণ যার যে কর্মফলে ও সর্বজীবের বিধানমতে যেই জাতিতে জন্মগ্রহণ করিবার প্রয়োজন সেই জাতিতেই জন্মধারণ করিয়া দোযখের আজাব (শাস্ড়ি) ভোগ করিতে হয়।

প্রকাশ থাকে যে, এক মানবজাতি ছাড়া অন্য কোন জাতির কর্মফলের বিচার হইবেনা। ইহাই সপ্তদোযখের দৃষ্টান্ড় বলিয়া বিবেচনা করিতে পার।"

সর্বজীবের সাতটি ঘর বা সাতটি দোযখের বিবরণ ও সেই সম্বন্ধে মহাগুরু রমিজের প্রত্যক্ষ বাণী হল ঃ ***মন রাস্ড়া লও খুঁজিয়া***

বিদেশে আর কয়দিন রবি দেশে চল পালিয়া।

১। মনরে, এ দেশেতে জন্মমরণ নিজকে না চিনিয়া
কখন পশুতে কখন গর্ত্তে কখন অন্ধ হইয়া,
কখন জলে কখন ভূতলে–অনন্ড়রূপ হইয়া
কখন বিচ্ছুতে কখন গাছেতে বেড়াও ঘুরিয়া ॥

২। মনরে, বিধির বিধান সপ্ত স্থান প্রত্যক্ষ দেখিয়া
সাতটি ঘরে কর্ম ফেরে থাক বন্দী হইয়া,
আজব কারবার কর্ম যার যার বিধান দেখিয়া
কোন ঘরে দিবে কারে রাখিছে লিখিয়া ॥

৩। মনরে, সাতটি ঘর আজব খবর তুমি রাখিও জানিয়া
কোন ঘরে কোন কর্ম ফেরে কেন যাও চলিয়া,
কর তালাশ পাবে খালাস–যাবে ঘরের দরজা খুলিয়া
নইলে ঘরে যাবে বারে বারে পথ হারাইয়া ॥

৪। মনরে, আপনার স্থান শুনছি নির্বাণ সব দিলে বিকাইয়া
আত্মজ্ঞানে নিজকে চিনে প্রত্যক্ষ দেখিয়া,
রমিজ বলে ভাই যাও চলে ভক্তির বাদাম দিয়া
ভয় পেওনা চিনা রাস্ড়য় দেশে চল হাঁটিয়া ॥

বাণীটির ব্যাখ্যা :

স্থায়ী : *'রাস্ড়া'* অর্থ হলো চলার পথ।এ বাণীতে যে পথের কথা উলে-খ করা হয়েছে তা হলো *'আধ্যাত্মিক বিধান'*। এ বিধান খুঁজে বের করার জন্যই এখানে ভাবুকের জ্ঞান তার মনকে তাগিদ দিচ্ছে। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি ইহা মূলতঃ আমাদের (আত্মাসমূহের) দেশ নয়। আমাদের মূল বাসস্থান হচ্ছে *'আত্মার রাজ্য'* বা *'আলমে আরওয়াহ'*। তাই এ পৃথিবী হচ্ছে আমাদের জন্য বিদেশ মাত্র। এ দেশ (পৃথিবী) কর্মফল ভোগ করার জায়গা মাত্র। জ্ঞান দ্বারা আধ্যাত্মিক পথ বা বিধান খুঁজে বের করতঃ সে বিধানমতে কর্ম করে এ পৃথিবী বা কর্মক্ষেত্র হতে বিদায় নিয়ে চলে যাবার জন্য জ্ঞান মনকে উপদেশ দিচ্ছে। (উলে-খ্য যে, *জ্ঞান* ও *মনকে* যথাক্রমে *সদ্‌গুর*ু ও ভক্ত হিসেবে ধরে নেয়া যায়।)

অন্ড়রা ১ : নিজ পরমাত্মাকে যতক্ষণ পর্যন্ড় চিনতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ড় এ কর্মক্ষেত্রে জন্মমরণের ঘটনা ঘটতে থাকবে অথবা আসা-যাওয়া করতে হবে। স্রষ্টাকে না চিনা পর্যন্ড় মানবাত্মা ভুল পথে ভুল কর্ম করতঃ বিপথগামী হয়ে কোনসময় পশুতে, কোন সময় মাটির নিচে বা ভূ-গর্ভে, কোন সময় জলে এবং কোন সময় বৃক্ষ বা গাছে বাস করে এমন নিস্ড়রের বিচ্ছুতে আত্মাসমূহ অনন্ড়রূপ ধারণ করতঃ চক্রাকারে পুনঃ পুনঃ জন্ম নিয়ে ঘুরতে থাকে।

অন্ড়রা ২ : লিখকের মতানুসারে বিধির বিধান বা স্রষ্টার আইনে সকল আত্মাকে কর্ম অনুযায়ী সাতটি ঘরে বা সাতটি দলে ভাগ হয়ে জন্ম নিতে হয়।কর্ম অনুযায়ী কোন্ আত্মাকে কোন্ দলে জন্ম নিতে হবে তা পূর্বেই নির্ধারিত করা হয়ে থাকে।

অন্ড়রা ৩ : এখানে গুরু রমিজ উক্ত সাতটি ঘর বা দলকে *'আজব'* অর্থাৎ অদ্ভূত ও আশ্চর্যজনকভাবে স্রষ্টার দেয়া *আজাব* (শাস্ড়ি)-এর কৌশল বলে আখ্যায়িত করেছেন। কর্ম অনুযায়ী এগুলোই দোযখের নমুনা বা নিদর্শন বলে তিনি উলে-খ করেছেন। তিনি আরও বলছেন যে, মুক্তির বিধান সঠিকভাবে তালাশ করতঃ সেভাবে কর্ম করলে শাস্ড়ির ঘর হতে মুক্তি ও পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। নতুবা বার বার পশুতে জন্ম নিয়ে দোযখ বাস করতঃ শাস্ড়ি ভোগ করতে হবে।

অন্ড়রা ৪ : এ স্ড়বকে গুরু রমিজ উক্ত দোযখের শাস্ড়ি হতে পরিত্রাণ পাবার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে আত্মজ্ঞান অর্জন করে সদ্‌গুরুর মাধ্যমে স্রষ্টার পরিচয় লাভ করতঃ তাঁর নিকট *সর্বস্ব অর্পণ* বা আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে নির্বাণ, মোক্ষ বা জন্মচক্র হতে (দোযখভোগ হতে) পরিত্রাণ লাভ করা যায়। এভাবে যিনি স্রষ্টাকে চিনে সদ্‌গুরু ও স্রষ্টার প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস রেখে তাঁর ইচ্ছায় ও ইচ্ছাশক্তিকে (ভক্তির বাদাম) কাজে লাগিয়ে আত্মার মুক্তির সঠিক বিধানে আত্মকর্ম সম্পাদন করতে পারেন তিনি-ই নির্ভয়ে নিজ ইচ্ছায় নিজ দেশ *আলমে আরওয়ায়* চিনা রাস্ড়য় সহজে (*হাঁটিয়া*) চলে যেতে পারবেন।

মহাগুরু রমিজ এ পৃথিবীতেই সর্বজীবের মধ্যে সাতটি দোযখ বা নরক এর নমুনা ও দৃষ্টান্ড় রয়েছে বলে মনে করতেন। *'সর্বজীব'* বলতে তিনি *চৌরাশি লক্ষ* প্রকার পর্ব বা পরিবারের জীবকে বুঝিয়েছেন। চৌরাশি লক্ষ প্রকার পরিবারের অন্ড়র্ভুক্ত বহু প্রজাতি রয়েছে বলে তিনি মনে করতেন। উক্ত চৌরাশি লক্ষ প্রকার জীব সমান সাতটি ভাগে বিভক্ত হয়ে বিরাজমান রয়েছে। সুতরাং প্রতি ভাগে বার লক্ষ প্রকার পরিবারের জীব অর্থাৎ সাত ভাগে ১২ × ৭ = ৮৪ লক্ষ প্রকার জীব অস্ড়িত্বমান।

৭টি ঘর অর্থ হলো ৭টি দল বা জাতি। এই ৭টি ঘর বা স্থানের প্রকৃত অর্থ হলো সর্বজীবের ৭টি দোযখ বা নরক।

অনন্ড় পাপের ফলে মানবগণ অনন্ড়রূপ ধারণ করে ৭টি দোযখে বা নরকে ফল ভোগ করে থাকে। মানবজনমের পাপমুক্ত না হওয়া পর্যন্ড় অপর ৬ জাতিতে জন্ম নিয়ে কর্মফল ভোগ করতে হয়। কর্মফল ভোগ করা শেষ হলে স্রষ্টার কৃপায়, কোন এক পর্যায়ে যেয়ে, পুনরায় মানবজন্ম ধারণ করতে পারে। গুরু রমিজ কর্মবাদী বলেই অনন্ড় কর্ম ও কর্মফলের এ মতবাদ এর বাস্ড়ব নমুনা ও দৃষ্টান্ড় তাঁর ভক্তদের নিকট ব্যক্ত করেছেন। অতএব রমিজমতে কর্মফল ভোগ করার জন্য দেখা যায় যে স্রষ্টা পৃথিবীতেই কঠিন আজাবের (শাস্ড়ি) ব্যবস্থা করেছেন।

মহাগুরু রমিজের মতে পৃথিবীতে সর্বজীবের দোযখ বা নরক :	মহাগুরু রমিজের মতে বেহেশতের বিবরণ :
১ম দোযখ বা নরক : খোঁড়া, কালা বা বয়রা, অন্ধ, কানা, বোবা, রাস্ড়য় রাস্ড়য় ঘুরে বেড়ায় খেতে পায় না, নপুংশক, ধবল, বিকলাঙ্গ ইত্যাদি। এই ঘরে মানবের মধ্যেই ১২ লক্ষ প্রকারের জীবের স্থান। **২য় দোযখ বা নরক :** হস্ড়ি, গহ্বার, বাঘ, ভাল-ুক, শুকর, শৃগাল, কুকুর, উট, গরু, ঘোড়া, ছাগল ইত্যাদি চতুষ্পদ জন্তু বা প্রাণী। এখানেও ১২ লক্ষ প্রকারের জীবজন্তুর স্থান। **৩য় দোযখ বা নরক :** পৃথিবীতে যাবতীয় মৎস্যকূল এই ৩ নম্বর দোযখের অন্ড়র্ভুক্ত। ইহাতে ১২ লক্ষ প্রকারের জীবের স্থান। **৪র্থ দোযখ বা নরক :** পৃথিবীতে সমস্ড় সর্পজাতীয় জীবের বাসস্থান এই দোযখে। ১২ লক্ষ প্রকারের জীবের বিচরণভূমি এই দোযখে। **৫ম দোযখ বা নরক :** যে সমস্ড় জীব ভূ-গর্ভে বাস করে যেমন- ইঁদুর, পোকা, কেঁচো ইত্যাদি ৫ম দোযখের বাসিন্দা। এখানেও রয়েছে ১২ লক্ষ প্রকারের জীব। **৬ষ্ঠ দোযখ বা নরক :** পৃথিবীতে পক্ষী জাতীয় যত জীব, যারা আকাশে উড়ে বেড়ায় তাদের বাসস্থান ৬ষ্ঠ দোযখে। এখানেও ১২ লক্ষ প্রকারের জীব বিচরণ করে। **৭ম দোযখ বা নরক :** বিচ্ছু, বিছার দল, মাকড়সা জাতীয় জাতির আবাস এই ৭ম দোযখ। ইহাও ১২	গুরু রমিজ ৮টি বেহেশ্ত বা স্বর্গের মধ্যে ৩টি বেহেশ্ত বা স্বর্গ পৃথিবীতেই বিদ্যমান আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। নিম্নে ইহাদের উলে- খ করা হলো : **৬ষ্ঠ বেহেশ্ত :** যাঁরা রাজা-মন্ত্রী তাঁদের স্থান ৬ষ্ঠ বেহেশ্ত বা স্বর্গ। **৭ম বেহেশ্ত :** উচ্চ রাজকর্মচারী বা Higher officer – এর স্থান এই ৭ম বেহেশ্ত বা স্বর্গ। **৮ম বেহেশ্ত :** জমিদার, তালুকদার, সওদাগর বা Merchants, শিল্পপতি তাঁদের স্থান ৮ম বেহেশ্ত। * উলে- খ্য যে, গুরু রমিজের মতে ৮ টি বেহেশতের মধ্যে ৩টি পৃথিবীতে এবং বাকী ৫টি আলমে আরওয়ায় অবস্থিত।

লক্ষ প্রকার জীবের আবাসস্থল। ইহার শাস্ড়ি বা আজাব অত্যন্ড় কঠিন। সবসময় তারা স্বেচ্ছায় জীবন বিসর্জন দেয়।মানুষের হাতে বা পশু পক্ষীর আক্রমণেও এদের জীবনাবসন ঘটে।

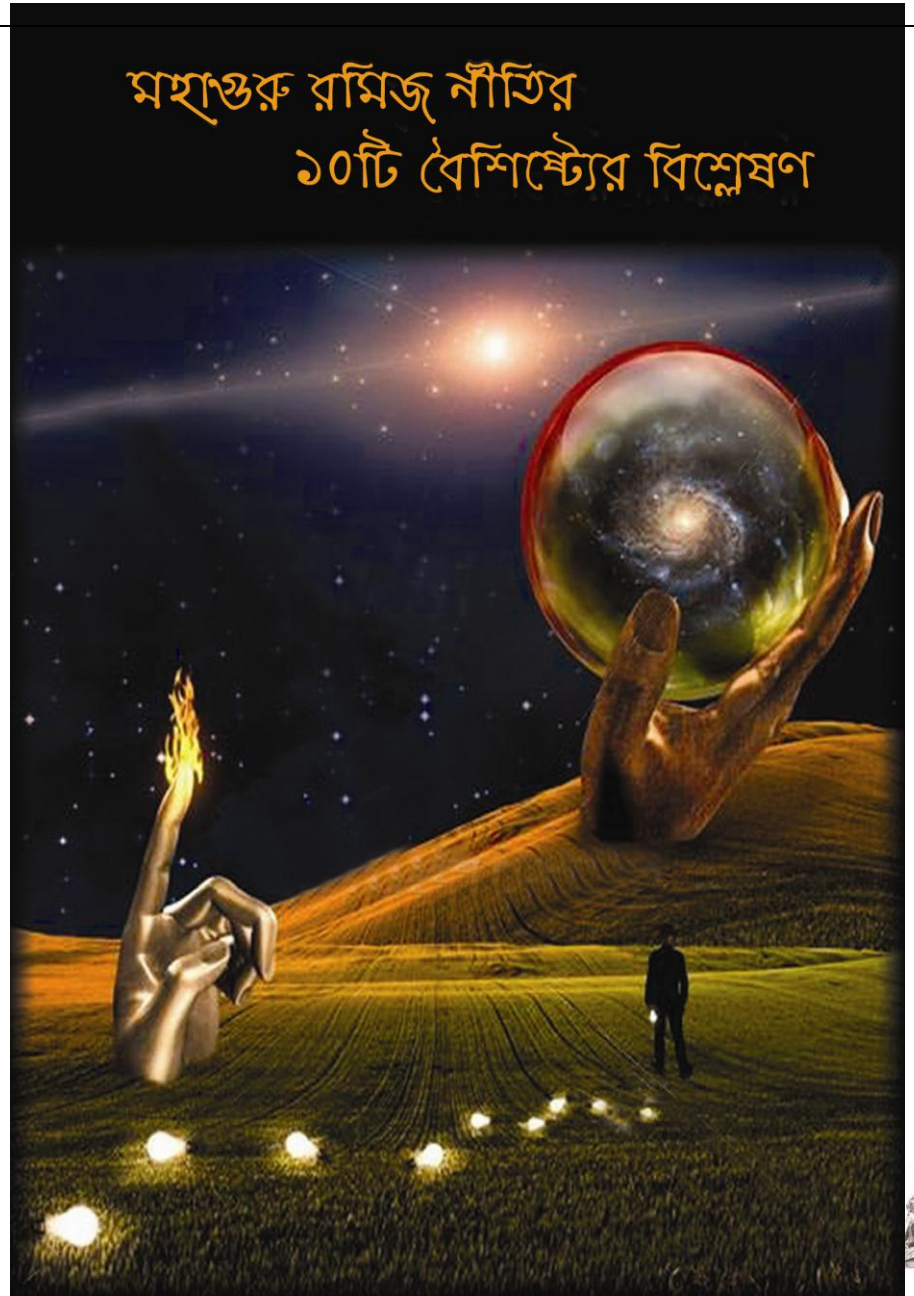

মহাগুর ও মহাসূফী হযরত খন্দকার রমিজ উদ্দিনের নীতির ১০টি বৈশিষ্ট্যের বিশে- ষণ

১নং বৈশিষ্ট্য:

স্রষ্টা এক ও সর্বজীবে বরাজমান।

ব্যাখ্যা ঃ ইহা গুর রমিজ নীতির প্রধান ১০টি বৈশিষ্ট্যের প্রথম বৈশিষ্ট্য।

বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা:

(১) ১৯২৭ সালে বেলজিয়ামের জ্যোতির্বিজ্ঞানী জি.লেমেটার মহা বিশ্বের সম্প্রসারণের একটি ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন যে, সুদূর অতীতে (১৫ বিলিয়ন বা ১৫ শত কোটি বৎসর পূর্বে) মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তু সংকুচিত অবস্থায় একটি বিন্দুর মত ছিল- ঠিক যেন একটি অতি পরমাণু (Super atom)।

আজ থেকে ১৫ বিলিয়ন (১৫ শত কোটি বৎসর) পূর্বে এই অতি পরমাণুর মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে, ফলে মহাবিশ্ব অবিরতভাবে সম্প্রসারিত হতে থাকে। পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছুটতে থাকে।

এসব পুঞ্জ থেকেই তৈরী হয়েছে ছায়াপথ, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি। সেই থেকে মহাবিশ্বের সবকিছু অবিরাম পরস্পর থেকে দূরে যাচ্ছে। আদি এই বিস্ফোরণকে বলা হয় “বিগব্যাং” (Bigbang) বাংলায় একে বলা যেতে পারে “মহা বিস্ফোরণ”।

পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তাঁর “A Brief History of Time" (কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস) গ্রন্থে মহাবিশ্ব সৃষ্টির এই “বৃহৎ বিস্ফোরণ” বা মহা বিস্ফোরণ তত্ত্বের পক্ষে যুক্তি দেন এবং পদার্থ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন।

বিজ্ঞানের এ তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা বস্তু-অবস্তু, ভূত-পঞ্চভূত, অশক্তি-অনন্তশক্তি, শূন্য-মহাশূন্য বিজ্ঞানের এ তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা থেকে ইহা সুস্পষ্ট যে, মহা বিশ্বের বস্তু, অবস্তু, ভূত, পঞ্চভূত, অশক্তি, অনন্ত শক্তি, শূন্য, মহাশূন্য ইত্যাদি যা কিছু আছে সকলই একটি বস্তু (অতি পরমাণু Super atom) হতে সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং-

১। সকল সৃষ্টির মূল এক ও অদ্বিতীয়।

২। একজন মানব শিশুর মা ও বাবা নির্দিষ্টভাবে একজন একজন করে থাকে।

৩। উপরোক্তভাবে প্রতিটি প্রাণী ও জীবের বেলায় একই নিয়ম বা ব্যবস্থা।

৪। একটি ডিম্ব হতে একটি মাত্র বাচ্চাই সৃষ্টি হয়।

৫। উদ্ভিদ জগতে একটি বীজ হতে সর্ব প্রথম অংকুরোদ্গম এর মাধ্যমে একটি অঙ্কুর বা একটি চারাই সৃষ্টি হয়।

৬। পুরুষের বীর্য্যের একটি শুক্রকীট মহিলার বীর্য্যের একটি ডিম্বানুকে নিশিক্ত করে একটি বাচ্চাই সৃষ্টি করে।

৭। বিভিন্ন মানবদেহের D.N.A টেস্ট করলে (D.N.A Profiling) ভিন্ন ভিন্ন ফল পাওয়া যায়। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেকটি মানবের দেহ আলাদা আলাদা সত্তা দ্বারা গঠিত। কারো সাথে কারো মিল নেই। অর্থাৎ প্রত্যেকটি আলাদা আলাদাভাবে একটি একটি করে স্বত্বাধিকারী।

৮। একজনের হাতের আংগুলের ছাপ (finger print) কোন সময়ও আরেকজনের আংগুলের ছাপের অনুরূপ হয় না। এক একজনের আংগুলের ছাপ অসাধারণভাবে এক এক রূপ হবে।

এইভাবে বিশে-ষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বের সকল কিছুই এক হতে সৃষ্টি এবং ইহাই বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সকল সৃষ্টিই একত্ববাদী। ইহাই সৃষ্টির বিশিষ্ট অদ্বৈত মতবাদ বা সৃষ্টির বিশিষ্ট্য একত্ববাদ নীতি।

এই মতবাদ হলো স্রষ্টার সৃষ্টির একটি বিশেষ কৌশল। স্রষ্টাকে কেহ সৃষ্টি করেন নাই। তিনি নিজেই নিজেকে নিজ ইচ্ছায় এবং ইচ্ছা শক্তি বলে সৃষ্টি করেছেন। তাই তিনি একত্ববাদের নীতি অনুসারে এক ও অদ্বৈত এবং বিশেষভাবে অদ্বৈত বা বিশিষ্ট অদ্বৈত।

দার্শনিক যুক্তি বা দার্শনিক ব্যাখ্যা ঃ

১। উক্ত একত্ববাদ বলতে এতটুকুই বুঝা যায় যে, আমরা জানি বাংলাদেশে একজন বিশ্ববিখ্যাত কবির নাম বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল ইসলাম নামে পৃথিবীতে অনেক লোক আছে। কিন্তু বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের চেহারায়, একই বর্ণে, একই কণ্ঠস্বরে, একই গুণে গুণান্বিত, একই DNA সম্বলিত আর একজন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম কোথাও খুজে পাওয়া যাবেনা। তাঁর দৃষ্টান্ত কেবল সে নিজেই। তাহলে, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এ বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে মাত্র একজনই। তাঁর মত আর একজন কোথাও নেই। সে অদ্বৈত এবং বিশেষভাবে অদ্বৈত। তার মানে সে বিশিষ্ট অদ্বৈত।

সুতরাং, এই অভিনব চমৎকার বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে যত মানব, যত জীব, যত প্রাণী ইত্যাদি জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে সর্বভূতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে সবই বিশিষ্ট অদ্বৈত রূপ ধারণ করে আছে। এখানেও স্রষ্টার একত্ববাদ কাজ করছে। অর্থাৎ বহুরূপীভাবে স্রষ্টা এক এবং অদ্বিতীয়।

২। রমিজ দর্শন অনুযায়ী সর্বজীবে বিরাজমান স্রষ্টার অস্তিত্বের বলিষ্ঠ যুক্তি হিসেবে বলা যায় যে, একটি বিরাট শক্তি সম্পন্ন জেনারেটর হতে বিদুৎ শক্তি প্রবাহের ফলে রং বেরংগের নানা প্রকার বৈদ্যুত্মিক বাল্ব আলো বিকিরণ করতে পারে। যদিও বিভিন্ন প্রকার বাল্ব ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শক্তি সম্পন্ন হয়ে আলো বিকিরণ করে থাকে। তথাপি উহাদের মূল শক্তির উৎস এক এবং অভিন্ন। যার গঠন যে রকম উহা সে প্রকারের আলোই বিকিরণ করতে সক্ষম।

মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি জীব যেন কর্ম অনুযায়ী গঠিত এক একটি বাল্ব (বাতি), আর সেই বিরাট শক্তি সম্পন্ন জেনারেটর হচ্ছে স্রষ্টা, যার দেয়া জ্ঞানরূপ শক্তি ও আলোরূপ আত্মার (নূরের জ্যোতি) উপস্থিতিতে প্রত্যেকটি জীব তাঁর নিজস্ব সত্তা নিয়ে এ বিশ্ব কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করতে সক্ষম। অর্থাৎ অনন্ত ক্ষমতা সম্পন্ন স্রষ্টার মূল শক্তির প্রতিফলনে প্রতিফলিত হয়ে প্রত্যেকটি জীব বেমিছাল রূপ (বিশিষ্ট অদ্বৈত) ধারণ করতঃ নিজ নিজ পরিবেশে বিচরণ করছে।

তাহলে "যে সত্তা (পরম আত্মা) মহাবিশ্বে সর্বজীবে, সর্বভূতে, সর্বত্র, সর্বক্ষণ বিরাজিত তিনিই স্রষ্টা"।

৩। স্রষ্টার অস্তিত্ব ও অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মে ও মতে নিম্নরূপ বর্ণনা দেয়া আছে।

(ক) ইসলাম ধর্ম মতে-

"ফা আইনামা তুয়াল-ু ফাসাম্মা ওয়াজ হুল-া"

অর্থ ঃ *"তোমরা যেদিকে মুখ ফিরাইবে সেদিকেই আল-াহ্‌র চেহারা দেখতে পাইবে"।* -(সূরা বাকারা ঃ আয়াত-১১৫)

"ওয়া নাহ্‌নু আকরাবু এলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ"

অর্থ ঃ *"আমি তার (মানুষের) শাহ্‌রগের চেয়েও নিকটে"* -(সূরা কাফ ঃ আয়াত-১৬)

মানুষের সাথে আল-াহ্‌র গভীর সম্পর্ক ও মমত্ববোধের বিষয়ে হাদীসে কুদ্‌সীতে তিনি নিজেই এরশাদ করেন-***"আল ইনছানু সিররী ওয়া আনা সিররুহু"***

অর্থ ঃ "মানুষ আমার রহস্য আর আমি মানুষের রহস্য"

এখানে রহস্য-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে *"দূর্বোধ্য গুপ্ত তথ্য"*। "তাহলে স্রষ্টার নিকট মানব-সৃষ্টি যেমন গোপনীয় এবং দূর্বোধ্য, মানুষের নিকটও স্রষ্টার সকল বিষয় গোপনীয় ও দূর্বোধ্য। ইহা এল্‌মে মারেফাতের বিষয় বটে। সুতরাং, মানব এবং স্রষ্টার মধ্যে এতই গভীর সম্পর্ক যে, তা এল্‌মে মারেফত ছাড়া কিংবা অতীন্দ্রিয় বোধ যাদের আছে তাদেরকে ছাড়া এবং স্রষ্টাকে ছাড়া আর কেহই বুঝবে না"।

(খ) সনাতন ধর্মমতে (হিন্দু ধর্ম)

১। **"যথা জীব তথা শিব"**
অর্থাৎ- সকল জীবে বা সর্বজীবে শিব এর অবস্থান।
তার মানে সর্বজীবে স্রষ্টা অবস্থান করেন।

২। **"নররূপে নারায়ণ"**
অর্থ- সকল মানবের মধ্যেই নারায়ণ বা স্রষ্টা অবস্থান করেন।

হিন্দু মতে- যিনি নরনারী বা সর্বজীবের আশ্রয়স্থল তিনিই নারায়ণ।

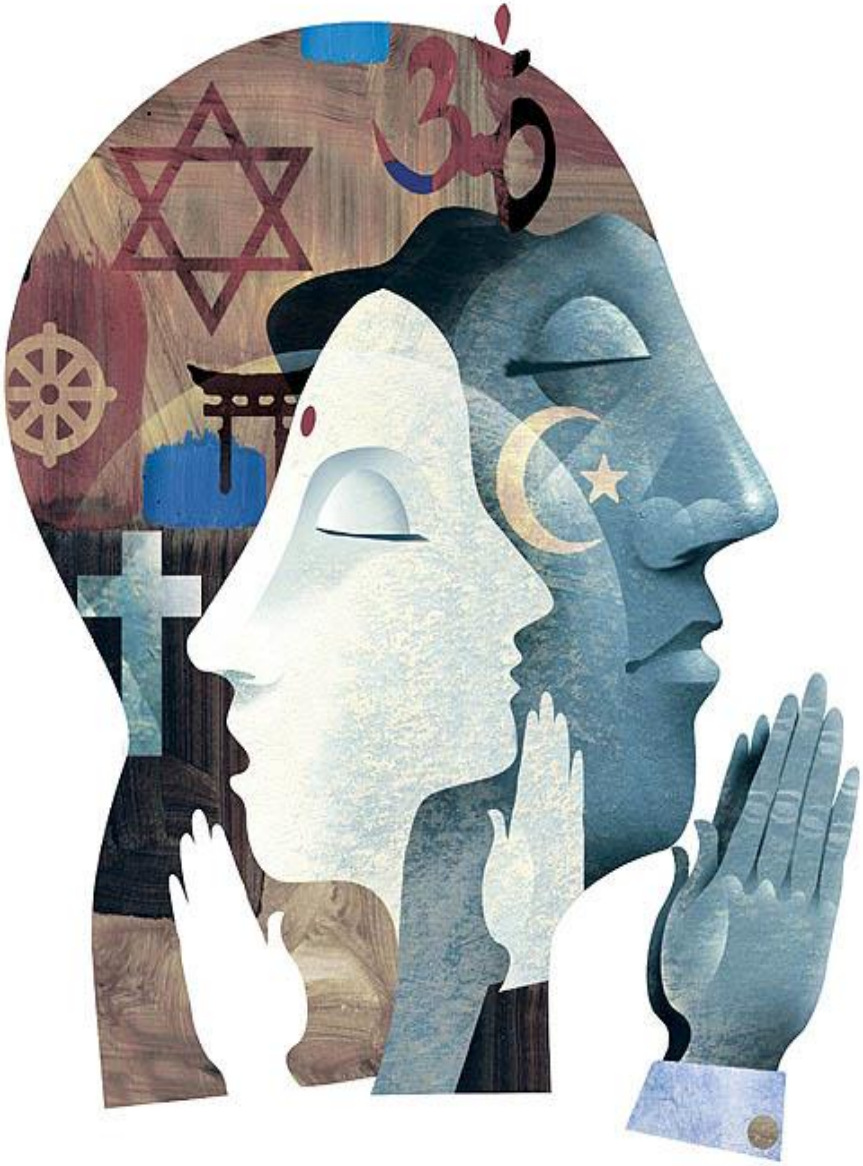

(গ) গুরু রমিজ মতে-

স্রষ্টা মানুষ ও সর্বজীবে বিরাজমান এ সম্বন্ধে মহাগুরু রমিজের ভাষায় তিনি নিজেই বলেন-

- ***"প্রতি জীবে আছেন প্রভু কর্মফল সত্য***
  একেক কর্মের একেক ফল রূপ তার অনন্ত"

  উপদেশ-১৬ (অলৌকিক সুধা)

- ***"একের সংগে আরেকের তুলনা না হবে***
  বেমিছালভাবে তিনি আছেন প্রতি জীবে"

  উপদেশ-২০ (স্বর্গের সুধা)

- ***"মানুষের সংগে যদি স্রষ্টার সংস্রব আছে***
  জ্ঞানের আঁখি খুলিয়া দেখ পাবে নিজের কাছে"

  উপদেশ-১১ (স্বর্গে আরোহণ)

- ***"আরও দেখবে অনন্ত রূপ অনন্ত জীবে স্থান***
  জাতে জাতে মিশামিশি প্রত্যক্ষ প্রমাণ"

  উপদেশ-১২ (স্বর্গে আরোহণ)

রমিজ নীতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য

সর্বজীবে দয়া প্রদর্শন:

রমিজ নীতির ১নং বৈশিষ্ট্যে প্রসঙ্গগত উলে- খিত হয়েছে যে, স্রষ্টা- সর্বজীবে, সর্বভূতে, সর্বময়, সর্বসময় বিরাজমান আছে। বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও যুক্তি সহকারে রমিজ নীতির এই বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণযোগ্য করা হয়েছে।

তাই, সর্বজীবের মধ্যেই স্রষ্টার অবস্থানকে খুজে বের করতে হবে। জীব বা প্রাণী এবং মানবের সকলের আত্মাই এক আত্মা (পরম আত্মা) হতে সৃষ্ট।

মূলতঃ সকল আত্মাই (সর্বজীবের আত্মা) মানব আত্মা। মানবগণ পৃথিবীতে বসবাস করার সময় পূর্ব কর্ম ফেরে (জন্মান্তরবাদ অনুসারে) এবং ষড়রিপু ও ইন্দ্রিয়াদির তাড়নায় জ্ঞান ও বিবেককে যথাযথ কাজে না লাগিয়ে বিবেক বর্জিত যথেচ্ছাচারভাবে কাজে লাগিয়েছে। বিকৃত জ্ঞানকে পাশবিক ও অমানবিক কাজে ব্যবহার করার ফলশ্রুতিতে মানুষ হয়ে যে সমস্ত পশুর ন্যায় আচরণ করেছে ঐ সমস্ত পশুর আকার ধারণ করতঃ পুনঃ জন্ম নিয়েছে।

সুতরাং, আপাততঃ আমরা আমাদের চারদিকে বিভিন্ন পশু বা অন্যান্য জীব দ্বারা বেষ্টিত অবস্থায় দেখছি।

বর্তমান যুগে বা সময়ে অধিকাংশ মানুষ চলনে, বলনে, আচরণে, কর্মে মানুষ হয়েও অমানুষের কর্মে লিপ্ত। মানুষ মানুষকে ঠকাচ্ছে, মানুষ মানুষকে তুচ্ছ কারণে খুন করছে। এক মানুষের প্রাপ্য অন্য মানুষে কেড়ে নিচ্ছে। চুরি ডাকাতি, রাহাজানি, লুণ্ঠন, হাইজ্যাক, ধর্ষণ, বিভিন্ন অফিস ও সংস্থায় কর্মচারী হতে কর্মকর্তা পর্যন্ত ঘুষ নেয়া ও দেয়া দৈনন্দিন রীতি রেওয়াজ হয়ে গেছে। যারা এ সমস্ত অপকর্মে লিপ্ত তারা কারা ? তারাও মানুষ। তাদের বাইরের চেহারা মানুষের। কিন্তু তাদের ভিতরে আরেকটি চেহারা বিদ্যমান আছে। আর সেটি হচ্ছে পশুর চেহারা। তাদের আত্মাগুলো ভিতরগতভাবে পশু আত্মায় রূপ নিয়েছে। পরজন্মে তারা এই পশুর স্বভাব নিয়ে পশুতে জন্মধারণ করবে।

সুতরাং, বর্তমানে আমরা যত পশু বা অন্যান্য জীব দেখছি সবই পশু আকারের মানব। তাদের স্বভাবকে আমরা অপছন্দ করি কিন্তু তাদের পরমাত্মাকে ভালবাসি। তাই, মানবকে যেমন আমরা ভালবাসি এবং মানবের প্রতি যেমন মানব সুলভ আচরণ করি, তদ্রূপ আপাতঃ দৃষ্টিতে পশু আকারের মানবগুলোকেও প্রকৃত মানবের মতই ভালবাসা ও ভাল আচরণ করা উচিৎ। মানবের আত্মা ও পশুদের আত্মা একই পরম আত্মার জাত। সুতরাং, রমিজের নীতি অনুযায়ী আমাদের সর্বজীবে দয়া করতে হবে। সর্বজীবকে দয়া করা হলে মানবকেই দয়া করা হলো।

মানবের ক্বাল্‌বে (হৃদয়ে) যদি স্রষ্টার বাসস্থান হয়ে থাকে তবে সর্বজীবের ক্বাল্‌বে (হৃদয়ে) একই স্রষ্টার বাসস্থান আছে। কাজেই, সর্ব জীবকে ভালবাসলে স্রষ্টাকেই ভালবাসা হলো।

আমাদের আশে পাশে অনেক দরিদ্র, অনেক ভিক্ষুক, অতি নিকটের আপন দরিদ্র, অনেক প্রাণী, অনেক জীব অর্ধাহার অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। তাদের ক্বাল্‌বে (হৃদয়ে) স্রষ্টাইতো বাস করছেন। তাদেরকে আশ্রয় দান, অন্ন দান, খাদ্য দান চিকিৎসা দান ইত্যাদি সেবা দান করা হলে স্রষ্টাকেইতো করা হলো। যারা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী (মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী যাই হোক), ইসলাম ধর্ম মতে আমাদের সাধ্য থাকলে সর্ব প্রথম তাদেরকেই সাহায্য সহায়তা করা শ্রেয়।

হাদীসেও উক্তরূপ দয়া প্রদর্শনের কথা উলে-খ আছে। বর্ণিত আছে যে- ***''আল্‌-খাল্‌কু ইইয়ালুল-াহি ফা আহাব্বুল খাল্‌কি ইলাল-াহি মান আহসানা ইলাইইয়ালিহি''***
অর্থ: *"সকল সৃষ্টিই আল-াহ্‌র আপনজন। অতএব, তিনিই আল-াহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় যিনি তাঁর পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করেন"*
অর্থ: যে ব্যক্তি আল-াহ্‌র সৃষ্টির প্রতি দয়া করেন, আল-াহ্‌ও তাঁহার প্রতি দয়া করেন। -(ইসলাম ধর্ম শিক্ষা ১৯৯৬ নবম-দশম শ্রেণী। হাদীস নং-০৬। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।)

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: ***"বহুরূপে ছাড়ি কোথা খুজেছ ঈশ্বর***
জীবে প্রেম করে যেইজন,
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর"

ইহারও মূল অর্থ হচ্ছে যে, স্রষ্টার সৃষ্টি সর্বজীবকে ভালবাসলে বা সেবা করলেই স্রষ্টাকে সেবা করা হয়।

স্রষ্টাকে সেবা করা বা ভালবাসার নিমিত্তে মানব এবং সর্বজীবকে সেবা ও ভালবাসার কথা মহাগুর" রমিজ নিম্নলিখিত রূপে তাঁর ভাষায় তিনি নিজেই বলেন-

• ***''মানবকে ভালোবাস হৃদয়ে রাখি ভক্তি মানবেতে আছেন প্রভু তারে জানাও স্তুতি''*** -উপদেশ-০৯ (অলৌকিক সুধা) • ***"যাহার হস্তে কি মুখের বাক্যে জীবে না পায় কষ্ট, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী সর্বজীবে রাষ্ট্র"*** -উপদেশ-১৫ (অলৌকিক সুধা)	• ***"প্রতিবেশীর প্রতি কর ভাল ব্যবহার বিপদে সম্পদে তাদের করিও উদ্ধার"*** -উপদেশ-০১ (স্বর্গের সুধা) • ***"কর্মফল বিশ্বমাঝে যদি হয় সত্য জীবে দয়া না থাকিলে কেহ নয় মুক্ত"*** -উপদেশ-৩৭ (অলৌকিক সুধা)

পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে- ***"ফা আইনামাতুয়াল-ু ফাসাম্মা ওয়াজহুল-া"*** - সুরা বাকারা ঃ আয়াত-১১৫

অর্থ: **"তোমরা যে দিকে মুখ ফিরাইবে সে দিকেই আল-াহ্‌র চেহারা দেখতে পাবে"**

বিশে-ষণ: আমরা যে দিকেই তাকাই সেখানেই আল-াহ্‌র সকল সৃষ্টি যথা মাটি, পানি, আলো, বাতাস, তর"লতা, বৃক্ষরাজি, পাহাড়-পর্ব্বত, সাগর-মহাসাগর, আকাশ, প্রাণী, মানুষ, বহুরূপী জীব ইত্যাদি।

আল-াহ্‌ উপরোক্ত সর্বভূতে ও সর্বজীবে বিরাজমান আছেন। সুতরাং, সর্ব সৃষ্টি ও সর্বজীবকে সেবা করলে বা ভালোবাসলে আল-াহ্‌ বা স্রষ্টাকে ভালোবাসা হলো।

তাই, রমিজের উপরোক্ত উপদেশাবলীর মর্মানুযায়ী সর্বজীবকে ভালোবাসলে স্রষ্টাকেই ভালোবাসা ও সেবা করা হলো।

রমিজ নীতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য

কর্ম অনুযায়ী ফল:

যে যা করেন তাই তার কর্ম। যিনি চাকুরী করেন চাকুরীর বেতন পেয়ে থাকেন। যিনি ব্যবসা করেন ব্যবসার লাভ লোকসান প্রাপ্য হন। যিনি কৃষি কাজ করেন তিনি কৃষির ফল পেয়ে থাকেন। ভিক্ষুক ভিক্ষা প্রাপ্ত হন। আবার যিনি কিছুই করেন না তিনি কিছুই পান না।

অর্থাৎ, যে যা করেন তিনি তার ফল প্রাপ্ত হন। কর্ম করলে অবশ্যই তার একটি ফল আছে। ভাল করলে ভাল ফল, মন্দ করলে মন্দ ফল পাবেন। ইহাই পৃথিবীর চিরাচরিত প্রথা। এগুলো হচ্ছে পার্থিব কর্মের ফলাফল।

মহাগুরু রমিজের মতবাদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যে পার্থিব কর্মের উপরন্তু আধ্যাত্মিক ও অধ্যাত্ম বিষয়ক কর্মের ফলাফলের কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ জন্ম ও জীবন, স্রষ্টা ও সৃষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কিত যে কর্ম ও কর্মফল, তার কথাই বলা হয়েছে।

উক্ত কর্মাদি করতে হলে সৃষ্টি ও স্রষ্টা এবং জন্ম ও মৃত্যুর নিগুঢ় রহস্য মানুষকে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং অনুভব করতে হবে।

কোথায় ছিলে ? কোথায় এলে ? আবার কোথায় যাবে ? এ সমস্ত প্রশ্নের প্রকৃত সমাধান পাবার জন্য মানুষ বহুকাল পূর্ব হতেই চেষ্টা করে আসছেন এবং সবার মনেই উক্ত প্রশ্নগুলোর সমাধান পাবার অনেক কৌতুহল ছিল।

পৃথিবীতে বহু ধর্ম, বহু পথ (তরিকা), বহু মত ও বহু জাতি বিদ্যমান আছে। সকল ধর্ম ও পথের বা মতের রচিত অনেক পুস্তক আছে। সংশিষ্ট পুস্তক পড়ে বা পুস্তকের মর্ম কথা জ্ঞানীগুণী লোকদের মুখে শুনে মানুষ

অনেক পূর্ব হতেই উক্ত প্রশ্নগুলোর সমাধানের অনেক কথা, অনেক কিছু অবগত হয়ে আসছেন ও হচ্ছেন। এর পরও মানুষের জানা ও বুঝার শেষ হচ্ছে না। আরো যেন কত কিছু জানা ও বুঝার আছে ! কে দেবে সে বুঝ ? কে জানাবে সে কথা ? কে সেই নিগুঢ় তত্ত্ববিদ ? সে কোথায় ? তাঁর ঠিকানা বা কোথায় ? কৌতুহলী মানব মনের কত কিছু জিজ্ঞাসা !

উক্ত জিজ্ঞাসাগুলোর সমাধান পাবার আশায় বহু পুস্তক পড়া, বহু নামকরা ওয়ায়েজিনে কেরামদের বক্তব্য শোনা, নামকরা দেশ-বিদেশের মাওলানা, মুফ্তি, পুরোহিত, পাদ্রি, ব্রাহ্মণ, প্রভুপাদ, পরমহংস, পীরে কামেল ইত্যাদি মহোদয়গণের মুখরোচক সুন্দর বয়ান, বাণী শোনা ও মুখস্ত করণ অনেক হয়েছে আরো কত কি ! তথাপি সৃষ্টি স্রষ্টা, জীবন মৃত্যু, কোথায় আসা যাওয়া হচ্ছে এর বিন্দু মাত্রও বুঝা, জানা ও উপলব্দি করা গেলোনা। কি বিস্ময়কর এ মহাবিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টি ও স্রষ্টা।

এত কিছু জানা শোনার পরও চিন্তামণিদের ভিতর থেকে (হৃদয় থেকে) কে যেন বল্‌ছে আরো একজন আপন মানুষ (বন্ধু) রয়েছেন যিনি উলে- খিত সকল প্রশ্নের বা সমস্যার সমাধানের নিগুঢ় তত্ত্ব জানেন, বুঝেন এমনকি জানাতে পারেন, বুঝাতে পারেন এবং অন্তরচক্ষু বা দিব্যচক্ষুর মাধ্যমে দেখাতেও পারেন। আর যিনি মুর্শিদ (সদ্‌গুর") তিনিই সে। মহাগুর" রমিজ আমার মনের সকল আবর্জনা দূর করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর আদেশে কর্ম করে এলহাম প্রাপ্ত হয়েছি। তাঁর ভবিষ্যৎবাণী ফলতে দেখেছি তাই আমার মুর্শিদ হলেন গুর" রমিজ। তিনি কর্মবাদী, বিশিষ্ট জন্মান্তরবাদী ও অতীন্দ্রিয়বাদী ছিলেন। তিনি অন্তরযামীও ছিলেন। তিনি তাঁর রচিত সর্বপ্রথম বাণী বইয়ে আত-চমৎকার বাস্তবমূখী উদাহরণ ও যুক্তি দিয়ে কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।

তাঁর ভাষায়- ***"মন দেখে শুনে কেন আছ ভুলে***
আসা যাওয়া তোর হলনা বন্ধ
খেটে মরবি ভবের জেলে"

- ১। আসা যাওয়া জীবের কর্মগতি, কারে তুমি জানাও স্তুতি
  কেহ নয় কারো সাথী, ভাল মন্দ সব কর্ম ফলে।
- ২। কেউ কানা, কেউ দেওয়ানা, কেউ লেংরা, কেউ খেতে পায়না, কেউ করে আমিরানা, বিচার কর নিজের দিলে দিলে।
- ৩। তুমি বল আন্‌ছি ইচ্ছা করে, যা চেয়েছি দিয়েছে মোরে
  আমি বলি তা হয় কি করে, পিতায় কি কখন ফেলে জলে।
- ৪। যদি বল এসব বিধির ইচ্ছা, তবে সাধন ভজন সবই মিছা সমান হবে রাজা প্রজা, বিচার হবেনা কোনকালে।
- ৫। রমিজ কয় এইসব শোনা কথা, এক কথার নাই আগা মাথা ঠিক করে নেও কর্মখাতা, মুক্তি পাবি ধরাতলে। বাণী-০১ (অলৌকি সুধা)

এই বাণীর মূল বিষয় বস্তু হলো- পৃথিবীতে মানুষ, অন্যান্য প্রাণী বা জীবের, জন্ম নিয়ে আসা এবং মৃত্যুর পর চলে যাওয়ার বিষয় নিয়ে।

গুর" রমিজের মতবাদ অনুযায়ী উক্ত বিষয়টি হচ্ছে জীবন-চক্র নামক পুনঃ পুনঃ পৃথিবীতে আসা যাওয়ার একটি বিশেষ কর্মগতি বা কর্মফল ভোগ করার একটি প্রক্রিয়া। অর্থাৎ মানুষ কর্ম ফেরে বা কর্মের ভাল-মন্দ বিবেচনায় পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ কর্মফল ভোগ করার জন্য জন্ম নিয়ে আসতে হয়। ইহার যুক্তি হিসেবে তিনি তাঁর

বিবেককে জিজ্ঞাসা করছেন যে, এ পৃথিবীতে কেউ কানা, কেউ দেওয়ানা, কেউ লেংরা, কেউ খেতে পায়না আবার কেউ আমির হয়ে জন্ম নিয়ে সুখে আছেন, তার কারণ কি?

যদি বলা হয় যে, তাহারা স্রষ্টার নিকট হতে যার যার অবস্থা চেয়ে এনেছেন। তবে বিষয়টি হলো এমন যে, স্রষ্টাতো সকলেরই পিতা। পিতা হয়ে যেমন তাঁর সন্তানকে জলে ফেলতে পারেন না বা ফেলে দিবেন না তদ্রূপ কোন লোক কানা লেংরা বয়রা ইত্যাদি ইচ্ছাকৃতভাবে হতে চাইলেও বিধি বা সৃষ্টির পিতা স্রষ্টা তা দিতে পারেন না, কারণ স্রষ্টা সর্ব পিতা হয়ে তাঁর সন্তানের অশুভ কামনা করতে পারেন না।

আবার যদি বলা হয় যে, ঐগুলো সবই বিধির ইচ্ছা- তাও হতে পারেনা। কারণ সৃষ্টির স্রষ্টা বা বিশ্বপিতা যদি যা ইচ্ছা তা-ই করেন এবং মানবকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা দিয়ে সেই মানবকেই ইচ্ছামত (স্রষ্টার ইচ্ছায়) কানা, বোবা, লেংরা ইত্যাদি আজাবে নিপতিত করেন তবেতো রাজা প্রজার কোন ভেদাভেদ থাকবে না। সাধন ভজনেরও কোন দরকার হবেনা। কারণ স্রষ্টার ইচ্ছায়ই যদি সব হয় তবেতো তিনি স্বেচ্ছাচারী হয়ে গেলেন এবং যা ইচ্ছা তা-ই করবেন স্রষ্টাকে ডাকার কোন প্রয়োজন থাকছে না। তিনি নিজ ইচ্ছায়ই যদি সব করেন তবে তার সাধন-ভজন-প্রশংসা ইত্যাদি নিস্প্রয়োজন।

সর্বশেষে রমিজের বিবেক বল্‌ছে ঐগুলো সবই শোনা কথা। ইহাদের কোন যুক্তি নেই।

রমিজের বিবেক আরো বল্‌ছেন ***"কর্ম অনুযায়ী ফল"***। কর্মফল ভোগতেই হবে। মানবের কর্মের জন্য মানবই দায়ী, স্রষ্টা দায়ী নন। স্রষ্টা যার যার কর্ম অনুযায়ী কর্মফল দিবেন। তিনি সূক্ষ্ম বিচারক। যে যেমন কর্ম করবে ঠিক তেমন কর্ম অনুযায়ী তার দেহ গঠন হবে।

নিজ স্বার্থের জন্য যদি কারো স্বভাব এমন হয় যেন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়/বস্তু চোখে দেখেও বলে যে, আমি দেখি নাই। তা হলে সে চোখের অপব্যবহার করলো। বিচারে সে কানা হওয়া উচিৎ এবং সে পরজন্মে কানা হয়ে জন্ম নিলে তা যুক্তিসংগত হবে। এমনিভাবে কেহ যদি অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে হাত, পাঁ, মুখ ইত্যাদির অপব্যবহার করতঃ অন্যের বিশেষ ক্ষতি করে তাহলে সে ঐ অঙ্গগুলো বিকৃত অবস্থায় নিয়েই পুনঃজন্ম নিবে। অসৎ কর্মের কারণেই পুনঃজন্ম হয়।

তাহলে যার যার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার জন্য নিজেই দায়ী। স্রষ্টা নিরপেক্ষ বিচারক। তিনি সৃষ্টির পিতা। কেহ ইচ্ছা করে বিকৃত দেহ নিয়ে জন্ম নিবে- ইহা যেমন হতে পারেনা তেমনি সৃষ্টির পিতা ইচ্ছা করে তার সন্তানকে বিকৃত দেহধারী করে সৃষ্টি করতে পারেন না। যার যার জন্ম এবং দেহের গঠন তার তার নিজ কর্মফলে হয়। অর্থাৎ সবই আত্মকর্মের ফল।

উলে- খিত বাণীটির শেষ পর্যায়ে রমিজ বলেন "ঠিক করে নেও কর্ম খাতা, মুক্তি পাবি ধরাতলে"। এই মুক্তি হচ্ছে আত্মার স্বভাব মুক্তি। মুক্তি পেতে হলে মহাগুরু রমিজের বিধান মতে আত্মাকে কলুষমুক্ত করতে হবে। তার মানে নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন করতে হবে।

ধরাতে আসা যাওয়া বন্ধ করতে হলে অথবা জন্মমৃত্যু রোধ করতে হলে বা জন্ম-চক্র হতে মুক্তি পেতে হলে মুক্তি লাভের সঠিক কর্ম তালাশ করতঃ উক্ত কর্মের মাধ্যমে আত্মার ভুল সংশোধন করতে হবে। তা হলেই জন্মরোধ হবে এবং মুক্তি পাওয়া যাবে।

এখন সঠিক আধ্যাত্মিক কর্ম করার জন্য একজন নিষ্ঠা গুরু বা চেতন গুরু বা মহাগুরু রমিজের ভাষায় সদ্‌গুরু নামক এমন একজন পথ প্রদর্শকের বিশেষ প্রয়োজন। কেবল তিনিই আত্মার মুক্তির সঠিক কর্ম করণের এবং করানোর নির্দেশ, উপদেশ, আদেশ ইত্যাদি দিতে পারেন।

তাহলে আবার সদ্‌গুরু কে ? তিনি কোথায় থাকেন ? তাঁর পরিচয় কি ? কিভাবে তাকে চিনা যায় ? তাঁর কর্মাচরণইবা কি ? তার সবই জানতে হবে।

এ বিষয়ে গুরু রমিজ একজন সদ্‌গুরু সম্বন্ধে বিস্তারিত জীবনাচরণ ও সংজ্ঞা লিখিতভাবে দিয়েছেন তা নিম্নে উলে-খ করা হলো।

মহাগুরু রমিজের মতে নিষ্ঠাগুরুর (চেতনগুরু/সদ্‌গুরু) জীবনাচরণ নিম্নে বিবৃত হলো ঃ

- ১। যিনি স্রষ্টা এক এবং সর্বজীবে বিরাজমান এ মতবাদে মনে প্রাণে বিশ্বাসী এবং নিজ কর্মের মাধ্যমে ইহার প্রতিফলন ঘটাতে পারেন ও অন্যকে সম্যক বুঝতে সক্ষম।
- ২। যিনি সর্বজীবে দয়া করেন এবং কেন দয়া করেন তা তাঁর নিজ জীবনাচরণের মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারেন ও অন্যকে আধ্যাত্মিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা উহা সম্যক বুঝাতে পারেন।
- ৩। যিনি **"কর্ম অনুযায়ী ফল"** এই মতবাদে বিশ্বাসী এবং নিজের জীবনাচরণ ও উপরোক্ত যুক্তি দ্বারা অপরকে বুঝ দিতে পারেন।
- ৪। যিনি নিজে অন্য একজন মহা নিষ্ঠাগুরুর (চেতন গুরু) কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং তাঁর মাধ্যমে আত্ম পরিচয় লাভ করেছেন বা নিজকে নিজে চিনেছেন ও আত্মকর্ম দ্বারা অন্যকে তা বুঝাতে সক্ষম।
- ৫। যিনি তাঁর গুরুর মাধ্যমে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের সাধনা করেছেন এবং এই জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য ও সহায়তা করতে পারেন।
- ৬। যিনি তাঁর চেতন গুরুর মাধ্যমে নিজ আত্মার ভুল সংশোধন পূর্বক অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, কুসংস্কার ও সর্ব প্রকার পাপাচার হতে মুক্তি লাভ করেছেন এবং মুক্তি লাভের এই নিগুঢ় রহস্য অন্যকে ব্যবহারিক কর্ম দ্বারা বুঝাতে সক্ষম।
- ৭। যিনি তাঁর নিজ দীক্ষা গুরুর আদেশ মোতাবেক দৈনন্দিন, শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, আত্মিক ইত্যাদি কর্ম দ্বারা ষড় রিপু ও ইন্দ্রিয়াদিকে দমন করেছেন, গুরুসঙ্গ বন্ধ করেন নাই, কোন দিনও গুরুর আদেশ অমান্য করেন নাই।
- ৮। যিনি স্রষ্টার তরফ হতে প্রাপ্ত ওহী, এলহাম, দৈববাণী ও স্বপ্ন সাধন করতঃ এগুলোর নিগুঢ় ব্যাখ্যা দিতে পারেন এবং ব্যাখ্যা বাস্তবে পরিণত হয় এমন প্রতীয়মান করতে পারেন।
- ৯। যিনি রুহের দেশ আলমে আরওয়াকে উপলব্ধি করেছেন এবং তার তথ্য ও ভেদ বুঝতে পেরেছেন। অধ্যাত্ম সাধনার উচ্চস্তর (মারফতের উচ্চস্তর) অর্জন করেছেন ও অন্যকে এই সাধনার পথ শিক্ষা দিতে সক্ষম।
- ১০। যিনি সাধনার স্তরে গিয়ে চেতন ও সদ্‌গুরুর আদেশে নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হয়েছেন এবং উক্ত চরিত্র গঠনের বিষয়ে অন্যকে জ্ঞান দান করার যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

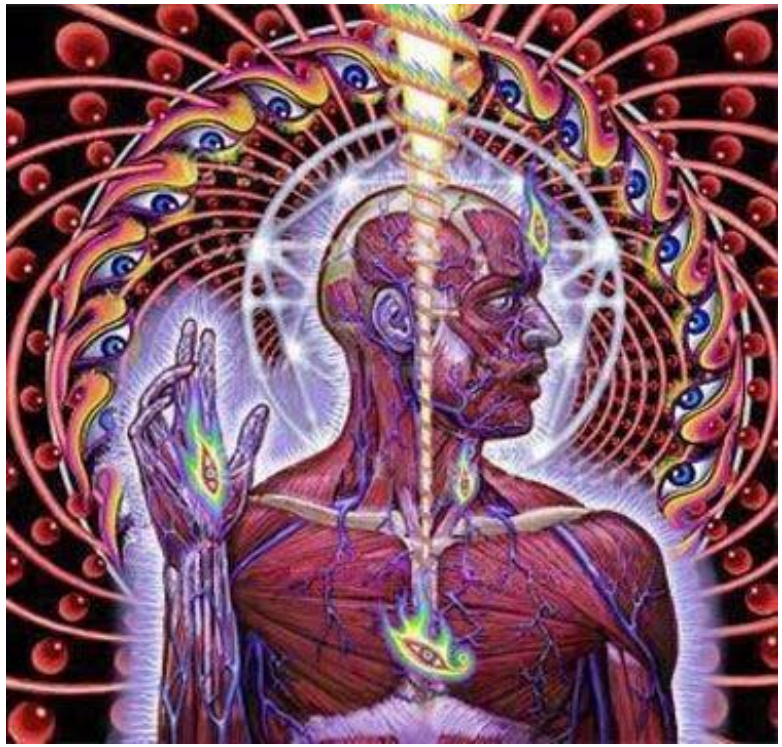

যে মহান ব্যক্তি উপরোলি-খিতভাবে (১-১০) জীবনযাপন ও জীবনাচরণ করেন তিনি মহাগুরু রমিজের মতে সদ্‌গুরুর যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

*(বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ গুরু রমিজ একজন সদ্‌গুরুর সংজ্ঞা নিম্নে বর্ণিত রূপে সুস্পষ্টভাবে উলে-খ করেছেন। এ লিখিত সংজ্ঞাটি রমিজ রচিত **"যুগ যুগান্তরের অলৌকিক কাহিনী"** নামক হাতে লিখা একটি পুস্তকে পাওয়া যায় এবং পুস্তকটি **"রমিজ বিধান ও মতবাদের"** রূপ রেখার দলিল হিসেবে তারই পরম শিষ্য ও কণিষ্ঠ্য ছেলে সন্তান এবং তাঁর উত্তরসুরী খন্দকার আমিরুল ইসলামের নিকট সংরক্ষণের নিমিত্তে হস্থান্তর করে যান)।*

সদ্‌গুরুর সংজ্ঞা: "যিনি অন্তরযামী, সত্যের সন্ধানকারী কারো মনের সমস্ত আবর্জনা দূর করতে পারেন। যার সেবা করলে বা যার আদেশ অনুযায়ী কর্ম করলে দৈববাণী প্রাপ্ত হওয়া যায়, যার কৃপায় জন্ম-মৃত্যু রোধ হয়। অনন্ত সৃষ্টির কৌশল হৃদয়ঙ্গম করে আত্মার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে এবং অনন্ত শক্তির সঙ্গে মিশে অনন্ত কর্মে যোগদান করতে পারে তিনিই সদ্‌গুরু"।

এখন উক্ত সদ্‌গুরুর সংজ্ঞা হতে ইহাই বুঝা যায় যে, সদ্‌গুরু লাভ করতে হলে একজন সত্যের সন্ধানকারী মহান ব্যক্তি হতে হবে।

সত্যের সন্ধানকারী ঃ যিনি কোন গুরু ছাড়াই নিজের অভিজ্ঞতালব্দ কান্ডজ্ঞান (Common Sense), সাধারণ জ্ঞান (General Knowledge) ও বিবেক (consciense i.e. sence of right and wrong) খাটিয়ে ভালমন্দ বিবেচনা করতঃ সকল কর্ম সমাধা করতে পারেন, সাধারণতঃ সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করতে পারেন ও সত্যের দিকে ধাবিত হয়ে সৃষ্টি ও স্রষ্টার নিরব চিন্তা ও ধ্যানে মগ্ন থাকেন তিনিই সত্যের সন্ধানকারী।

সত্যের সন্ধানকারী লোকগণ সর্বদা নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হওয়ার প্রচেষ্টায় থাকেন।

তাই অধ্যাত্ম জগতের কোননা কোন লোকের সাথে সত্যের সন্ধান- কারী লোকদের জীবনের এক পর্যায়ে যোগাযোগ হয়ে যায়। আর সেটা বাস্তবে কিংবা দৈববাণী, এলহাম, ওহী ইত্যাদি যোগের মাধ্যমে হতে পারে।

"যে যারে চায়, সে তারে পায়
চাওয়ার মত চাইতে পারলে পায়"

মহাগুরু রমিজের মতে সদ্‌গুরু এবং সত্যের সন্ধানকারী লোকদের আত্মার পূর্ব প্রতিশ্রুতি থাকে। এই প্রতিশ্রুতির কারণে যে কোন যোগের মাধ্যমে গুরু-শিষ্যের মিলন হয়ে যাবে। অতঃপর যার যার সংশি- ষ্ট কর্ম শুরু হয়ে যায়। আর এ কর্মই হলো আত্মার ভুল সংশোধনের (মুক্তির) কর্ম।

সদ্‌গুরু তার ভক্তকে মুক্তির কর্মের আদেশ, নির্দেশ, উপদেশ ইত্যাদি দিবেন এবং ভক্ত সঠিকভাবে তা পালন করবেন এবং মুক্তি পাবেন। আত্মার মুক্তির কর্মের বিস্তারিত বিবরণ (রমিজ বিধান মতে) অত্র পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আত্মার মুক্তির জন্য মহাগুরু রমিজ আত্মকর্মের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। কর্মকে অত্যন্ত বড় করে দেখেছেন। তাই, তিনি তাঁর সর্বপ্রথম বাণীতে যেমন আত্ম কর্মের কথা বলেছেন, তেমনি তার ১নং পুস্তকে (অলৌকিক সুধা) উপদেশ বাণী বা সিদ্ধবাক্য লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করেছেন কর্মের বিষয় নিয়ে এবং সমাপ্ত করেছেন কর্ম প্রসঙ্গ দিয়েই। পাঠক ও পন্থীদের সুবিধার জন্য আধ্যাত্মিক কর্ম সংশি- ষ্ট সিদ্ধবাক্যগুলি নিম্নে প্রদত্ত হলো যাহার পুর্ণাঙ্গ বিশে- ষণ অত্র পুস্তকে পূর্বেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

কর্ম সংশি- ষ্ট সিদ্ধবাক্য বা আপ্তবাক্য সমূহ

সবচেয়ে বড় হল আপনার কর্ম *বিশ্বমাঝে কর্মছাড়া নাহি কোন ধর্ম।* উপদেশ-০১ (অলৌকিক সুধা) *কর্ম ছাড়া ধর্ম কি জগতে দেখিনা* *ধর্ম সব দলাদলি আসলে আত্মার কামনা।* উপদেশ-০৮ (অলৌকিক সুধা) *প্রতি জীবে আছেন প্রভু কর্মফল সত্য* *একেক কর্মের একেক ফল রূপ তার অনন্ত।* উপদেশ-১৬ (অলৌকিক সুধা) *কর্মফল বিশ্বমাঝে যদি হয় সত্য* *জীবে দয়া না থাকিলে কেহ নয় মুক্ত।* উপদেশ-৩৭ (অলৌকিক সুধা) *ধর্ম কর্ম কোন্‌টি সত্য দেখিও ভাবিয়া* *না বুঝিয়া মিথ্যা কথা যাইওনা বলিয়া।* উপদেশ-০৫ (স্বর্গের সুধা)	*যে কর্ম সত্য বলি পেয়েছ প্রমাণ* *ভুলিওনা যে পর্যন্ত দেহে আছে প্রাণ।* উপদেশ-১২ (স্বর্গের সুধা) *নির্দিষ্ট রয়েছে যাহা তোমার কর্মের বিধানে* *তাহাই ভূগিতে হইবে আনন্দিত মনে।* উপদেশ-১৩ (স্বর্গের সুধা) *স্রষ্টার দয়া কর্মফল যে জানে সত্য-* *ইচ্ছাকৃত জীবন মরণ সেই ভবে মুক্ত।* উপদেশ-০৩ (স্বর্গে আরোহণ) *পূণ্যাত্মা যেইজন আসেনা আর ফিরে* *কর্মফলে পাপাত্মার জন্ম বারে বারে।* উপদেশ-১৯ (স্বর্গে আরোহণ)

গুর" রমিজ কর্ম, কর্মফল, কর্মবাদ ও সংশি- ষ্ট জন্ম ও জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে তাঁর রচিত উপরোলি- খিত উপদেশ বাণীতে যেমন বলেছেন তদ্র"প তাঁর রচিত অনেক মরমী ও ধ্র"পদি সঙ্গীতে উলে- খ করেছেন। তার অল্পকিছু নিম্নে উদৃত করা হলো ও রমিজ বিধান মতে বিশে- ষণ দেওয়া হলো।

আসা যাওয়া জীবে সর্বদায় *কর্ম ফেরে এ সংসারে* *ঠেকিয়াছ বিষম দায়।* ১। চৌরাশি করিও লক্ষ্য, কর্ম সত্য দেখবে স্পষ্ট জীবের জীবন মহাকষ্ট, বন্দী সবে জেল খানায়। ২। সর্বজীবে বিরাজমান, দেখে নাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ শোনা কথায় না দিও কান, দেখ যার যে কর্ম খাতায়। ৩। কর্ম জীবের আসল তত্ত্ব, কর্ম বলে জীবন মুক্ত সত্য যাহা হবে ব্যক্ত, বিশ্বাস হবেনা কার কথায়। ৪। রমিজ কয় কর কর্ম তালাশ, আসা যাওয়ার পাবি খালাস জন্ম মৃত্যু করবিরে পাশ, ভয় পাবিনা চিনা রাস্তায়। –বাণী-০২ এর অংশ (অলৌকিক সুধা)	*আমি বুঝিনা বুঝাব কিসে* *মন্দ করলে হয়রে মন্দ* *ফল ভোগে তার অবশেষে।* (৪) রমিজ কয় *কর্মফল, এইমাত্র তোর আছে সম্বল* শয়তানে কি দোষী বল, পথ হারালী অবিশ্বাসে। -বাণী-০৪ এর অংশ (অলৌকিক সুধা) *তুমি কর্মে বাঁধা জগৎ জোড়া* *তুমি আমি এক সূতে বাঁধা* *জায়গা নাই তোর আমি ছাড়া।* (১) যার *যে কর্মে আসে পুনঃ কর্ম মতে হয় গঠন* *কর্মফল হয় না কর্তন*, এই হইল বিধানের ধারা। (৪) রমিজ কয় *চাও যদি কর্মের মুক্তি, সর্বজীবে জানাও স্তুতি* আত্মজ্ঞানে জ্বালাও বাতি, দেখবে তুমি জিতে মরা। -বাণী-০৭ এর অংশ (অলৌকিক সুধা)
মন কার জন্যে তোর এই চাকুরী যাবার কালে *সব যাবে ফেলে খাটবেনা তোর বাহাদুরী।* (২) *কর্ম ফলে এই ভূম"লে*, ঘুরে বেড়াও নিজের ভুলে	*মন দেখে যা তুই এ সংসারে* *বলি তোরে তোর কর্ম ফেরে* *আসা যাওয়া বারে বারে।*

বেলা নাই দেখ নয়ন খুলে, ডুবে যায় তোর সাধের তরী।

(৩) *আসলি কর্মের পাইতে খালাস*, ইচ্ছায় কেন নিতেছ ফাঁস
বধ করলে বধ হবে বিশ্বাস, জ্ঞানের চক্ষে দেখ চিন্তা করি।

বাণী-০৮ এর অংশ (অলৌকিক সুধা)

তোরে আর কত বুঝাব বলিয়া
অন্ধের সামনে ধরিলে দর্পণ
কি ফল হবে দেখ ভাবিয়া।

(৩) *যার যে কর্মফল আছে সে ভুগিবে*, নররূপে কিংবা যাইয়া পশুতে
না হলে আত্মজ্ঞান, নাহি পরিত্রাণ, প্রতি ঘটে বেড়ায় ঘুরিয়া।

(৪) *রমিজ বলে কর কর্মের সন্ধান, কি কর্মে তুই পাবি পরিত্রাণ*
হলে আত্মজ্ঞান, দেখবি প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ব্যক্ত হবে সত্য দেখিয়া।

াণী-১০ এর অংশ (অলৌকিক সুধা)

কারে কর তুমি ডাকা ডাকি
কোথায় ছিলে কোথায় এলে
কোথায় যাবে পথ ভোলা পাখী।

(১) ডাকলে কিন্তু দেয়না সাড়া, ডেকে ডেকে আত্মহারা
শোনেনা সে কর্ম ছাড়া, বিচার কর কি আছে বাকি।

(৪) *নিজের কর্ম হইলে বিশ্বাস*, রমিজ বলে মিলবেরে পাশ
হবেনা কার অবিশ্বাস, সর্বজীবে দিবে সাক্ষী।

বাণী-১১ এর অংশ (অলৌকিক সুধা)

(১) যার হয়েছে আত্মবোধ, *তার হইল কর্ম রোধ*
হইল সে খোদে খোদ, যখন যা তার ইচ্ছায় করে।

(২) আত্মজ্ঞানে হয় নির্বাণ, এই হইল বিধির বিধান
কর্মরোধ তার হবে প্রমাণ, নিত্য সংবাদ দিবে যারে।

(৩) কর্ম ছাড়া নাহি ধর্ম, *কর্ম দিয়া রোধ কর কর্ম*
ডাকা ডাকিতে হয়না ধর্ম, না দেখিয়া ডাক কারে।

বাণী-১৩ এর অংশ (অলৌকিক সুধা)

দেখলিনা মন চিন্তা করি
তোর যেমনি কর্ম তেমনি জন্ম
ঘটে ঘটে ঘুরা ফিরি।

(১) আসলি *কর্মের পাইতে মুক্তি*, প্রাণী হত্যা তোর নিত্যি নিত্যি
দেখে শুনে কর ডাকাতি, আর কত কর বাহাদুরী।

(৩) *কর্ম দিয়া কর্ম মুক্ত*, দৈববাণীতে হবে ব্যক্ত
তোমার মধ্যে যে সেই সত্য আর কিছু নাই সব ছল চাতুরী।

(৪) রমিজ কয় এবার মান প্রবোধ, *কর্ম দিয়া কর্ম রোধ*
দেখবে নিজে খোদে খোদ, দখল হবে জমের কাচারী।

বাণী-১৫ এর অংশ (অলৌকিক সুধা)

মিছে কেন ডাকা ডাকি
কে দেখল তাঁরে নিরাকারে
দেখলে তুমি আন সাক্ষী।

(১) মনরে *যার যে কর্মে হল আকার*, পশু পাখি নর যত প্রকার
প্রাণী ছাড়া কোথায় জায়গা তাঁর, বিচার কর খুলি জ্ঞানের আঁখি।

(৪) মনরে রমিজ কয় আমি দেখছি নিরাকার, আমার মত নাই একই প্রকার
যেমনি কর্ম তেমনি আকার, ফল ভোগে তার জীবে থাকি।

বাণী-১৬ এর অংশ (অলৌকিক সুধা)

সন্ধ্যা হলে ঠেকবি যাইয়া গুদারায়
দিন থাকিতে চল পথে
দেখনা বেলা ডুবে যায়।

(৩) মনরে মন মাঝির কথা ধর, তাঁর ইচ্ছা কি চিন্তা কর

ঠেকলি মন তুই ভব মাঝে আসিয়া
দেখনা চাইয়া দিন যায় গইয়া
কে রাখবে আর ধরিয়া।

(২) মনরে আসলি ভবে প্রতিশ্রুতে, *কর্ম করবি দিনে রাতে*
তরী ডুবালি নিজ ইচ্ছাতে, বিধির বিধান বাদ দিয়া

বিবেক দিয়া কর্ম সার, যেমনে বাধ্য করা যায়,
হইলে বাধ্য নাই কার সাধ্য, পার করিতে পয়সা চায়।

বাণী-১৭ এর অংশ (অলৌকিক সুধা)

মনরে তুই হোসনে বেঈমান
ধর্ম কর্ম কোনটি সত্য জানিয়া তুই রাখিস ঈমান।

(১) ধর্মে আছে মন্ত্র ভরা, প্রাণী বধের এই এক ধারা
পাপপূণ্য হয় কর্মের দ্বারা, সে কর্মের আর নাই পরিত্রাণ।

(২) এক ধর্মে করে কোরবান, আরেক ধর্মে দেয় বলীদান
উবুত চিতে বধ করে প্রাণ, *দুয়ের কর্ম একই সমান।*

বাণী-০১ এর অংশ (স্বর্গের সুধা)

বল রাজ্যে অবিচার কেনে
তুমি বিচার কর্তা জানাও বার্তা
নালিশ করি শ্রী চরণে।

(৩) রমিজ কয় রাখ জেনে, পুনঃজনম এই ভূবনে
বেহেস্ত দোযখ এইখানে, *যার যে জন্ম কর্ম গুণে।*

বাণী-০৩ এর অংশ (স্বর্গের সুধা)

মা তোরে কে বলে কালী
তুমি আদ্যাশক্তি মহামায়া
ভক্তেরে দেও চরণ ধূলী।

(২) *সন্তানে কুকর্ম করে* মা বিনে আর কে সম্বরে
যদ্যপি কুসন্তান মরে, মায়ে নেয়গো কোলে তুলি।

বাণী-০৪ এর অংশ (স্বর্গের সুধা)

যুগে যুগে রাখি সংগে কেন গেলে ভুলিয়া।

(৩) মনরে পাপে বোঝাই ছিল তরী, পাড়ি দিলাম তাড়াতাড়ি
ঘাটে এসে ডুবল তরী, রাখতে নারি ধরিয়া
রমিজ বলে কর্ম ফলে, ঘটে ঘটে যাবি চলিয়া।

বাণী-১৩ এর অংশ (স্বর্গের সুধা)

নাইরে বাকী মেলরে আঁখি রাখা দায়
তরীর মাঝি কর রাজি
নইলে ঠেকবি গুদারায়।

(৩) মনরে রমিজ বলে চিন্তা কর, *মাঝির ইচ্ছায় কর্ম কর*
বেলা থাকতে পারি ধর, চলে যাও চিনা রাস্তায়
দেও দাসখত করি দস্তখত, আসা যাওয়া নিজ ইচ্ছায়।

বাণী-১৪ এর অংশ (স্বর্গের সুধা)

বেলা থাকতে ফিরে আয়
দিন ফুরাল সন্ধ্যা প্রায়।

(৩) রমিজ বলে মিছে সংসার, কেন বল আমার আমার
কর্ম মতে জন্ম যার যার, কর্মরোধ গুরুর কৃপায়।

বাণী-১৬ এর অংশ (স্বর্গের সুধা)

ভাবিয়া কেন দেখলিনা
ভবে কে তোর আপনা।

(২) আমি বলি কর স্তুতি, *পূর্ব কর্মের পাবি মুক্তি*
দিয়া আসলে প্রতিশ্রুতি, সকল তোর হবে জানা।

বাণী-২৪ এর অংশ (স্বর্গের সুধা)

কেনরে তুই বুঝলিনা এখন
দেখনা ভেবে কেউ নয় ভবে নিশার স্বপন।

(২) রইতে পারবিনা কোন মতে, ভেসে যাবি তুই কাল স্রোতে
যাবিরে তুই কর্ম মতে, চৌরাশি ভ্রমণ। বাণী-২৬ এর অংশ (স্বর্গের সুধা)

দেখরে তোর দিন নাই বাকী
ঘুমে রইলি তোরে বলি মেলরে আঁখি।

কি যন্ত্রণা এ সংসারে
ভুলতে চাই ভুলতে পারিনা
ঠেকিয়াছি মায়াফেরে।

(৩) রমিজ বলে *কর্ম ফলে, আসা যাওয়া ধরাতলে*
রাখ মাগো চরণ তলে, *কর্মের মুক্তি দেও আমারে।* বাণী-১০ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

মাগো এবার কর বিচার
কেটে দেওগো মায়ার বাঁধন

(৩) রমিজ কয় *চাও কর্মের মুক্ত,* লিখে দেও দাসখত
সত্য যাহা করবে ব্যক্ত, হৃদয়ে থাকি। বাণী-৩১ এর অংশ (স্বর্গের সুধা)

অচিনা এক পাখী কি সুন্দর
দীল কাবাতে নিজ ইচ্ছাতে
বিরাজ করে নাই তার ডর।

(২) পাখী কেবল আসে যায়, *এ কর্ম তার, সর্বদায়-রে*
শোনে নারে ধরিলে পায়, ফেলে যায় সে খালি ঘর।
বাণী-৪২ এর অংশ (স্বর্গের সুধা)

হারা হলি তুই জনমের মতন
অবহেলে দিলি ফেলে,
চিনলিনা অমূল্যধন।

(১) পরম আশ্রয় দাতা, *লিখে ছিল তোর কর্মখাতা*
মানবের কর্মকর্তা তোর প্রতি ছিল অর্পণ।

(২) হইলনা তোর সর্বস্ব দান, লঙ্গন করলি বিধির বিধান
এবার তোরে কে করবে ত্রাণ, *তোর কর্মে তোর সব কর্তন।*
বাণী-৪৬ এর অংশ (স্বর্গের সুধা)

উপায় নাই তোর কোথায় যাবি বল
যথায় যাবি ফিরে আসবি,
খাটবেনা তোর কোন ছল।

(৩) রমিজ বলে ভুলে গেলি, আসলে তুই বিনাশ হলিরে
জন্মমৃত্যু ইচ্ছায় নিলি, *কর্ম মতে পাবি ফল।*
বাণী-৫৩ এর অংশ (স্বর্গের সুধা)

দেখ মাগো বিচার করে
ইচ্ছা করে খেয়েছ বিষ,
কেবা দোষী এসংসারে।

(৩) রমিজ কয় যা পাপ তোমার, সকলের নিয়াছি ভার
ইচ্ছা ছিল করিব উদ্ধার, *অসৎ কর্মে রাখে ধরে।*
বাণী-২৮ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

পারবিনা কিছু নিতে
যাবিরে খালি হাতে।

(৩) *রমিজ বলে কর্মফল,* এইমাত্র তোর সঙ্গের সম্বল
জানাই গো চরণে তোমার।

(২) প্রবঞ্চনা বিধান বিরোধী, *অসৎ কর্ম মিথ্যাবাদী*
তারা মহা অপরাধী, শাস্তি ভবে দিওনা কার। বাণী-১৩ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

মনে মনে কর বিচার
চিন্তা করি দেখ তুমি
কর্মমতে জন্ম যার যার।

(৪) রমিজ বলে যে চায় তারে, ঘৃণা লজ্জা ফেলে দূরে
বুক ভাষায় আঁখি নীরে, *কর্মের মুক্তি চায় বারেবার।* বাণী-২৩ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

মনরে তুই দেখরে চাইয়া
নাইরে উপায় বলি তোমায়
আখের হল এ দুনিয়া।

(৪) রমিজ বলে এই ধরাতে, *কর্ম কর দিনে রাতে*
মুক্তি গুরুর চরণেতে, জাতে জাতে যাও মিশিয়া। বাণী-২৫ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

আর আমি বুঝাব কত
ইচ্ছা করে করিলে পাপ
খেটে মরবি অবিরত।

(২) দেখে শুনে হলি কানা, *কর্মফল তোর সকল জানা*
কর্মফল কাটা যাবেনা, পারবিনা করিতে ব্যক্ত।

(৩) রমিজ বলে বলবো কি আর, *কর্মমতে যার যে বিচার*
সৃষ্টি জীব যত প্রকার, কারো ফাঁসী কেউ মুক্ত। বাণী-২৭ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

চেয়ে দেখ আর নাই বাকী
কত কাল দিবি ফাঁকি।

(৩) রমিজ কয় দেও দাসখত, *সকল কর্মের পাবি মুক্ত*
সত্য যাহা হবে ব্যক্ত, দেখ তোর হৃদয় থাকি।
বাণী-৫১ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

তুই চলছ তোর মন মত
আর তোরে বুঝাব কত।

(১) মুখে ভাল অন্তরে ফাঁকি, সর্বজীব তোর আছে সাক্ষী
কর্মফল তোর সামনে বাকী, ভুগবি তুই অবিরত।

হৃদয়ে যেই ত্রিবেণীর জল, স্নান কর সে জলেতে।

বাণী-২৯ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

বল কি হবে তোমার
কর্ম মতে নাই নিস্তার।

(১) *কর্ম মতে আসে আর যায়*, ফল ভোগে তার যথা তথায়
স্বর্গ নরক এ ধরায়, ভাবিয়া দেখ একবার।

বাণী-৩৭ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

গুরু না করলে গ্রহণ
কর্মফল হয়না কর্তন।

বাণী-৪৩ এর স্থায়ী (স্বর্গে আরোহণ)

ঠেকলিরে কর্ম ফেরে
দোষ দিবি তুই আর কারে।

(১) *কর্ম দোষে সব হারালি*, দেখরে তুই নয়ন মেলি
সাধের দিন তোর গেল চলি, পাবিনা তুই আর ফিরে।

বাণী-৪৫ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

গেল দিন না পাওয়া যায়
ভুলিস না তুই কার মায়ায়।

(৩) *রমিজ বলে কর্ম সত্য, কর্ম বলে জীবন মুক্ত*
গুরুর সেবা কর নিত্য, মুক্তি পাবি তাঁর কৃপায়।

বাণী-৪৭ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

(২) গুরু পদে হলিনা গ্রহণ, অসৎ লোক তোর হৃদয়ে স্থাপন
তাদের জন্য মন উচাটন, *কুকর্মে থাকিস রত।*

বাণী-৫২ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

কোথায় নাই তোর ঠিকানা
ভাবিয়া কেন দেখলিনা।

(২) *করে দেখ তোর কর্মের বিচার*, মানব জনম পাবিনা আর
আসবি যাবি বারে বার, কত পাবি যন্ত্রণা।

বাণী-৫৪ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

কেমনে তুই কাল যমুনা হবি পার
পারের সম্বল নাই তোর হাতে
আসবি যাবি বারে বার।

(১) কাল নদীর স্রোতের টান, বাঁচবেনারে কারো প্রাণ
রাজা প্রজা এক সমান, *কর্ম মতে হয় বিচার*
দিলে পাড়ি আসবি ফিরি, কোথায় জায়গা নাইরে তোর।

বাণী-৫৬ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

মনরে বুঝবি পাইলে সমন
আসলি ভবে যেতে হবে
কেন নাই স্মরণ।

(৩) রমিজ বলে *মান কর্ম, কর্ম ছাড়া নাহি ধর্ম*
গুরুর কাছে জানলে মর্ম, তার নাই মরণ।

বাণী-৬৬ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

মহাগুরু রমিজ নীতির চতুর্থ বৈশিষ্ট্য

সদ্‌গুরুর প্রতি আত্মনিবেদন ও নিজকে নিজে চিনা: পূর্বের আলোচনায় (তৃতীয় বৈশিষ্ট্যে) আমরা মহাগুরু রমিজের মতে সদ্‌গুরুর (নিষ্ঠাগুরু বা চেতনগুরুর) ব্যাখ্যা পেয়েছি।

সদ্‌গুরুর প্রতি আত্মনিবেদন করার জন্য একজন সত্যের সন্ধানকারী ভক্ত বা শিষ্যের প্রয়োজন, যিনি ভক্ত হিসেবে সৎচরিত্রের অধিকারী।

অধ্যাত্ম বিষয়ে যিনি গুরুকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। যার আত্মরাজ্যে বা আত্মজগতে গুরুই কেন্দ্রবিন্দু। যিনি গুরু ভিন্ন অন্য কিছু বুঝেন না। গুরুই কেবল সকল কর্মের মূল। যার কাছে গুরুই পরমতত্ত্ব। এ সমস্ত গুণের অধিকারী ভক্তই গুরুর নিকট একজন পরম ভক্ত।

উক্ত পরম ভক্তই সদ্‌গুরুর নিকট আত্মনিবেদন করার উপযুক্ত। এ পরম ভক্তই সদ্‌গুরুর নিকট আত্মানিবেদন করতে পারেন। আত্ম মানে নিজ। আর নিবেদন মানে সমর্পণ, উৎসর্গ, ত্যাগ, বিসর্জন ইত্যাদি।

তাহলে, আত্মনিবেদন হচ্ছে নিজকে সমর্পণ, নিজকে উৎসর্গ, নিজকে ত্যাগ অথবা নিজকে বিসর্জন দেয়া। এবার সদ্‌গুরুর নিকট আত্মনিবেদন হলো- সদ্‌গুরুর নিকট নিজকে সমর্পণ বা উৎসর্গ করা। গুরুর নিকট নিজকে নিজে উৎসর্গ করাই হচ্ছে, নিজকে গুরুর নিকট বিলীন করে দেয়া। অর্থাৎ গুরুতে লয় হয়ে যাওয়া। এ অবস্থায়, পরম ভক্তের কোন আমিত্ব থাকেনা। আমিত্বকে ত্যাগ করেই গুরুতে সমর্পিত হতে হয়। নিজের কোন ইচ্ছা, আকাঙ্খা থাকেনা। সকল কর্মে, ধ্যানে, বিষয়ে, মননে গুরুর ইচ্ছায় ইচ্ছিত হতে হয়। এ অবস্থায় আরো তিনি গুরুভিন্ন অন্যকিছু জানেন না এবং আমিত্বকে বিনাশ করতঃ গুরুতে সর্বস্ব অর্পণ করেছেন।

ঠিক এমন একটি অবস্থার কথাই মহাগুরু রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন-

"গুরুর নিকটে যার সর্বস্ব অর্পণ
গুরু ভিন্ন অন্য কিছু জানেনা যে জন।
তার মধ্যে ছয় রিপু হবে বিসর্জন
ইহার নাম সত্য কোরবান রাখিও স্মরণ"।

উপদেশ-২৫,২৬ (স্বর্গের সুধা)

গুরু রমিজের উপরোক্ত সিদ্ধবাক্যে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, যিনি নিজেকে গুরুর নিকট আত্মনিবেদন বা আত্মসমর্পণ করতে পেরেছেন, তখন তার সকল রিপু *(কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্জ্য)* বিসর্জন হয়ে যায় এবং ইহাই ***সত্য কোরবান*** নামে অভিহিত।

যার মধ্যে কোন রিপু এবং ইন্দ্রিয়ের তাড়না থাকেনা তিনি *সৎ, নিষ্ঠাবান ও নিষ্কলুষ* চরিত্রের অধিকারী। তিনি স্রষ্টা বা আল-াহ্‌কে মরমে মরমে এবং সম্যকভাবে জানার সাধনায় (পরম তত্ত্বজ্ঞান) মগ্ন থাকেন। এই সাধনাকে *মরমী সাধনা বা মারফত* বলা হয়। এ সাধনার চারটি স্তর যথা ফানাফিস শেখ ... ইত্যাদি পূর্বেই উলে-খ করা হয়েছে।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, মারফত বা মরমী সাধনার প্রথম স্তর হচ্ছে গুরুতে বিলীন হয়ে যাওয়া।

গুরু রমিজ সদ্‌গুরুর প্রতি আত্মনিবেদনের কথা বলেছেন। তার মানে তিনি সদ্‌গুরু সঙ্গ ও সাধনার কথাই তাঁর নীতির চতুর্থ বৈশিষ্ট্যে বলেছেন। সদ্‌গুরু পরমাত্মার জাত। তাই ***সদ্‌গুরু ব্রহ্মা বা স্রষ্টার সাথে ও মহাবিশ্ব প্রকৃতির সাথে লয় হয়ে আছেন***। তাই তাঁর আত্মা পরমাত্মারূপে আছেন। গুরু রমিজের বিধান অনুযায়ী, তাঁর কাছে (সদ্‌গুরু) সকল পাপ অকুণ্ঠ চিত্তে প্রকাশ করে সবই মোচন বা লাঘব করা যায়। তাঁর নিকট সকল পাপসহ আত্মসমর্পণ করতঃ সর্বদা অনুতাপ করাই হচ্ছে গুরুর নিকট আত্মনিবেদন। নিজের জীবত্ব বোধকে বর্জন পূর্বক সদ্‌গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করতঃ পরমাত্মার সাথে লয় হওয়া সম্ভব।

"নিজের জীবত্ব বোধকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে আত্মার পরমত্ব অর্জন করাই সদ্‌গুরুর নিকট আত্মনিবেদনের মূল উদ্দেশ্য"।

সদ্‌গুরু সঙ্গ করে এবং তাঁর আদেশ অনুযায়ী কর্ম করে সর্বদা সাধনায় লিপ্ত থেকে উপরোক্ত মারেফতের চারস্তর ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করতঃ *বাকাবিল-াহ্ বা আল-াহ বা স্রষ্টার (ব্রহ্মার) জাতের সাথে অথবা মহাবিশ্ব প্রকৃতির সাথে মিশিয়া যাওয়াই হচ্ছে নিজকে নিজে চিনা*। স্রষ্টার জাতের সাথে মিশিয়া গেলে স্রষ্টাকেও চেনা হয়ে গেল।

অতএব, উলে-খিত উপায়ে *নিজকে নিজে চিনতে পারলে স্রষ্টাকে চেনা যায়*। আর সেজন্যেই মহাগুরু রমিজ সদ্‌গুরুর প্রতি আত্ম নিবেদনের কথা উলে-খ করেছেন।

রমিজ নীতির পঞ্চম বৈশিষ্ট্য

আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের সাধনাঃ

আত্মতত্ত্ব জ্ঞান বলতে নিজের আত্মা বা পরমাত্মার পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে সঠিকভাবে চিনা বা জানা অথবা নিজ পরমাত্মার পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে বা পরম মতবাদ সম্বন্ধে অবগত হওয়াকে বুঝায়। কিংবা নিজ আত্ম বা পরমাত্মার সঠিক পরিচয় বা বিশেষ পরিচয় লাভ করা, প্রকৃত জ্ঞানই হচ্ছে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান। তাহলে *প্রকৃত জ্ঞান দ্বারা নিজকে নিজে চিনাই আত্মতত্ত্ব জ্ঞান*।

এখন আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের সাধনা করতে হলে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের জ্ঞানী বা আত্মতত্ত্ব যিনি জানেন তাঁকে আগে চিনতে হবে।

লালন বলেছেন- ***"আত্মতত্ত্ব জানে যারা***
সাঈর নিগুঢ় লীলা দেখ্‌ছে তাঁরা"

যারা আত্মতত্ত্ব জানেন তাঁরা স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্য এবং তাঁর সকল মারফতের গোপন ব্যাখ্যা অবগত আছেন।

গুরু রমিজের মতে আত্মতত্ত্ব যিনি জানেন তিনি একজন সদ্‌গুরুর সত্যের সন্ধানী হতে পারলেই সদ্‌গুরুর সন্ধান লাভ করা যেতে পারে। সদ্‌গুরু ও সত্যের সন্ধানকারীর পরিচয় ও ব্যাখ্যা এ পুস্তকে পূর্বেই দেয়া হয়েছে।

সুতরাং সত্যের সন্ধানকারী হয়ে সদ্‌গুর লাভ করতঃ তাঁর সাথে অহরহ বা সর্বদা সঙ্গ করে তাঁর ধ্যান, ধারণা, আধ্যাত্মিক শিক্ষা, কর্ম ও কর্মাচরণ গ্রহণ করতে হবে। তার কাছে নিজকে আত্মসমর্পণ করতঃ তার আদেশে তার কাছে লয় হয়ে যেতে হবে। আজীবন এ সাধনা অবিরাম চলতে থাকবে। ইহাই *আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের সাধনা।*

গুর রমিজের মতে এ সাধনায় যারা লিপ্ত এবং গুরতে বিলীন হয়ে গেছেন তারা অবশ্যই মারফতের বা আধ্যাত্মিক স্তরের উচ্চস্তর অর্জন করতে পারেন। এ অবস্থায় তাদের মধ্যে স্রষ্টার তরফ হতে স্বপ্ন, এলহাম,দৈববাণী,ওহী ইত্যাদি আসতে থাকবে। ইহাদিগকে *আধ্যাত্মিক যোগ* বলা হয়।

আত্মতত্ত্ব জ্ঞান বা প্রকৃত জ্ঞান সম্বন্ধে গুর রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন- ***"প্রকৃত জ্ঞান যিনি পেয়েছেন ভূমন্ডলে***
তিনিই জীবন মুক্তি জানিও সকলে" উপদেশ-০৭ (অলৌকিক সুধা)

এ পৃথিবীতে যিনি প্রকৃত জ্ঞান বা পরম জ্ঞান অর্জন করেছেন তিনিই জীবন মুক্তি লাভ করেছেন। আর পরম জ্ঞান লাভ করতে হলে একজন পরমজ্ঞানী সদ্‌গুর বা চেতন গুরর প্রয়োজন। চৈতন্য গুরর কৃপা ও তাঁর আদেশে অবিরাম আজীবন কর্ম করলে এবং তাঁর সাথে জ্ঞান চর্চা করলেই প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব এবং জীবন মুক্তি লাভ করাও সম্ভব। আর এ *জীবন মুক্তি হলো আত্মার স্বভাব মুক্তি।* তা হলেই জন্মরোধ করা হলো। অর্থাৎ, আত্মা পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে আর আসতে হবেনা। *জন্মচক্রকে সে জয় করে স্বাধীন হয়ে গেল। কোন কোন মতে আত্মার এ অবস্থাকে নির্বাণ বলা হয়।*

গুর রমিজ আরো এক উপদেশে তাঁর ভাষায় নিজেই বলেছেন- ***"দেখা দেখি কোন কাজ করিওনা আর***
আত্মজ্ঞানে নিজকে চিন করিয়া বিচার" উপদেশ-০৭ (স্বর্গের সুধা)

মানুষ প্রাচীনকাল হতেই একের কথা অন্যে দেখা দেখি বা কানে শুনে শুনে ধর্ম-কর্ম করতে অভ্যস্ত হয়ে আসছে। এ সমস্ত ধর্ম-কর্ম কতটুকু সত্য-মিথ্যা তার কোন বিচার বিবেচনা ছিলনা। অল্প পড়া মোল-া-মৌলভী বা ব্রাহ্মণ পুরোহিতরাই যেভাবে যা বলতেন তা সেভাবেই মানুষ করতেন।

কিন্তু গুর রমিজ আত্মজ্ঞান লাভ করতঃ বা আত্মজ্ঞান অর্জন করতঃ নিজকে নিজে চিনে লব্দ জ্ঞান খাটিয়ে সর্ব কর্ম করার উপদেশ দিয়েছেন। আর আত্মজ্ঞান অর্জন করতে হলে একজন চৈতন্য বা চেতন গুরর সঙ্গ করতে হবে। *চেতন গুরর (সদ্‌গুরর) আশীর্বাদ, কৃপা ও আদেশ পুষ্ট হয়ে সাধনার মাধ্যমে আত্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব।*

গুর রমিজ এ আত্মজ্ঞান দ্বারা নিজকে নিজে চিনার কথা বলেছেন। উলে- খ্য যে, *নিজকে নিজে চিনলেই স্রষ্টাকে চেনা হলো।*

আরেক উপদেশে গুর রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন- ***"মানুষের সঙ্গে যদি স্রষ্টার সংস্রব আছে,***
জ্ঞানের আঁখি খুলিয়া দেখ পাবে নিজের কাছে" উপদেশ-১১ (স্বর্গে আরোহণ)

এখানে গুর রমিজ অধ্যাত্ম বিষয়ে একটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ কথা বলেছেন।

মানুষের সঙ্গে স্রষ্টার এক নিবির সম্পর্ক বিদ্যমান। এ সম্পর্ক অনুভব করতে হলে মানুষের জ্ঞানের আঁখি খুলতে হবে। এ আঁখি বা চক্ষু হলো মানুষের অন্তরচক্ষু। উহাকে দিব্য চক্ষুও বলা হয়। এ চক্ষু অতীন্দ্রিয় জাত। *যার দিব্যজ্ঞান আছে তার দিব্য চক্ষুও আছে*। আর সদ্‌গুরই দিব্যজ্ঞানের অধিকারী। দিব্যজ্ঞান হলো অলৌকিক জ্ঞান বা পরম জ্ঞান। সদ্‌গুরর নিকট এ পরম জ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান অর্জন করে অলৌকিক দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন দিব্যচক্ষু বা অন্তরচক্ষু দ্বারা স্রষ্টাকে নিজের অতি কাছে দেখতে পাওয়া যায়। রমিজ ইহার কথাই বলেছেন।

মানুষের সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক অনুভব করতে হলে সদ্‌গুরুর (চৈতন্য গুরুর) নিকট হতে দিব্যজ্ঞান বা অলৌকিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। উপরোলি- খিত বিষয়ের বিবরণ অনুযায়ী বুঝা যায় যে, চেতন গুরুর মাধ্যমে জ্ঞান সাধনা পূর্বক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞান অর্জন করার কারণ হলো নিজেকে জানা আবার স্রষ্টাকে চিনতে হলে নিজকে চিনতে হবে। অর্থাৎ নিজের আত্মপরিচয় নিজে জানতে হবে। এ বিষয়ে বিশ্ব বিখ্যাত প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের একটি "সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত উক্তি" (Aphorism) বা প্রবাদ (Proverb) আছে যে ''Know thyself'' "নিজেকে জানো"।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস ঃ "প্রাচীনকাল থেকে সমকাল" নামক পুস্তক মোঃ শওকত হোসেন প্রণীত যার সপ্তম প্রকাশ জুন-২০০৯ এর পৃঃনং ৩০-এ যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে লিখিত বিবরণে দেখা যায় যে, সক্রেটিস কাউকে জ্ঞানী হবার জন্য প্রাথমিকভাবে যে উপদেশ প্রদান করেন, তা হলো- নিজেকে জানো (Know thyself) তাঁর মতে, কোন্ ব্যক্তি কত বিষয় জানে কেবল তার ভিত্তিতে তাকে প্রকৃত জ্ঞানী বলা চলে না। তাকে এ বিষয়েও সচেতন থাকতে হবে যে, *তিনি কি কি জানেন না বা অনেক কিছুই তিনি জানেন না।*

সক্রেটিস বলেন- *"জগতের অসীম জ্ঞান ভান্ডারের তুলনায় আমি তেমন কিছুই জানি না"*

সক্রেটিসের এই বক্তব্যের মাধ্যমে বোঝা যায়, নিজের প্রকৃতি এবং অভাব-অপূর্ণতাকে জানা-ই হচ্ছে জ্ঞানের পথে অত্যাবশ্যক এবং গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। যে ব্যক্তি নিজেকে ভালো করে চিনেছেন সে ক্রমান্বয়ে অন্য মানুষকে এবং জগৎ-সংসারের অনেক বিষয় জানতে পারেন। জ্ঞানের ব্যাপকতা সম্পর্কে যার ধারণা নেই এমন ব্যক্তিই নিজেকে পর্যাপ্ত বা অনেক জ্ঞানী বলে দাবী করতে পারেন।

যিনি নিজেকে ভালো করে চিনেছেন তিনি বিশ্ব প্রকৃতি সম্বন্ধেও জানতে পারেন।

স্রষ্টাকে চিনা বা জানার জন্য সর্বপ্রথম পর্যায় হলো "জ্ঞান অর্জন করা"। ইসলাম ধর্ম মতে জ্ঞান অর্জন করার জন্য সুদূর চীন দেশে যাবারও উপদেশ দেয়া আছে।

পবিত্র হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে- ***"উত্‌লুবুল ইল্‌মা ওয়া লাওকানা বিচ্‌চীন্"***

অর্থ ঃ***"তোমরা জ্ঞান অন্বেষণ কর, প্রয়োজনে চীন্ দেশে গিয়ে"***

আর যিনি উক্ত জ্ঞান অর্জন করতে ইচ্ছুক তাঁর সর্বাগ্রে নিজেকে জানতে হবে বা নিজেকে চিনতে হবে।

এ বিষয়ে পবিত্র হাদীস শরীফে আরো বর্ণিত আছে যে- ***"মান্ আরাফা নাফছাহু ফাক্বাদ্ আরাফা রাব্বাহু"***

অর্থ: *"যে নিজেকে চিনেছে সে তার প্রভুর পরিচয় পেয়েছে"*

গুরু রমিজ নিজেকে নিজে চেনার নিমিত্তে মহাজ্ঞানীর সঙ্গ করে জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে মহাজ্ঞান দ্বারা নিজেকে ভেজালমুক্ত ও আত্মশাসন করতঃ জ্ঞানের সেবক হওয়ার জন্য ভক্তদেরকে ডাক দিয়েছেন।

তাঁর ভাষায়- ***জাগরে এবার মেলরে আঁখি***
বলেরে হুংকারে কর্ণ কুহরে দিন নাই বাকী।

(২) বিজয়ী হও তুমি আত্মশাসনে, দূর কর ভেজাল মহাজ্ঞানে
জ্ঞানের সেবক হও ভূবনে, ছেড়ে দেও ফাঁকি। বাণী-৫৯ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

এখানে মহাগুরু রমিজ মহাজ্ঞান দ্বারা আত্মশাসনের মাধ্যমে মনের যাবতীয় ভেজাল দূর করে আত্মাকে বিজয়ী হওয়ার কথা বলেছেন। সাধারণতঃ *মনই আত্মাকে ষড়রিপু, বিভিন্ন ধরণের পাপ, ইন্দ্রিয়াদির প্রতি আসক্ত করে*। ফলে, মানবাত্মা কলুষিত হয়ে যায় এবং কুকর্মে লিপ্ত হয়ে থাকে। আর এ কর্মকান্ডই মানবাত্মার ভেজাল স্বরূপ।

এ সমস্ত ভেজাল দূর করার জন্য মহাগুরু রমিজের আদেশ মোতাবেক জ্ঞানের সেবক হয়ে মহাজ্ঞান অর্জন করতঃ উক্ত জ্ঞান দ্বারা আত্মশাসনে বা নিজেকে নিজে শাসন করে নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন করার আভাস দিয়েছেন। তবে জ্ঞান সাধন করতে হলে আরেকজন মহাজ্ঞানীর সঙ্গ করতঃ তাঁর মতবাদ অনুযায়ী কর্ম করতে হবে। আর সেইজন্যই হচ্ছেন একজন সদ্‌গুরু (মহাজ্ঞানী)। এই সদ্‌গুরুর আদেশ-নির্দেশ মতে আজীবন অবিরাম কর্ম করলেই জ্ঞান আহরণ করতঃ বিবেক দ্বারা সকল ভেজাল (সর্বপাপ) দূর করা সম্ভব।

সর্বশেষে গুরু রমিজের নীতির ৫ম বৈশিষ্ট্য মতে সদ্‌গুরুর মাধ্যমে (মহাজ্ঞানী ব্যক্তি) কর্ম করতঃ জ্ঞান সাধনা করতে হবে। কারণ, জ্ঞান সাধনা ব্যতীত আত্মার ভুল সংশোধন করা সম্ভব নয়। আর ইহার জন্য একজন চেতন গুরুর অবশ্যই প্রয়োজন।

রমিজ নীতির ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য

আত্মার ভুল সংশোধন পূর্বক মুক্তি সাধনঃ

আত্মার ভুলের জন্যই মানবাত্মা পৃথিবীতে বার বার জন্ম নিয়ে আসে। জন্মরোধ করার জন্যই ভক্তগণ সদ্‌গুরুর মাধ্যমে আজীবন অবিরত আধ্যাত্মিক কর্মসাধন করেন। জন্মরোধ করাই হচ্ছে আত্মার মুক্তি। একজন সত্য সন্ধানকারী ভক্ত তাঁর জীবনে যত পাপ করেছেন তা অকুণ্ঠ চিত্তে তার সদ্‌গুরুর নিকট প্রকাশ করতঃ পুনরায় পাপ না করার অঙ্গীকারসহ গুরু প্রদত্ত অবশ্য করণীয় কর্মসমূহ সাধন করতে হবে।

সাধন কার্যের মূল বিষয় হবে **"অনুতাপ"**। প্রকৃত অনুতাপ-ই মনের যাবতীয় আবর্জনা *(ষড়রিপু ও অন্যান্য পাপ)* দূর করতে পারে। অনুতাপ দ্বারা চোখের জলে স্রষ্টার কাছে সর্বদা ক্ষমা প্রর্থনা করতে হবে।

মহাজনের কথা মনে রাখতে হবে যে-

"পাপ করে অনুতাপ করে সেই জন
সাধনা হইতে শ্রেষ্ঠ বলে মহাজন"

এ বিষয়ে গুরু রমিজ বলেছেন-

"ত্রিবেণীর ঘাটে যেবা নিত্য স্নান করে
কোটি কোটি পাপে তারে গ্রাসিতে না পারে।
হৃদয় ত্রিবেণী নদী ঘাট হল তার আঁখি
সেই জলেতে স্নান কর স্রষ্টা তোমার সাক্ষী"

এখানে গুরু রমিজ পাপ নাশ করার জন্য হৃদয়োদ্ভুত অনুতাপের মাধ্যমে স্বীয় চোখের জল দ্বারা স্নাত হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছেন।

ভাবুকজন ভাবের মাধ্যমে স্রষ্টার নিকট চোখের জল নির্গত করে সর্ব প্রকার পাপ মুক্তির আবেদন করে থাকেন।

অহরহ চোখের জল দ্বারা পাপ হতে বিরত থাকা বা পাপ নাশ করার নিমিত্তে স্রষ্টার নিকট আর্তনাদ করার জন্য মহাগুরু রমিজ তাঁর অনেক বাণী ও সিদ্ধবাক্যে ভক্তদেরকে আদেশ-উপদেশ দিয়েছেন।

গুরু রমিজ বিশিষ্ট ভাববাদী ছিলেন। তাঁর মতবাদ মতে আধ্যাত্মিক বিষয়ে আত্মিক কান্না ও চোখের জল মানবের সকল মলিনতা দূর করতঃ অনন্তের সাথে মিশিয়ে দিতে পারে। তবেই মানুষ, আত্মার ভুল সংশোধন পূর্বক পাবে মুক্তির সন্ধান।

রমিজ নীতির সপ্তম বৈশিষ্ট্য

ষড়রিপু দমনঃ

মহাগুরু রমিজ ভক্তদের আত্মার স্বভাব মুক্তির জন্য সকল ভক্তের সর্ববিধ পাপ ও সর্বস্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি কৃপা করে নিজে সকল ভক্তের পাপ গ্রহণ করতঃ ভক্তদের পাপ লাঘব করেছেন।

পরম ভক্তদের সাথে তিনি এমনভাবে মিশে গেছেন যেন ভক্তের দেহ, মন, হৃদয়, আত্মা সকলই তাঁর মধ্যে লয় হয়ে গেছে। ভক্তের পাপ মানে তাঁর নিজের পাপ। সকলের সর্বপাপ গ্রহণ করে তিনি মহাপাপী সেজেছেন।

তাই মহাগুরু রমিজ ভক্ত হতে আগত রিপু নাশকল্পে এবং ভক্তদের দেহের ভিতর রিপু যেন পুনরায় আশ্রয় না নিতে পারে সেজন্যে আজীবন অবিরাম রিপু বা পাপাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। সংগ্রাম হয়েছে তাঁর মনের বিরুদ্ধে তাঁরই বিবেকের। কারণ, মনই দেহের সকল রিপু এবং ইন্দ্রিয়ের পরিচালক।

তিনি তাঁর বিবেককে এমনভাবে গঠন করেছিলেন যেন, তা কোন সময়ই মনকে রিপু ও ইন্দ্রিয়াদির অধীনে যেতে না দিতে হয়। তিনি তাঁর সকল ভক্তকে এমনভাবে গড়ে ছিলেন যেন তাদের মন কোন সময়ই রিপু ও ইন্দ্রিয়াদির প্রতি আসক্ত না হয়।

নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন করতে হলে অবশ্যই আমাদের দেহ, মন, জ্ঞান ইত্যাদি ইন্দ্রিয় বিষয় ও রিপুর প্রতি অনাসক্ত রাখতে হবে।

রমিজ তাঁর রচিত মরমীয়া সঙ্গীত ও আদেশ-উপদেশের মাধ্যমে সর্বদাই পাপাচার, অনাচার, অত্যাচার, অবিচার এবং সর্বপ্রকার আসক্তি হতে বিরত থাকার কথা বলেছেন।

মানুষ সদ্‌গুরুর (চেতনগুরুর) সঙ্গ করে কেবলমাত্র আত্মার ভুল সংশোধনের জন্য। আর আত্মার ভুল সংশোধনই হচ্ছে সর্ব প্রকার পাপাচার হতে মুক্তি লাভ করা। ইহাই মূলতঃ *আত্মার স্বভাব মুক্তি বা আত্মার মুক্তি লাভ* করা।

মহাগুরু রমিজের মতে মানবাত্মা নিষ্কলুষ হলে ইহা পরম আত্মায় পরিণত হয় এবং এ অবস্থায় তাঁর মধ্যে পরমত্ব সৃষ্টি হয়। স্রষ্টা নিজেই পরম আত্মা। মানবের পরম আত্মা হলো স্রষ্টার জাত। তাই, মানবের পরম আত্মা স্রষ্টার পরম আত্মার সাথে নিবিড়ভাবে মিলিত হয়। আর এ মিলন হলো পরমে পরমে মহামিলন। আধ্যাত্মিকভাবে ইহাকে মারেফতের উচ্চস্তর বলা হয়।

গুরু রমিজের মতে এ অবস্থায় উক্ত মুক্ত আত্মা (পরমআত্মা) মৃত্যুর পর আর পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে আসতে হয়না। এ *মুক্ত আত্মার মধ্যে আত্মবোধ, আত্মচেতনা, আত্মজাগরণ আত্মনিষ্ঠা ইত্যাদি সৃষ্টি হয়*। ক্রমে ক্রমে উক্ত আত্মা জন্মরোধ ও কর্মরোধের স্তরে এসে যায়।

এ প্রসঙ্গে মহাগুরু রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন- ***"যার হয়েছে আত্মবোধ, তার হইল কর্মরোধ***
হইল সে খোদে খোদ, যখন যার ইচ্ছায় করে" - বাণী-১৩ এর অংশ (অলৌকিক সুধা)

রমিজ নীতির অষ্টম বৈশিষ্ট্য

মানবের প্রতি স্রষ্টার তরফ হইতে আদেশ, ঈশারা ও ইঙ্গিত স্বরূপ স্বপ্ন সাধন

মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখলে ইহা সম্বন্ধে প্রচলিতভাবে কথিত আছে যে, স্বপ্ন শয়তানে দেখায় বা শয়তানের তরফ থেকে আসে। ইহা একটি গুজব মাত্র। এ জাতীয় গুজব বহুকাল পূর্ব হতেই চলে আসছে। ক্রমে ক্রমে মানুষ বিদ্যা-শিক্ষা অর্জন করছে এবং সকল বিষয়েই মানুষের চেতনা বাড়ছে। এমন এক সময় ছিল যখন কোরআন, হাদীস ইত্যাদি ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর বাংলায় অনুবাদ ছিলনা। সামান্য আরবী পড়ুয়া মানুষ অন্য মানুষকে যা বুঝাতো তাই বুঝতো। এর পরও হাদীস-কোরআনের বঙ্গানুবাদ পড়ে অল্পশিক্ষিত তথাকথিত মৌলভী সাহেবগণ বাড়ি বাড়ি মিলাদ পড়তেন এবং আঞ্চলিক ভাষায় মনগড়া মতে অথবা ভাব প্রবণতায় ইসলামের কথা প্রচার করতেন। উক্ত মৌলভী সাহেবদের ছেলেরাও, শিক্ষা-দীক্ষা থাকুক আর না-ই বা থাকুক, বিভিন্ন স্থানে মৌলভী বা মোল-া নাম ধারণ করে ধর্মীয় কথা প্রচার করতেন। হাদীস কোরআনের অর্থ একজনের কাছে শুনে আরেকজনের কাছে বলতো। এভাবেই বিষয়বস্তু একজন থেকে আরেকজন পর্যন্ত জনান্তর হতো। শেষ পর্যন্ত বিষয়বস্তুর মূল অর্থ অন্য রকম হয়ে যেতো। এমনকি অর্থ বিপরীত হওয়াও অস্বাভাবিক কিছু ছিলোনা।

কিন্তু বর্তমান চেতনার যুগে আমরা সবাই ধর্মীয় পুস্তকের বঙ্গানুবাদ থেকে হাদীস শরীফ ও কোরআন শরীফের মূলভাব বুঝার চেষ্টা করতে পারি এবং অন্ততঃপক্ষে নিজকে নিজে বুঝাতে পারি।

স্বপ্ন শুধু শয়তানেই দেখায়-একথা বলে কোন মৌলভী সাহেব এখন আর শিক্ষিত লোকদের কাছে স্থান পাবেন না।

সহীহ্ বোখারী শরীফ (সকল খন্ড একত্রে) সম্পাদনা ও বাংলা অনুবাদ মুহাম্মদ শাহ্জাহান খান, প্রকাশক মোহাম্মদ জুবায়েদ তালুকদার (জনি), দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৬ইং। প্রাপ্তিস্থান তাহের পাবলিকেশন, বিশাল কমপে- ক্স, বাংলা বাজার, ঢাকা।

উক্ত বোখারী শরীফের আটাশতম অধ্যায় স্বপ্নের তাবীর আলোচনা পর্ব।

"নেক্কার লোকের স্বপ্ন নবুয়তের অংশ"

৩৪২৪। হাদীস ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত নবী করিম (সঃ) বলেছেন, নেক্কার লোকের উত্তম স্বপ্ন নবুয়তের ছেচলি- শ ভাগের একভাগ।

"ভাল স্বপ্ন আল-াহ্র পক্ষ থেকে হয়"

৩৪২৫। হাদীস ঃ হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত নবী করিম (স.) বলেছেন, ভাল স্বপ্ন আল-াহ্র পক্ষ থেকে আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

এ রকম আরো হাদীস বর্ণিত আছে।

উক্ত হাদীস মোতাবেক বলা যায় যে, যারা নেক্কার অর্থাৎ যারা ভাল কাজ, ভাল ধর্ম-কর্ম করেন তাঁরা আল-াহ্র তরফ হতে স্বপ্ন পেয়ে থাকেন এবং ভাল লোকদের উত্তম স্বপ্ন নবুয়্যতের ছেচলি- শ ভাগের এক ভাগ।

সুতরাং, এ জাতীয় স্বপ্ন পাওয়া ইসলাম সমর্থিত।

সনাতন ধর্ম মতে উক্ত স্বপ্নকে **দৈববাণী** বলা হয়। তাদের শাস্ত্রমতে স্বপ্ন বা **দৈববাণী স্বর্গধাম** হতে মণি ঋষিদের কাছে আগত হয়। *ধ্যানের মাধ্যমেও দৈববাণী পাওয়া যায়।*

এবার খারাপ স্বপ্ন সম্বন্ধে হাদীস গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ইহা শয়তানে দেখায়। অর্থাৎ *খারাপ স্বপ্ন শয়তান হতে প্রাপ্ত।*

দেহের রিপু ও ইন্দ্রিয়াদি মানুষের কুকর্মের জন্য দায়ী। যারা সর্বদা অসৎ ও কুকর্মে জড়িত থাকে তাদের মন মানসিকতা এভাবেই গঠিত হয়। তাদের চিন্তা-ভাবনা এগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। *যারা অবৈধ ব্যবসা, অবৈধ কর্ম, ঘুষ, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, অপহরণ ইত্যাদিতে লিপ্ত তারা ঘুমন্ত অবস্থায়ও এ সমস্ত অপকর্মই দেখে থাকে।*

ঐরূপ অবৈধ কর্মকান্ড যাদের ভাবনা চিন্তার খোরাক তারাতো রাত্রে ঘুমের মাঝে ইহাই দেখা স্বাভাবিক। যার যেই স্বভাব সে সেই স্বভাব মতেই স্বপ্ন দেখবে।

ভাল মন্দের বিচার বিশে- ষণ করতঃ ইহাই বলা যায় যে, উত্তম কর্ম দ্বারা উত্তম স্বপ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং খারাপ কর্ম দ্বারা খারাপ স্বপ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

স্বপ্ন কিভাবে মানব মস্তিস্কে আসে তাহা এ পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানী বা দার্শনিক বল্তে পারেন নাই। *এগুলো সম্পূর্ণ নৈসর্গিক বিষয়াবলী।*

তবে একটি জিনিস নিয়ে অত্যন্ত ভাবনা, ধ্যান বা চিন্তার বিষয় যে, ঘুমন্ত অবস্থায় প্রায়ই দেখা যায় আমরা হাত দ্বারা অনেক কিছু করি, পা দ্বারা হাটা হাটি বা দৌড়া দৌড়ি করি, চোখ দ্বারা অনেক কিছু দেখি, কর্ণ দ্বারা অনেক কিছু শুনি, যানবাহন দ্বারা বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন করি। কিন্তু ঘুম ভাঙ্গলে বস্তুত দেখা যায় যে, ঘুমে যাওয়ার পূর্বক্ষণে যেখানে যেভাবে ছিলাম সেখানে সে অবস্থায়ই আছি। হাত-পা, নাক-কান, চোখ-মুখ ইত্যাদি ঘুমন্ত অবস্থায় যা করেছে বলে দেখেছি মূলতঃ তা কিছুই করে নাই। ইহারা প্রত্যেকটি বিশ্রামে ছিল।

কৌতুহলের বিষয় এই যে, ঘুমন্ত অবস্থায় যাহা কিছু করেছি বা দেখেছি তা সবই মনে আছে। এখানে এক প্রকার স্মৃতিশক্তিও কাজ করেছে। অনেক স্বপ্ন আছে বহুদিন এমনকি আজীবন মনে থাকে এবং আমাদের স্মৃতিশক্তি স্বপ্নের সবকিছু ধরে রাখতে পারে।

তাহলে স্বপ্নের ঐ হাত, পা, চোখ, কান, নাক ইত্যাদিগুলো কি ? এবং কোথা হতে এলো ? যেহেতু ইহাদের কর্মকান্ডের সবই আমাদের স্মৃতিশক্তিতে আছে, সেহেতু এগুলোওতো এক ধরণের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক বা ইন্দ্রিয় সমূহ যাহা জাগ্রত অবস্থায় আমাদের দেহাস্থিত ইন্দ্রিয়াদির মত দেখা যায় না। কিন্তু আমাদের স্মৃতিতে অক্ষয় অব্যয় অবস্থায় আছে।

তবে এগুলো আমাদের দেহাস্থিত ইন্দ্রিয় হতে অনেক প্রবল, অনেক শক্তিশালী, অনেক স্মৃতি বহনকারী দেহের ইন্দ্রিয় সমূহ নষ্ট বা অকেজো হতে পারে, বিকৃত হতে পারে, কার্যক্ষম নাও থাকতে পারে। কিন্তু উক্ত ইন্দ্রিয়গুলি কোন সময়ই নষ্ট, বিকৃত, অকার্যকর হতে পারে না।

গুরু রমিজ তাই ঐ গুরুত্বপূর্ণ ইন্দ্রিয়গুলোকে অতীন্দ্রিয় নামে অভিহিত করেছেন। অতীন্দ্রিয়ের প্রভাবেই মানুষ, নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন পেয়ে থাকে। এ সমস্ত স্বপ্ন বিশেষ অর্থ বহন করে। *আধ্যাত্মিক জগতে যারা স্বপ্ন বিশারদ তাঁরাই পারেন স্বপ্নের বিশে- ষণ দিতে।*

সূফী সাধকগণ অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাসী। তারা স্রষ্টা ও সৃষ্টি বিষয়ে তাঁর নিগুঢ় রহস্য মরমে মরমে বা মর্মে মর্মে অনুভব করতঃ ধ্যান যোগে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করার সাধনা করেন। তাহাদিগকে মরমীয়া সাধকও বলা হয়। অতীন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সূফী সাধক বা মরমীয়া সাধকগণ স্রষ্টা ও সৃষ্টির নিগুঢ় রহস্য বা নিগুঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করার চেষ্টায় রত থাকেন।

আধ্যাত্মিক সাধনার মহান মহর্ষিদের জন্য স্রষ্টার সাথে যোগাযোগের সরাসরি মাধ্যম হচ্ছে অতীন্দ্রিয় *মনন ও ধ্যান যোগে অতীন্দ্রিয় যোগ হয়*। এ অতীন্দ্রিয় যোগের দ্বারা যুগে যুগে মহামানব, অবতার, নবী, রাসূলগণ ঐশ্বরিক বাণী লাভ করতেন। বাণীর সমাহারে মানব কল্যাণে ধর্মীয় পুস্তক আকারে মানব সমাজে প্রচারিত হয়েছে।

গুরু রমিজ প্রবল অতীন্দ্রিয়বাদী ছিলেন এবং তিনি একজন স্বপ্ন বিশারদ ও স্বপ্ন তত্ত্ববিদ ছিলেন। স্বপ্নের মাধ্যমেই স্রষ্টা মানুষের ভাল মন্দ কর্মফল, আধ্যাত্মিক, জাগতিক ও পারমার্থিক চলার পথ দেখিয়ে দেন। স্বপ্ন বিশে- ষণ পূর্বক মানুষ শুদ্ধ পথে চলতে পারে। স্বপ্নের বিশে- ষণ নিয়ে আলোচনাকালে গুরু রমিজ বলেছেন "দিনের বেলায় অথবা রাত্রে জাগ্রত অবস্থায় তোমরা যাহা চিন্তা বা কল্পনা কর ঘুমের ঘোরে তাহাই দেখিতে পাও। কিন্তু স্বপ্নে যাহা দেখ তাহার ফল প্রায়ই তেমন হয় না। তাহার কারণ, তোমরা স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পার না বলিয়া আবল তাবল বকাবকি কর"।

জৈন শাস্ত্রের কথা উলে- খ করে তিনি বলেন- ***"প্রথম স্বপ্নেতে হয় বাণী ও দর্শন***
যেভাবে স্বভাবে স্বপ্নে তাহা উদ্দীপন,
জানিয়া গুরুর কাছে বুঝিয়া তখন
ক্রমে ক্রমে যোগ পথে কর আরোহণ"

অর্থাৎ "তোমরা যেমন স্বভাব ধারণ করে আছ ও যেই রূপ কর্মকান্ড করতে অভ্যস্ত স্রষ্টা তাহার ভিতর দিয়া সেই ভাবেই তোমাদের ভাল মন্দের খবর দিয়া থাকেন। যদি বুঝিতে না পার তবে সদ্‌গুর"র নিকট সম্যক অবগত হইয়া সাধনার উচ্চস্তরে গমন কর"।

পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল, মহামানব, অবতার, অলি, ঋষি, যোগী মানব কল্যাণে এসেছেন সবাই ধ্যান ও যোগের মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় দ্বারা আপনাআপনি অতীন্দ্রিয় জ্ঞান (Ethereal Knowledge) অর্জন করতঃ উক্ত জ্ঞানশক্তি সঞ্চারণ, বিকিরণ ও আকর্ষণের কাজে লাগিয়ে স্রষ্টার প্রেমাকর্ষণ সৃষ্টি করে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছেন। *গুর" রমিজের মতে ইহাই সৃষ্টি ও স্রষ্টার সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম।*

গুর" রমিজ স্বপ্ন প্রেরণ ও স্বপ্ন প্রাপ্তি এ দুটো সাধনাই করতেন।

আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর নিকট স্রষ্টার তরফ হতে কোরআন নাজিল হওয়ার কয়েকটি মাধ্যমের মধ্যে স্বপ্ন একটি উলে- খ-যোগ্য মাধ্যম।

বোখারী শরীফ (সকল খ" একত্রে), প্রকাশক মোহাম্মদ জুবায়েদ তালুকদার (জনি), দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৬ ইং মতে হযরত রাসূলুল-াহ্ (সঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ প্রথম অহী: ৩। হাদীসঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম হযরত রাসূলুল-াহ্ (সঃ) এর নিকট অহীর সূচনা হয় ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের আকারে। স্বপ্নে তিনি যা দেখতেন তা-ই দিবালোকের মত তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে যেত। কিছুকাল এ অবস্থা চলার পর আপনা থেকেই তাঁর মন লোকালয় থেকে সংস্রবহীন নির্জনে থাকার প্রেরণার সৃষ্টি হয়। তিনি মক্কানগরী থেকে তিন মাইল দূরে হেরা নামক পর্বত গুহায় নির্জনে বসে ধ্যান করতে লাগলেন। তিনি পানাহারের জন্য প্রতিদিন বাড়ি এসে সামান্য কিছু খাদ্য সামগ্রী নিয়ে যেতেন এবং সেখানে একাদিক্রমে অনেক রাত ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দিতেন। কিছুদিন পর হযরত খাদিজা (রাঃ) এর সাথে দেখা করার জন্য বাড়ি আসতেন। পুনঃরায় কিছু পানাহার সামগ্রী নিয়ে একাধারে ইবাদত বন্দেগীতে রত হওয়ার জন্য হেরা পর্বতের গুহায় গমন করতেন।

এভাবে হেরা পর্বতের গুহায় আল-াহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকা অবস্থায় হঠাৎ একদিন তাঁর নিকট সত্য আগমন করে। অর্থাৎ মহান আল-াহ্‌র পক্ষ থেকে ফেরেশ্‌তা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ওহী নিয়ে হযরত রাসূল (সঃ) এর সামনে উপস্থিত হয়ে বলেন "ইকরা" (হে-নবী) "আপনি পড়ুন"। পাঠ কর"ন আপনার প্রভুর নামে যিনি আপনার সৃষ্টিকর্তা। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্তপিন্ড হতে। পাঠ কর"ন আপনার প্রভু অতি মহান।

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ***স্বপ্নের মাধ্যমে প্রথম কোরআন নাজিল আরম্ভ হয় এবং ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, স্রষ্টার সাথে যোগাযোগের একটি অতি উত্তম মাধ্যম হলো স্বপ্ন।***

সূফী সাধকগণ যেমন স্বপ্নে বিশ্বাসী বা অতীন্দ্রয়বাদী তেমনি গুর" রমিজও অতীন্দ্রিয়বাদী ছিলেন। স্বপ্ন বা দৈববাণীকে রমিজ আধ্যাত্মিক হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করতেন। তাই তিনি সনাতন ধর্মের অনুসারী-দের মতে বলেছেন-

"মনরে যুগের কর্তা চূড়ামণি, রমিজ কয় সব জানাজানি,
হাতের তলোয়ার দৈববাণী, তার সাথে কেউ টিকবেনা,
সেই তলোয়ার ভক্ত সবার, পুরা করিবে বাসনা"।

বাণী-১১ এর অংশ (স্বর্গের সুধা)

রমিজের বংশের সেজরা নামা বিশে- ষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর পূর্ব পুর"ষগণ সবাই সূফী সাধক এবং সূফী ছিলেন।

গুর" রমিজ একেশ্বরবাদী, প্রেমবাদী ও অতীন্দ্রিয়বাদী ছিলেন। তাঁর **পূর্ব পুর"ষগণ সূফীবাদে বিশ্বাসী ছিলেন**। স্বপ্ন অতীন্দ্রিয় সাধনের ফসল। ***গুর" রমিজ সৃষ্টিতত্ত্ব,গুর"তত্ত্ব,প্রেমতত্ত্ব,কর্মতত্ত্ব (কর্মবাদ) এবং স্বপ্নতত্ত্বকে একই সূত্রে বাঁধা বলে মনে করতেন।*** এই বিষয়গুলো স্রষ্টার তরফ হতে প্রেরিত স্বপ্ন যোগের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অতীন্দ্রিয় ও স্বপ্ন যোগের মাধ্যমে ঐশ্বরিক ঐক্য লাভ করাই গুর" রমিজের চরম লক্ষ্য ছিল।

রমিজ স্বপ্নকে স্রষ্টার তরফ হতে মানবের প্রতি আদেশ, ঈশারা বা ইঙ্গিত স্বরূপ মনে করতেন। *যারা স্বপ্ন সাধনের উচ্চমার্গে পৌঁছতে পারেন তাঁরা স্বপ্নের চুলচেরা বিশে- ষণ দিতে পারেন। উক্তরূপ মহামান্য সাধক গণের সঙ্গ করতঃ নিজ কর্ম ও কর্মফলের বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ জেনে শুনে আত্মসাধনে সুফল পাওয়া যায়।*

গুরু রমিজ একাধারে চব্বিশ বছর নিজ গৃহে (বর্তমান রমিজ ভবনের দোতলায়) অবিরাম ধ্যান-যোগ সাধনায় মগ্ন ছিলেন। এ সাধনার সময় এবং তার অনেক পূর্ব হতেই তিনি ও তাঁর ভক্তবৃন্দ প্রাণী হত্যা বা জীব হত্যা করতেন না। তিনি ও তাঁর ভক্তবৃন্দ সম্পূর্ণভাবে নিরামিষ ভোজীতে পরিণত হন। একটি প্রাণীকে হত্যা করে খাদ্য লোভের জন্য তার মাংস উদরপূর্ণ করতঃ অন্য প্রাণী বা মানুষের হিতার্থে স্রষ্টার কাছে আবেদন করা যায় না। আত্মসংযমের নিমিত্তেও নিরামিষ ভোজনের বিধান অনুশীলন করা হয়। সর্বজীব তথা স্রষ্টাকে ভালোবাসা এবং তার জাতের সাথে লয় হওয়ার কারণেও জীব হত্যা বন্ধ করা হয়। এ কঠিন সাধনার ফলশ্রুতিতে তিনি স্রষ্টার কাছে যখন যা আবেদন করতেন সে অনুযায়ী অতীন্দ্রিয়ের মাধ্যমে (স্বপ্নের মাধ্যমে) তার ফলাফল পেতেন। আবার অতীন্দ্রিয় সাধনার অতি উচ্চতম মার্গে পৌঁছে তিনি স্রষ্টার কাছে আবেদন করতঃ তাঁর ভক্তদেরকে স্বপ্নযোগে আধ্যাত্মিক খবরাখবর, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদি জানাতে সক্ষম হতেন। স্বপ্নযোগ ছিল তাঁর অধ্যাত্ম সাধনার হাতিয়ার স্বরূপ। তাই তিনি স্বপ্ন-যোগকে হাতের তলোয়ার দৈব-বাণী আখ্যায়িত করেছেন।

রমিজ নীতির নবম বৈশিষ্ট্য

রুহের দেশ আলমে আরওয়াকে উপলব্ধিকরণঃ

আমরা কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম, আবার কোথায় যাবো এ তিনটি জিজ্ঞাসা মানবের অতি সনাতন প্রশ্ন এবং মানবচিত্তে অহরহ কৌতুহল সৃষ্টিকারী। এ কৌতুহলের যেন কোন শেষ নেই। প্রত্যেক ধর্মই এর সমাধানের জন্য মুখরোচক কথা ও ভাষা দ্বারা মানব মনকে বুঝ দেয়ার যথেষ্ট সুব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ততোই মানুষের চেতনা বাড়ছে। কথা

ও ভাষা যেন মানব চৈতন্যের সাথে বিজয়ী হতে পারছেনা।

উপরোক্ত তিনটি জিজ্ঞাসার মধ্যে আমরা কোথায় এলাম এ প্রশ্নটির বেলায় সবাই একমত যে, আমরা বা আমাদের আত্মাসমূহ পৃথিবী নামক একটি গ্রহে জন্ম নিয়েছি এবং এখন পর্যন্ত আছি। আত্মা বলতে বুঝা যায় যে, এটা মানবদেহে কিংবা প্রাণী দেহে ব্যাপৃত চৈতন্যময় সত্তা যার উপস্থিতিতে মানব বা প্রাণী বেঁচে থাকে এবং যার অনুপস্থিতিতে মানব বা প্রানী দেহ নিয়ে আর বেঁচে থাকতে পারে না।

মৃত্যুর পর উক্ত সত্তা কোথায় চলে যায় তার খবর বা ঠিকানা কেউ বলতে পারেনা। আমরা সব সময় নিজ বাড়িতে থাকি। বাড়ি হতে কোথাও গেলে যত দিনই থাকিনা কেন আবার নিজ বাড়িতে ফিরে আসি। অন্যত্র কোথাও বাড়ি বাঁধলে ওখান থেকে কোথাও গেলে আবার ঐ বাড়িতে ফিরে আসা হয়।

পশু পাখিদের বেলায়ও দেখা যায় যে, আপন বাসা বা নীড় ছেড়ে অন্যত্র গেলে গোধূলী বেলায় সবাই নিজ নিজ নীড়ে ফিরে আসে।

এ বিশ্ব প্রকৃতির সকল প্রাণীদের বেলায় একই নীতি বজায় থাকে।

কোন কোন পাখি বিভিন্ন মৌসুমে এক দেশ থেকে অন্য দেশে দেশান্তরিত হয়ে যায়। নির্দিষ্ট সময় পর, নির্দিষ্ট মৌসুম শেষ হওয়ার পর পুনরায় নিজ দেশে নিজ নীড়ে ফিরে আসে। এইক্ষেত্রে কারো কোন আদেশ নিষেধ লাগেনা। প্রকৃতিগত কারণেই তারা সুনির্দিষ্ট পথে ও আবাসে চলে যায়। প্রকৃতি স্রষ্টার ইচ্ছায় ও আদেশে চলে।

তাই মানব ও সকল প্রাণীর আত্মা সমূহও স্রষ্টার ইচ্ছায়, মহাপ্রকৃতিগত কারণে ও তাঁর বিধান মতে পৃথিবী নামক বাসস্থানে আসা-যাওয়া করে। এ বিষয়টি যুক্তি ও অনুভবের বিষয়।

আত্মাকে দেখা যায় না কিন্তু অনুভবের বিষয়। আত্মার আসা-যাওয়া অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু স্বচক্ষে দেখা যায় কিন্তু কোথায় যায় তা একান্তভাবে ধ্যান ও অনুভবের বিষয়।

পাখি যদি পাখির দেশে যায়, পশু যদি পশুর দেশে যায়, কীটপতঙ্গ তাদের নিজ স্থানে যায় তবে অবশ্যই আত্মা তার বাসা (দেহ) ছেড়ে আত্মার দেশে চলে যাবে। আত্মার এই দেশকেই আলমেআরওয়া বলে। আত্মার কোন মৃত্যু নেই, কেবল স্থানান্তর হয়ে থাকে।

তবে, মানবগণ সদ্‌গুরুর মাধ্যমে সৎকর্ম করতঃ উক্ত আসা-যাওয়া বন্ধ করতে পারে। *এই আসা-যাওয়া বন্ধ করাকে আত্মার মুক্তি লাভ বা নির্বাণ বলা হয়*। তাহলে, নির্বাণ লাভ না করা পর্যন্ত সকল আত্মাই তার দেহ বদলিয়ে কর্ম অনুযায়ী নতুন দেহ ধারণ করার জন্য মৃত্যুর ছলে পুনরায় আত্মার জগতে (আলমে আরওয়ায়) চলে যায়। এ প্রসঙ্গে

গুরু রমিজ বাস্তব প্রমাণসহ একটি আপ্তবাক্যে তাঁর ভাষায় বলেছেন- ***"রুহের দেশ আছে একটি পেয়েছি প্রমাণ***
আসা যাওয়া করে জীব সেইখানে তাঁর স্থান।
মৃত্যুর আগে বলে লোকে আমি যাই বাড়ি
তৎক্ষণাৎ চলে যায় সে নিজ দেহ ছাড়ি।" উপদেশ-১৭ (স্বর্গে আরোহণ)

এখানে যে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বক্ষণে নিজ বাড়ি চলে যাওয়ার কথা বলেন, নিশ্চয়ই তখন তাঁর অধ্যাত্ম বিষয়ের বিবেক আত্মার দেশে বা আত্মার জগতে যাবার সাড়া দিয়ে থাকেন। এমনকি এ অবস্থায় তাঁর পরমাত্মা আত্মার দেশের সাথে যোগাযোগ হয়ে যায়।

গুরু রমিজ এ বিশ্ব ছেড়ে চলে যাবার পূর্ব মুহুর্তে বলেছেন*"আমি চলে যাচ্ছি, আমার আর সময় নেই, তোমরা বিধান মতে চলবে"। অতঃপর স্রষ্টার কাছে হাত তুলে জীবনের শেষ আবেদন করা শেষ হওয়া মাত্র দোতলার বারান্দায় বসা অবস্থায়ই তাঁর স্ত্রী নুরজাহান বেগমের কাঁধে হাত রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।* উপস্থিত ভক্ত, ছেলে মেয়ে তা অবলোকন করেন।

যারা রুহের দেশ আলমে আরওয়াকে উপলব্ধি করতে ইচ্ছুক তারা পার্থিব চিন্তা ত্যাগ করে পারলৌকিক বা অপার্থিব চিন্তা মননে ও ধ্যানে মগ্ন থাকতে হবে।

নিজ সদ্‌গুরু প্রদত্ত বিধান এবং আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা নিয়েই সময় কাটাতে হবে। *সর্বদা ফানাফিল-াহ্,বাকাবিল-াহ্ ও মারেফতের উচ্চস্তরে মগ্ন থাকতে হবে*। পার্থিব জগতের ছেলে মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবই ত্যাগ করতে হবে।

স্রষ্টা ও সৃষ্টির জন্য অনর্গল চোখের জল থাকতে হবে। সর্বজীব তথা স্রষ্টার কৃপা লাভের জন্য ব্যাকুল থাকতে হবে। স্রষ্টা ও বিশ্ব প্রকৃতির কাছে নিজ পরমাত্মাকে সমর্পণ করতঃ বিলীন হয়ে একাকার হয়ে যেতে হবে। দেহের যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের চালক মন থেকে সকল ইন্দ্রিয় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তখনই তাঁর মধ্যে খুলে যাবে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান (Ethereal Knowledge)। আরো খুলে যাবে দিব্যচক্ষু এবং পারলৌকিক (আধ্যাত্মিক) দর্শন। পেয়ে যাবে আত্মপরিচয়, পেয়ে যাবে আত্মার দেশের পরমাত্মার ঠিকানা। ধ্যানে, মননে স্বপনে, দর্শনে, দৈববাণী, এলহাম ও দিব্যজ্ঞানে মরমে মরমে অনুভব করতে পারবে অদেখা সেই রুহের দেশ আলমে আরওয়াকে।

উক্ত বিবরণের অনুকুলে মহাগুরু ও মহাসূফী রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন-

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে যাবে গুরুর পাশ
মনেতে রাখিবা তুমি চির কৃতদাস।
তাহা হইলে সর্বজীবের কৃপা তুমি পাবে
সত্যজ্ঞান হৃদয়ে তোমার ফুটিয়া উঠিবে।
দেখিবে জ্ঞানের আলো খুলিবে দর্শন
বিশ্বমাঝে আর কিছু নয় শুধু একজন।
হইবে আত্মার মুক্তি, লয় সৃষ্টি হাতে
মিশিবে অনন্তের সাথে, আপনার ইচ্ছাতে।
ভাল-মন্দ যাহা তোমার হইবে দরকার
জ্ঞানের চক্ষে দেখিবে তুমি ইচ্ছায় আপনার।
তখন এক অনন্ত দয়া হৃদয়ে হইবে
অনর্গল চক্ষের ধারা আপনি বহিবে।
হইবে তোমার মধ্যে সত্যের পরিচয়
যথায় তুমি তথায় আমি জানিও নিশ্চয়।

উপদেশ-২৪-৩০ (অলৌকিক সুধা)

সদ্‌গুরুর পরম ভক্ত যখন উপরোলি-খিতভাবে নিজকে নিজে তৈরী করতে পারেন, তখন তিনি মারফতের উচ্চস্তরে অবস্থান করেন। এ অবস্থায় তাঁর দিব্যচক্ষু এবং দিব্যজ্ঞান খুলে যাবে। তাঁর ইচ্ছায় রুহের দেশ আলমে আরওয়াকে উপলব্ধি পূর্বক জ্ঞানের চোখে বা দিব্যচক্ষে দেখতেও পারেন।

রমিজ নীতির দশম বৈশিষ্ট্য

নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন:

স্রষ্টাকে পাবার জন্য পৃথিবীতে বহুধর্ম, বহুপথ ও বহুমত রয়েছে। প্রত্যেক ধর্ম, মত ও পথে মানুষের সৎ চরিত্র গঠন করার একটি সাধারণ আদেশ ও উপদেশ আছে। সৎ চরিত্রবান না হলে কোন পদ্ধতিতেই স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করার পথ এবং অবকাশ নেই।

যার চরিত্র নষ্ট হয়েছে তার সর্বস্ব-ই নষ্ট হয়েছে। যার ভাল চরিত্র নেই তার কিছুই নেই।

উত্তম চরিত্র গঠন করাই মানুষের সর্বপ্রথম লক্ষ্য থাকা উচিৎ। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর চরিত্র পৃথিবীতে অতুলনীয়। তিনি ছিলেন প্রথমতঃ সত্যবাদী ও সত্যের প্রতীক এবং মানব জাতির জন্য আদর্শ। সত্যবাদী বলে তাঁকে সমকালীন সর্বলোকে আলামীন খেতাব দিয়েছিলেন।

যত ধর্ম অবতার, নবী-রাসূল, মহামানব, পীর-মুর্শিদ, অলী আল-াহ্ ও গাউছ-কুতুব আছে সবার ইতিহাসে বা জীবনীতে সত্যবাদিতা ও সর্বোত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উলে-খ পাওয়া যায়। তাঁদের জীবনাচরণ পর্যবেক্ষণ করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সৎ চরিত্রবান হওয়ার পূর্বশর্ত হলো সত্যবাদী হওয়া। আবার সত্যবাদী হতে হলে সর্বপ্রথম আচার-আচরণে, কথায় ও কাজে-কর্মে, আদেশ ও উপদেশে সর্বপ্রকার মিথ্যা বর্জন করতে হবে। আরো বর্জন করতে হবে প্রবঞ্চনা, বর্জন করতে হবে সমাজবিরোধী অসৎ কর্মকান্ড ও ছিন্ন করতে হবে মিথ্যার সঙ্গ।

তাই রমিজ বিশ্ব বিধাতা বা সৃষ্টির স্রষ্টার কাছে তাঁর ভাষায় বলেছেন- ***"মাগো এবার কর বিচার***
কেটে দেওগো মায়ার বাঁধন
জানাইগো চরণে তোমার"।

- ১। মা তুমি থাক অন্তরে, জান তুমি যে যা করে
  জানাইগো চরণ ধরে, মিথ্যার সঙ্গে ছিন্নগো আমার।
- ২। প্রবঞ্চনা বিধান বিরোধী, অসৎ কর্ম মিথ্যাবাদী
  তারা মহাঅপরাধী, শান্তি ভবে দিওনা কার।
- ৩। রমিজ বলে সব গোপন, জান তুমি কে কার আপন
  কেটে দেওগো কর্মের বন্ধন, পুরা কর বাসনা তার। –বাণী নং-১৩ (স্বর্গে আরোহণ)

গুর" রমিজ উক্ত বাণীতে পার্থিব জগতে যত মোহ মায়া আছে তা কর্তন করতঃ তাঁকে স্রষ্টাগত মন-প্রাণ সৃষ্টি করার জন্য বিচার বিবেচনা করার নিমিত্তে বিধাতার বিধানে অনুগত হয়ে আবেদন-নিবেদন করছেন।

মাতারূপী স্রষ্টা ভক্তের অন্তরে থেকে অন্তর্যামী হয়ে যে যা করে সবই জানেন। বিধাতার চরণ ধরে অর্থাৎ বিধির বিধানে অনুগত হয়ে স্রষ্টাকে পাবার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার মিথ্যা ও ছলনা বর্জন করেছেন।

প্রবঞ্চনাকারী, অসৎ ও মিথ্যাবাদী তারা সকলেই স্রষ্টার বিধান বিরোধী। তাদেরকে গুর" রমিজ বিধাতার আইনে বা বিধানে "মহা অপরাধী" (যে অপরাধের ক্ষমা নেই) বলে অ্যাখ্যায়িত করেছেন।

উক্ত পাপে জড়িত যারা, তারা স্রষ্টার বিধানমতে শান্তি পেতে পারে না।

রমিজ আরো বলেছেন, যে বা যারা উক্ত অপরাধের অপরাধী নয়, তা কেবল মাত্র বিধাতাই জানেন, কারণ বিধাতা সকলের গোপন তথ্যই অবগত আছেন। কে কার আপন কে কার পর সবই স্রষ্টা জানেন। অর্থাৎ স্রষ্টার বিধান কে মানে, আর কে মানে না, তা স্রষ্টাই অবগত আছেন।

তাই, যারা নিরপরাধী তাদেরকে কর্ম-মুক্ত বা ভেজালমুক্ত করতঃ আত্মিক বাসনা পুরা করার জন্য গুর" রমিজ এখানে স্রষ্টার নিকট আবেদন করছেন।

অতঃপর সৎ চরিত্রবান হতে হলে ষড়রিপু ***(কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য)*** ত্যাগ করতে হবে। ষড়রিপু বর্জনের সাথে সাথে ইন্দ্রিয়াদি তাড়িত অসৎ কর্ম বন্ধ করতে হবে।

ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত হয়ে মানুষ ষড়রিপু ও অন্যান্য পাপ কর্মে লিপ্ত হয়। তা হলে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা দরকার।

ইন্দ্রিয়– যে সকল অঙ্গ বা শক্তি দ্বারা পদার্থের বা বাহ্য বিষয়ের উপলব্ধি বা জ্ঞান জন্মে এবং কর্ম সাধন করা যায় উহাদিগকে ইন্দ্রিয় বলা হয়।
ইন্দ্রিয় মোট চৌদ্দটি যথা ঃ (ক) চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক-এ পাঁচটি **জ্ঞানেন্দ্রিয়**।

(খ) বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ- এ পাঁচটি **কামেন্দ্রিয়**।
(গ) মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত- এ চারটি **অন্তরিন্দ্রিয়**।

বিঃ দ্রঃ (মন সকল ইন্দ্রিয়ের পরিচালক)

উপরোক্ত ষড়রিপু ও ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়ে মানুষ আমাদের দেশের রেওয়াজ বা রীতি অনুযায়ী গুরু রমিজের ভাষায় *এগার ধরণের পাপ কার্যে জড়িত হয়*।
ভক্তদের জানার জন্যে এবং এগুলো বর্জনের জন্য উক্ত এগার ধরণের পাপ কার্যগুলো নিম্নে উলে- খ করা হলো।

• *১। নর/নারী হত্যা করা।*	• *৭। স্ত্রী লোকের যোনীদ্বারের পরিবর্তে গুহ্যদ্বার ব্যবহার করা।*
• *২। অপগর্ভ করতঃ ভ্রূণ হত্যা ও গর্ভধারিনী হত্যা করা।*	• *৮। হস্তমৈথুন করা।*
• *৩। জীব হত্যা করা বা মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খাওয়া।*	• *৯। প্রবঞ্চনা করা।*
• *৪। চুরি, ডাকাতি, অপহরণ ইত্যাদি করা।*	• *১০। পশুর সঙ্গে সঙ্গম করা।*
• *৫। পরস্ত্রী হরণ/পরস্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ মিলন।*	• *১১। ফকিরী সাধনের উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন কারণে **মল, মূত্র, বীর্য ও মহিলাদের স্ত্রীরজঃ (মাসিক রক্তস্রাব)** পান করা।*
• *৬। পুরুষে পুরুষে/নারীতে নারীতে সমকামিতা।*	

* উলে- খ্য যে, রমিজ তাঁর ভক্তদের জন্য উক্ত কর্মগুলো চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

বিশেষভাবে উলে- খ্য যে, -

- ১। সত্যবাদী হওয়া
- ২। মিথ্যা বর্জন করা
- ৩। ষড়রিপু ও ইন্দ্রিয়ের বশীভূত না হওয়া এবং
- ৪। রমিজ বর্ণিত এগার ধরণের পাপ কার্যে জড়িত না হওয়া মানব জীবনে মহা সাধনার বিষয়। এভাবে কলুষমুক্ত জীবন গড়তে হলে এবং সর্ব প্রকার পাপ ও পাপাচার হতে বিরত থাকতে হলে সৎ লোকের সঙ্গ এবং একজন নিষ্ঠাবান সদ্গুরু বা চেতন গুরুর ভক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গ লাভ করতে হবে। কুসঙ্গ বর্জন পূর্বক কলুষমুক্ত পরিবেশে থাকতে হবে। আজীবন অনাচার, অত্যাচার, পাপাচার ও ইন্দ্রিয়াদির সকল আসক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। সংগ্রাম করতে হবে নিজ আত্মার জীবত্ববোধের বিরুদ্ধে। সংগ্রাম করতে হবে নিজের শুদ্ধ আত্মিক আচরণ দিয়ে সকল অনৈতিক অনাচারের বিরুদ্ধে। বিবেককে কাজে লাগিয়ে চেতন গুরু প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা, মনের কুমতিকে বর্জন পূর্বক মন-মাঝিকে জয় করার সংগ্রাম করতে হবে। সংগ্রাম করতে হবে অনিত্য সংসারের অস্থায়ী মায়া প্রেম সাধ বর্জন পূর্বক আধ্যাত্মিক জগতের নিত্য ও চিরস্থায়ী স্রষ্টা-প্রেমের নিস্কাম প্রেমে মগ্ন থাকার জন্য। যুগ যুগান্তরের সকল নবী, রাসূল, মহামানব, পীর-পয়গম্বর, মোর্শেদ, মুণি-ঋষি ও অধ্যাত্ম জগতের সকল মহামানবের সর্ববাদী সম্মত সত্য মানবতাবাদকে নিজের মন ও মননে, জীবন ও জীবনাচরণে এবং কর্ম ও কর্মাচরণে সঠিক প্রতিফলন ঘটাতে হবে। আদিকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত স্রষ্টা প্রেমিকগণ আত্মচরিত্র গঠনের জন্য সৎগুরু সঙ্গ করে আত্মতত্ত্ব জেনে তত্ত্ববিদ হয়ে **সাঁঈ বা প্রভূর নিগুঢ় লীলা** দেখার চেষ্টা করে আসছেন। রমিজ নীতির দশ নং বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে এতক্ষণ পরিষ্কারভাবে জানা গেল যে, নিস্কলুষ চরিত্র গঠনের জন্য সারা জীবন ব্যাপি অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার, অসৎ কর্ম ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।

উক্ত সংগ্রামে জয়ী হলে আত্মবোধ সৃষ্টি হবে, আধ্যাত্মিক দর্শন খুলে যাবে, খুলে যাবে অন্তর্চক্ষু, জানা যাবে স্রষ্টা বা সাঁঈর নিগুঢ় রহস্য ও নিগুঢ় তত্ত্ব। চরিত্র হয়ে যাবে নিস্কলুষ।

আর তা হলেই পরমাত্মার পরমত্ব অর্জন করতঃ বিশ্ব প্রকৃতি ও বিশ্ব স্রষ্টার জাতের সাথে বিলীন বা লয় হওয়া যাবে।

** আরো উলে-খ্য যে, পরমত্ববোধের কিঞ্চিত মাত্র বাকী থাকলেও চরিত্র নিস্কলুষ হবেনা এবং স্রষ্টাতে বিলীন হওয়া সম্ভব হবেনা। কেবল সর্বদা, সর্বস্থানে, সর্ব প্রকার পাপ বর্জন করলেই আত্মা কলুষমুক্ত হওয়া সম্ভব এবং স্রষ্টাতে বিলীন হয়ে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ পাওয়া সম্ভব।

তাই সূফি রমিজ তার সিদ্ধবাক্যে বলেন- ***"তোমার মধ্যে যত ভেজাল করিলে বর্জন***
স্রষ্টার অনুগ্রহ তুমি পাইবে তখন"। উপদেশ-৮ (স্বর্গের সুধা)

এখানে, মহাগুরু রমিজ তাঁর ভক্তবৃন্দকে স্রষ্টার অনুগ্রহ এবং কৃপা লাভ করার জন্য ভক্তের দেহ, মন, হৃদয়, আত্মার যত পাপ আছে সব বর্জন করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন।

তিনি তাঁর ভাষায় আরেক বাণীতে বলেছেন- ***"রমিজ বলে গুরুর কাছে, জানাও যত দোষ আছে***
নইলে কিন্তু পরবি পেঁচে, সমনে করবে বন্ধন"। বাণী-৫৫ (স্বর্গে আরোহণ)

উক্ত বাণীতে গুরু রমিজ তাঁর ভক্তদের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্য করণীয় বিধানের আদেশ দিয়েছেন। রমিজ তাঁর ভক্তগনকে প্রত্যেকে জীবনে যত পাপ করেছেন সকল পাপ গুরুর কাছে অকুণ্ঠ চিত্তে প্রকাশ করার আহ্বান করছেন।

উলে-খ্য যে, পাপ লাঘবের জন্য নিজের জানা মতে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যত পাপ করা হয়েছে তা সদ্গুরুর নিকট প্রকাশ করাই হচ্ছে গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করা। আর তা হলেই গুরু তাঁর বিধান মতে ভক্তদের উক্ত পাপাচার হতে মুক্তি পাবার সৎকর্ম করাবেন এবং সৎ কর্মের মাধ্যমে তাঁর ভক্ত পাপমুক্ত হবেন। একই সাথে উক্ত ছন্দে হুসিয়ার করতঃ বলা হয়েছে যে, কৃত পাপসহ আত্মসমর্পণ না করলে বিধানের ধারায় সমস্যায় বন্দী হয়ে যাবে এবং অসৎ কর্মের জন্য তার ফল ভোগ করতে হবে।

ভক্তকে নিস্কলুষ চরিত্র গঠনের জন্য মহাগুরু রমিজ যুগোপযোগী ও যুগান্তকারী, এক চৈতন্যময় সাড়া জাগানো বাণী রচনা করেছেন। উক্ত বাণীতে তাঁর ভাষায় তিনি ডাক দিয়েছেন যে,

"জাগরে এবার মেলরে আঁখি
বলেরে হুংকারে কর্ণকুহরে দিন নাই বাকী"।

- ১। আর কত চাও ঘুমাইতে, চল চেতনার দেশেতে
  জাগো সত্যের সন্ধান নিতে পিঞ্জিরার পাখি।
- ২। বিজয়ী হও তুমি আত্মশাসনে, দূর কর ভেজাল মহাজ্ঞানে
  জ্ঞানের সেবক হও ভূবনে, ছেড়ে দেও ফাঁকি।

- ৩। রমিজ বলে হও সাবধান, ষড়রিপু কর বলিদান
  জীবনে একবার কোরবান সেই কর্ম সাক্ষী। -বাণী-৫৯ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

এই বাণী মহাগুর রমিজের সাড়া জাগানো, চৈতন্যময় সিদ্ধবাক্য। এ বাণী রমিজের মতবাদ ও বিধানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করছে।

নিস্কলুষ চরিত্র এবং নিষ্ঠাবান হতে একজন মানুষের যে কর্তব্য রয়েছে তার সকল দিকই এতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। রমিজ নীতির দশ নম্বর বৈশিষ্ট্যের সবগুলো উপকরণ এ বাণীতে বিদ্যমান আছে।

মানুষ সাধারণতঃ চেতনাবিহীন অবস্থায় থাকে। স্বাভাবিক জীবন যা প্রয়োজন তাই করে থাকে। তাঁর বাহিরে অধ্যাত্ম বিষয়ে খুব একটা চিন্তা-ভাবনা কেউ করেনা এবং করতে চায়না। অধিকাংশ লোকই সাধারণ জীবন নিয়ে ব্যস্ত। স্রষ্টা ও সৃষ্টি বিষয়ে মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় আছে। ঘুমন্ত সন্তানকে যেমন তাঁর মা সকাল বেলা ডাক দিয়ে জাগায় তেমনিভাবে গুর রমিজ তাঁর সকল ভক্তকে জাগরণের জন্য ডাক দিয়েছেন। তবে, এ ডাক পার্থিব জগতের ঘুম হতে জাগার ডাক নয়। এ ডাক হচ্ছে আত্মচেতনার ডাক। এ ডাক হচ্ছে, অবচেতন দেহ মন-হৃদয়-আত্মাকে চেতনার ডাক, আরো হচ্ছে লুপ্ত জ্ঞানকে জাগানোর ডাক।

রমিজ তাঁর ছন্দে ও ভাষায় বলেন ***"জাগরে এবার মেলরে আঁখি"***। অবলুপ্ত জ্ঞান ও জ্ঞানের চক্ষু বা অন্তর্চক্ষুকে চেতনগুর (সদ্‌গুর) প্রদত্ত চেতনার (মহাজ্ঞান) মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি অর্জন করার ডাক দিয়েছেন মহাগুর রূপী রমিজ। রমিজ তাঁর ছন্দে আরো বলেন ***"বলেরে হুংকারে কর্ণ কুহরে দিন নাই বাকী"***। এখানে রমিজ আত্মতত্ত্বের ও গুরুতত্ত্বের তত্ত্ববাণী এমনভাবে ভক্তদের হৃদয়-মনে-কর্ণে পৌঁছিয়েছেন যেন এ বাণীর সুর বা ধ্বনী দেহধারী হৃদয়-মন-কর্ণকে ছাড়িয়ে অতীন্দ্রিয় দেহ-মন-কর্ণ ও হৃদয়ে বিধৃত হয়েছে। এই ধ্বনী বা ডাক এমনভাবে দেয়া হয়েছে যেন ইহা ভক্তদের কর্ণমূল ভেদ করে হৃদয় অন্তরে পৌঁছে যায়।

অতঃপর তিনি ভক্তবৃন্দকে চেতনার দেশে চলে আসার জন্য আহ্বান করছেন। তাঁর মতে, *চেতনার দেশ বলতে যে পরিবেশে গমন করলে আত্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টি বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করা যায় উহাকেই বুঝায়*। যেখানে গেলে সত্যের সন্ধান মিলবে অর্থাৎ চেতন গুর বা সদ্‌গুরুর সান্নিধ্য পাবে। উলে- খ্য যে, গুরুই অধ্যাত্ম বিষয়ক পরমতত্ত্ব।

উক্ত বাণীতে মানুষকে পিঞ্জিরার পাখি রূপে অ্যাখ্যায়িত করা হয়েছে। পাখি যখন পিঞ্জিরায় আবদ্ধ থাকে, পিঞ্জিরার খাচায় আবদ্ধ থাকা অবস্থায় তার মুক্তি নাই। মানব আত্মাও তদ্রূপ মানবদেহ ধারণ করে তার ভিতর আবদ্ধ অবস্থায় আছে। মানবাত্মা রূপ পাখি ষড়রিপু, বিভিন্ন প্রকার পাপ ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বেষ্টিত হয়ে আছে। তাই, রমিজ ভক্তদেরকে গুরুসঙ্গ করতঃ মহাজ্ঞান অর্জন করে, আত্মশাসনে সকল ভেজাল (সর্বপাপ) দূর করে, সর্বপাপ হতে মুক্তি লাভ করতঃ নিজকে নিজে চিনে আত্মার বিজয় (চৌরাশি লক্ষ যোনী হতে মুক্তি লাভ) লাভ করা বা বিজয়ী হওয়ার ডাক দিয়েছেন এবং আদেশ করেছেন।

মহাজ্ঞানই স্রষ্টা। স্রষ্টার সেবা করা আর জ্ঞানের সেবক হওয়া একই কথা। আর জ্ঞানের সেবক হয়ে জ্ঞানী হলে ফাঁকি, প্রবঞ্চনা ও আত্মপ্রবঞ্চনা কিছুই করা সম্ভব নয়।

সর্বশেষে সাধক রমিজ তাঁর ভক্তদেরকে ষড়রিপু বলিদানের আদেশ দিয়েছেন। ষড়রিপু বলিদান মানে দেহ মন থেকে ষড়রিপু ত্যাগ বা বিসর্জন করা। ***নিজ দেহ মন থেকে সম্পূর্ণরূপে সারা জীবনের জন্য উহাদিগকে সমূলে ত্যাগ করাই হলো কোরবান। পশু***

কোরবান করার মারফত ও আধ্যাত্মিক অর্থ হচ্ছে নিজের মধ্যে আশ্রিত সকল প্রকার পাশবিক সত্তা সমূহকে আজীবনের জন্য বর্জন করা বা বিসর্জন দেয়া।

স্রষ্টার কাছে হৃদয়, মন, জ্ঞান, বিবেক, ইন্দ্রিয় এবং অতীন্দ্রিয় সকলই এ জাতীয় কোরবানের সাক্ষী হয়ে থাকবে। এ কোরবানের পরই মানবের চরিত্র হয়ে যায় নিস্কলুষ। আর এ নিস্কলুষ চরিত্র গঠনের কথাই রমিজ নীতির দশ নম্বর বৈশিষ্ট্যে উলে- খিত হয়েছে।

নিরামিষভোজন

'নিরামিষভোজন' হচ্ছে ফল-ফলাদি, শাক্সব্জী, খাদ্যশস্য, বাদাম এবং বীজ ইত্যাদির সমন্বয়ে একটি উদ্ভিদ ভিত্তিক খাদ্যাভ্যাস। নিরামিষভোজীগণ যে কোন প্রকারের মাংস, পোল্ট্রি, মাছ, চিংড়ী, কাঁকড়া অর্থাৎ কব্চী জীব, ঝিনুক এবং পশুজাত যে কোন খাবার খায়না। তবে বিশ্বব্যাপী নিরামিষভোজীদের অধিকাংশই দুধ এবং দুগ্ধজাত খাবার খেয়ে থাকে। নানা প্রকারের নিরামিষ ভিত্তিক খাদ্য প্রণালী রয়েছে। নৈতিক, স্বাস্থ্যগত, পরিবেশগত, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, র"চিবোধ, অর্থনৈতিক অথবা অন্যান্য কারণে খাদ্যাভ্যাস হিসাবে নিরামিষভোজন মানুষের দ্বারা গৃহীত হয়।

নিরামিষ ভোজনের সাথে অধ্যাত্মবাদের একটি অনন্য সম্পর্ক রয়েছে বিধায় মহাশক্তি রমিজ তাঁর বিধানে নিরামিষ ভোজন একটি অন্যতম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর অনুসারীগণ সকলেই নিরামিষভোজী।

সমগ্র পৃথিবীর নিরামিষভোজীদের প্রকারভেদ

নিরামিষভোজনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি আগেই বলা হয়েছে তদুপরি গৃহীত খাদ্যের ধরণের উপর ভিত্তি করে সমগ্র পৃথিবী নিরামিষভোজীদেরকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

- ***Lacto-ovo vegetarianism:*** *এই দলের নিরামিষভোজীগণ দুধ ও ডিম খায়; কিন্তু মাছ-মাংস খায়না।*
- ***Lacto vegetarianism:*** *এই প্রকারের নিরামিষভোজীগণ দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য খেয়ে থাকে কিন্তু ডিম খায়না।*
- ***Ovo-vegetarianism:*** *কিছু সংখ্যক নিরামিষভোজী ডিম খায় কিন্তু দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য খায়না। এরা ovo-vegetarian.*
- ***Veganism:*** *আরেকটি দল হলো এটি, যারা সর্বপ্রকার প্রাণীজাত খাদ্য যেমন মাছ-মাংস, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য, ডিম, মধু ইত্যাদি কোনটাই খায়না। তারা vegan নামে পরিচিত।*
- ***Raw veganism:*** *এই দলের অন্তর্ভূক্তগণ কেবলমাত্র কাঁচা এবং রান্না করা হয়নি এমন ফল ফলাদি,*

বাদাম, বীজ এবং শাক্ সব্জি খায়।

- ***Fruitarianism***: *যারা কেবলমাত্র ফল, বাদাম, বীজ এবং উদ্ভিদের এমন সব অংশকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে যা সংগ্রহে উদ্ভিদের জীবন বা প্রাণ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। উদ্ভিদের জীবন বা প্রাণ সংক্রান্ত মহাগুরু রমিজের একটি অতুলীয় ও চমকপ্রদ আধ্যাত্মিক মতাদর্শ রয়েছে যা পরবর্তীতে আলোচিত হয়েছে।*

- ***Su Vegetarianism***: *এ দলের লোকগণ (যেমন- বৌদ্ধধর্মে) সকল প্রাণীজাত খাবার, এমনকি নির্দিষ্ট কিছু শাক্ সব্জি, যেমন- পেঁয়াজ, রসুন, পেঁয়াজ জাতীয় উদ্ভিদ ইত্যাদি খায় না।*

এগুলো ছাড়াও এমন অনেক কড়া নিরামিষভোজী রয়েছেন যারা পশুজাত উপাদান ব্যবহারের দ্বারা প্রস্তুতকৃত খাদ্য দ্রব্য বা পানীয় গ্রহণ করেন না। এরকম কিছু খাদ্যের উদাহরণ হলো- পশুর পাকস্থলী হতে নিঃসৃত এন্জাইম ব্যবহারের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত মাখন, পশুর চামড়া ও হাড় দ্বারা তৈরী সিরিশ, পশুর হাড় হতে উৎপন্ন বস্তু দ্বারা সাদা করানো চিনি (যেমন-আঁখের চিনি, কিন্তু বীটের চিনি নয়) এবং চূর্নকৃত ঝিনুক ও স্টার্জন মাছ দ্বারা পরিশোধিত অ্যালকোহল।

এখানে উলে- খ্য যে, অ্যালকোহল বা মদ্য পান করা বা যে কোন প্রকারের চিত্তবিকৃতকারী মাদক বা পানীয় গ্রহণ মহাগুরু রমিজ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছেন।

Semi-vegetarian বা অর্ধনিরামিষাশী: এই দলের অন্তর্গত ব্যক্তিরা তাদের খাদ্যে পোল্ট্রি, ডিম এবং দুগ্ধজাত খাদ্যের সাথে মাছকেও যুক্ত করে নেয় কিন্তু মাংশকে নয়। তবে সাধারণভাবে এরকম মৎস্য বা পোল্ট্রি ভিত্তিক খাদ্যকে নিরামিষ ধরা হয়না এই যুক্তিতে যে, মাছ এবং পাখিরা জীব এবং এই নীতিবোধ থেকেই নিরামিষভোজীরা 'অর্ধনিরামিষভোজী' শব্দটি নিয়ে বিতর্ক করে থাকেন।

মহাগুরু রমিজ প্রবর্তিত বিধানের অনুসারীগণ মূলত ল্যাক্টো ভেজিট্যারিয়ান (Lacto vegetarian)। মহাশক্তি রমিজ মধুপান করাও নিষেধ করেছেন, যেহেতু মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করতে গেলে মৌমাছিদের আবাসন ধ্বংস করতে হয়, যা কিনা জীবের প্রতি নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক।

শব্দতত্ত্ব

১৮৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'দ্যা ভেজিটারিয়ান সোসাইটি' (The vegetarian society) দাবী করেছেন যে, তারা ল্যাটিন শব্দ 'vegetns' (ভেজিটাস্) যার আভিধানিক অর্থ হলো 'জীবন্ত' বা `Lively' (তৎকালীন নিরামিষভোজীরা দাবী করতেন যে, তাদের খাদ্যাভ্যাস তাদেরকে এমন অনুভূতি প্রদান করতো) এই শব্দ থেকে 'Vegetarian' (ভেজিটারিয়ান) শব্দটি আবিষ্কার করেছেন। যাই হোক, 'দ্যা অক্সফোর্ড ইংলিশ ড্রিকশনারী (The Oxford English Dictionary) ও অন্যান্য আদর্শ অভিদান সমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, মূলতঃ শব্দটি তৈরী হয়েছে শব্দ 'Vegetable' (ভেজিটেবল) এবং 'arian' (য়ারিয়ান) প্রত্যয় যোগে। তদুপরি এই অভিধান এমন প্রমাণও উপস্থাপন করেছেন যাতে দেখা যায় যে, 'The vegetarian Society' গঠিত হওয়ার পূর্বেই বিভিন্ন রচনা ও গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে যে, ১৮৪৭ সালে ইংল্যান্ডের রামস্গেট্ (Ramsgate) শহরে 'The vegetarian Society' গঠিত হওয়ার পরই এই শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়।

ইতিহাস

একটি মতাদর্শ এবং খাদ্যাভ্যাস হিসাবে নিরামিষ ভোজনের ইতিহাস পরিলক্ষিত হয় প্রাচীন ভারত বর্ষের বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে। খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে দক্ষিণ ইতালির গ্রীক্ সভ্যতা এবং গ্রীসেও নিরামিষভোজন চর্চিত হয়েছিলো। উভয় অঞ্চলেই উক্ত খাদ্যাভ্যাসটি জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনের একটি নৈতিক দায়িত্বের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলো (ভারতে 'অহিংসা' নামে পরিচিত) এবং ইহা বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং দার্শনিকদের দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিলো।

নিকট বা অদূর প্রাচীনকালে রোমান সাম্রাজ্য খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করানোর কারণে ইউরোপ হতে নিরামিষ ভোজন কার্যতঃ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো। মধ্য ইউরোপে প্রভূত ধর্মীয় যাজক সম্প্রদায়ের মঠ কর্তৃক (কঠোর সংযম সাধনের নিমিত্ত) প্রাণীর মাংস ভক্ষন সীমাবদ্ধ অথবা নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো। তবে তাদের মধ্যে কেউই মাছ খাওয়া পরিত্যাগ করেননি। তৎকালীন প্যারিস নগরীর সিদ্ধ পুরুষ সেইন্ট জেনেভিয়েভে Saint Genevieve) 422 খ্রিঃ- 512 খ্রিঃ নিরামিষভোজী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন যদিও তা ছিলো মূলতঃ দৈহিক তপশ্চর্যার জন্যে; জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনের নীতি হিসাবে নয়।

নিরামিষ ভোজন ইউরোপে পুনরায় দৃষ্টিগোচর হয়েছিলো রেনেসার সময়ে। উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে ইহা একটি সুদূর প্রসারী ধারণায় পরিণত হয়েছিলো।

১৮৪৭ সালে ইংল্যান্ডে সর্ব প্রথম "Vegetarian society" গঠিত হয়েছিলো, অতঃপর জার্মানী, নেদারল্যান্ড এবং অন্যান্য দেশে। ১৯০৮ সালে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সমূহের একটি জোট হিসাবে "the International vegetarian union" আত্ম প্রকাশ করে। বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে বিভিন্ন কারণে নিরামিষভোজী জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, যথা পুষ্টিগত, নীতিগত এবং অতি সম্প্রতি পরিবেশগত এবং অর্থনৈতিক বিবেচনায়।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগত উপকারী দিক সমূহ

নিরামিষভোজন একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্য প্রণালী হিসেবে বহুল সমাদৃত। যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানাডার কতিপয় খাদ্য বিশেষজ্ঞ এই আবিষ্কার করেছেন যে, একটি সুপরিকল্পিত নিরামিষ ভিত্তিক খাদ্য প্রণালী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সকল পুষ্টিগত চাহিদা মিটাতে সক্ষম। শাক্-সব্জি, শস্যদানা, বাদাম, সয়ামিল্ক এবং দুগ্ধজাত খাদ্যে দেহের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকারক উপাদান, প্রোটিন, অ্যামাইনো এসিড ইত্যাদি পাওয়া যায়।

নিরামিষ ভিত্তিক খাদ্য দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে এবং প্রায় সম্পূর্ণরূপে হৃদরোগ ও হাড়ের কতিপয় রোগ (যেমন– Osteoporoses)এর ঝুঁকি কমায়। অন্যদিকে, বিশেষ করে চর্বিযুক্ত, লাল মাংস, কণ্ঠনালী, যকৃৎ, কোলন এবং ফুসফুসের উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন ক্যান্সারের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

'The American Dietetic Association' (১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত) এবং Dietetinas of Canda যুক্তভাবে বিবৃত করেছেন যে, "নিরামিষ ভিত্তিক খাদ্য প্রণালী পুষ্টিগত নানা সুবিধাদি প্রদান করে থাকে, যেমন- নিম্ন মাত্রার স্নেহদ্রব্য ও কোলেষ্টেরল এবং উচ্চ মাত্রার কার্বোহাইড্রেট, শ্বেতসার, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম এবং বিভিন্ন ধরণের এন্টি অক্সিডেন্ট যথা- ভিটামিন 'সি' এবং 'ই'। প্রতীয়মান হয় যে, স্বল্প সংখ্যক ক্ষেত্রে নিরামিষভোজীরা উচ্চ্ রক্তচাপ, হৃদরোগ, হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, মূত্রাশয়ের রোগ, হাড়ের রোগ, চিত্তভ্রংশ যেমন- আল্‌ঝেইমার এবং অন্যান্য শারীরিক গোলযোগের সম্মুখীন হয়।

নিরামিষ খাদ্যে অন্তর্নিহীত প্রোটিনের পরিমাণ মাংসের তুলনায় খুব যে কম হয় তা নয়, বরং তা একজন মানুষের প্রাত্যহিক চাহিদা পূরণ করতে পুরোপুরি সক্ষম হয়ে থাকে। 'হারভার্ড ইউনিভার্সিটি'সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশ যেমন- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও অন্যান্য ইউরোপিয়ান দেশে পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায় যে, একটি সুপরিকল্পিত নিরামিষ খাদ্য ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন থাকে। প্রোটিনগুলো তৈরী হয় অ্যামাইনো এসিড দ্বারা। এসব অ্যামাইনো এসিড

মানবদেহে স্বততঃ সংশে- ষিত হয় না। কিন্তু নিরামিষে এগুলো যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। উদ্ভিদ উৎস হতে প্রাপ্ত খাদ্যে ৮ প্রকারের সকল অ্যামাইনো এসিড পাওয়া যায়। যেমন- বাদামী চাল, সীম, গম, মাশর ম ইত্যাদি হতে।

আয়রন মানবদেহের জন্য একটি গুর ত্বপূর্ণ উপাদান। যে সকল নিরামিষ খাদ্যে আয়রন আছে সেগুলো হলো- কাজু বাদাম, কালো সীম, বরবটি (Kidney Beans), মশুড়, জইচূর্ণ, কিশমিশ, মটর, সয়াবিন, খাদ্যশস্য, সূর্য্য মুখীর বীজ, মটর কলাই, টমেটোর জ্যুস, গুড়, গমের তৈরী র টি।

দুধ এবং দুগ্ধজাত খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন বি-১২ পাওয়া যায়।

আখরোট ফল, কুমড়ার বীচি, শনগাছের বীজ, বিভিন্ন প্রকার শৈবালে মানদেহের জন্য প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায়।

নিরামিষ এবং অনিরামিষ উভয় ধরণের খাবারে সমপরিমাণে ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। সবুজ শাক-সব্জি, ফুলকপি, বাধাঁকপি, বীটগাছের পাতা, সয়াবিন ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে।

নিরামিষভোজীদের মধ্যে ভিটামিন-ডি এর স্বল্পতা দেখা যায় না। দুধ, দুগ্ধজাত খাদ্য, মাশর ম, সয়ামিল্ক এবং খদ্য শস্যকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভিটামিন-ডি এর ভালো উৎসে পরিণত করা যেতে পারে।

দীর্ঘ জীবন লাভ

১৯৯৯ সালে পশ্চিমা দেশগুলোর ৫টি গবেষণালব্দ ফলাফলকে সমন্বয় করা হয়েছিলো। বৃহৎ মাত্রায় পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, *হৃদরোগে মৃত্যুবরণের প্রবনতা অনিরামিষভোজীদের তুলনায় নিরামিষভোজীদের ক্ষেত্রে ২৪% কম হয়ে থাকে*। ইংল্যান্ডে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায় যে, সেখানে নিরামিষভোজীদের মৃত্যুহার অনিরামিষভোজীদের চেয়ে কম হয়ে থাকে। 'The adventist health study' (১৯৬০ সাল) এর গবেষণায় দেখা গেছে যে, একটি নিরামিষ ভিত্তিক খাদ্যাভ্যাস একজন মানুষের জীবন ১ হতে ২ বছর পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়।

খাদ্য নিরাপত্তা

USA today-তে একটি রচনায় Libby Sande বলেছেন যে, নিরামিষভোজন E. Coli সংক্রমনের প্রাদূর্ভাব কমিয়ে দেয়। E. Coli সংক্রমিত হয় মূলতঃ অস্বাস্থ্যকর খাদ্য প্রস্তুতি এবং কলুষিত গো-খামার হতে। মাংস উৎপাদনকারী গর হচ্ছে ইহার প্রাথমিক আধার এবং তাদের মলমূত্রের মাধ্যমে ইহা পরিবেশে ছড়িয়ে যেতে পারে। এছাড়াও ২টি আতংকজনক রোগ হলো ম্যাডকাউ রোগ (Mad cow Disease) এবং গর ও মোষের অ্যানথ্রাক্স (Anthrax) রোগ। ২০০৫ সালে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, মুরগীর মাংস খেলে বার্ডফ্লু (Bird flu) রোগ হতে পারে।

চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যবহার

পশ্চিমা দেশ সমূহে অনেক সময়ে রোগীদেরকে মাছ মাংসের পরিবর্তে নিরামিষ খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। বাতরোগের চিকিৎসা হিসেবে নিরামিষ খাওয়ার বহুল প্রচলন রয়েছে। আয়ূর্বেদীক চিকিৎসায় সাধারণভাবেই নিরামিষ খেতে উৎসাহিত করা হয়।

শরীরবৃত্ত

'The Vegetarian Resource Group'** এই মত প্রকাশ করেছে যে, মাংস এবং শাক্সব্জী হজম করার সামর্থ্যের ভিত্তিতে মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে সর্বভূক বলা যায়। কিন্তু অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে মনে হয় যে, মানুষ তৃনভোজী জীব, কারণ তাদের আছে দীর্ঘ অন্ত্রীয় দেহযন্ত্র ও ভোঁতা দন্তরাজি।* যা কি-না সর্বভোজী ও মাংসভোজীদের হতে বিসদৃশ। ***পুষ্টিবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, আদিম 'হোমিনিড' (Hominids) মানুষ এবং বানরের মাঝামাঝি গড়নের জীব, যারা বিবর্তনের ধারায় বিলুপ্ত হয়েছে এবং তারা মানবজাতির আদি গোষ্ঠী বা ৩০ হতে ৪০ লক্ষ বছর পূর্বে সংঘটিত ব্যাপক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে মাংসভোজী প্রাণীতে বিবর্তিত হয়েছিলো; তখন বন জঙ্গল উজাড় হয়ে খোলা প্রান্তরে পরিণত হয়েছিলো এবং শিকার করে পশু মাংস খাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিলো।

পশু হতে মানবদেহে রোগ সংক্রমন

মাংস ভক্ষন পশু হতে নানা প্রকারের রোগব্যাধি মানবদেহে পরিবহনের একটি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আক্রান্ত পশু এবং মানুষের মধ্যে রোগ সংযোগের একটি অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে 'Salmonella' ('সালমোনেলা' টাইফয়েড রোগের জীবাণু)। যুক্তরাষ্ট্র বাজার সরবরাহকৃত মুরগীর মাংসের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ হতে অর্ধেক এই রোগের জীবাণু দ্বারা কলুষিত। যাই হোক, অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা সন্দেহ করা শুরু করেছেন যে, একই রকম ভাবে পশুর মাংসের সাথে সংযোগ রয়েছে আরো অনেক মানবীয় রোগ, যথাণ্ড ক্যান্সার, জন্মবিকলতা বা ত্রুটি, জীনে ত্রুটি-বিচ্যুতি ইত্যাদি। ১৯৭৫ সালের যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত এক গবেষণায় সুপার মার্কেটে প্রাপ্ত ৭৫% গরুরগুদুধের নমুনায় এবং ৭৫% ডিমের নমুনায় 'লিউকেমিয়া' (Leukeima-ক্যান্সার)-এর ভাইরাস পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৮৫ সালের মধ্যে প্রায় ১০০% পরীক্ষিত ডিম অথবা ডিম উৎপাদনকারী মুরগীর মধ্যে ক্যান্সার ভাইরাসের অস্তিত্ব দেখা গিয়েছিলো। মুরগীর মধ্যে এই রোগের হার এতই বেশী ছিলো যে শ্রম অধিদপ্তর পোল্ট্রি ইন্ডাষ্ট্রিকে সবচেয়ে বিপদ সংকুল পেশা হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছিল। ২০% গরু 'BLV' (Bovine Leukemia Virus) নামক এক প্রকার ক্যান্সারে পীড়িত ছিলো। অত্যন্ত উদ্বেগজনক ব্যাপার হলো এই 'BLV' ভাইরাস মানুষের দেহে ক্যান্সার উৎপাদনকারী ভাইরাসের সহিত সম্পর্কযুক্ত। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে 'BIV' (Bovine Immunodeficiency Virus), যা গরুর জন্য AIDS ভাইরাসের সমতুল্য, তা মানবকোষকেও আক্রান্ত করতে পারে। মনে করা হয় যে, BIV মানবদেহে কিছু সাংঘাতিক ধরণের ভাইরাসের প্রাদূর্ভাব বর্ধনে ভূমিকা পালন করে।

শিল্প ক্ষেত্রে পশু চাষাবাদে পশুর নৈকট্য মানবদেহে রোগ পরিবহনের হার বৃদ্ধির একটি অন্যতম কার্যকারন। মানবদেহে পশুবাহিত ইনফ্লুয়েঞ্জার ঘটনা দলিলপত্র দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। ১৯৫৯ এবং ১৯৯৮ সালে ১৮ জন H5N1 ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস (বার্ড ফ্লু নামে অধিক পরিচিত) এ আক্রান্ত হয় যাদের মধ্যে ৬জন মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৯৭ সালে হংকং এ প্রচূর পরিমাণে মুরগী 'বার্ড ফ্লু' তে আক্রান্ত হয়।

'Hunter Theory' অনুযায়ী প্রাণঘাতি ব্যাধি 'AIDS' শিম্পাঞ্জি হতে মানবদেহে পরিবাহিত হয়েছিল।

ইতিহাসবিদ Norman Cantor (জন্ম 19/11/1929, মৃত্যু 18/9/2004) বলেছেন যে, মহামারী রোগ 'Black Death' (কৃষ্ণমৃত্যু) মূলতঃ গো-বাছুরের মড়ক 'অ্যানথ্রাক্স' (Anthrax) সহ কয়েকটি প্রাণঘাতি রোগের সমন্বয়ী রূপমাত্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি উলে- খ করেন যে, ব্রিটেনের গ্রামাঞ্চলে পে- গ রোগের প্রাদূর্ভাব শুর" হওয়ার পূর্বে বহু রোগাক্রান্ত বাছুরের মাংস বিক্রি করা হয়েছিলো।

শৈশবে বুদ্ধিমত্তার বিকাশে খাদ্য নির্বাচন

২০০৭ সালে 'ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল' (British medical journal) এ শিশুদের বুদ্ধিমত্তা বিকাশের উপর একটি গবেষণালব্দ রচনা প্রকাশিত হয়। বিবিসি (BBC) উক্ত গবেষণার ফলাফলের সারাংশ প্রকাশিত করে এই বলে সমাপ্তি টানে যে *"শৈশবে বুদ্ধিমত্তার উচ্চমান হওয়া সংশি- ষ্ট শিশুর প্রাপ্ত বয়সে বা পরিণত বয়সে নিরামিষভোজী হওয়ার ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনার সাথে জড়িত"*।

নীতিবিজ্ঞান বা নীতিশাস্ত্র

বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় পশু মাংস ভক্ষনের নৈতিকতা নিয়ে বাদানুবাদ ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। খাদ্যের জন্য পশু হত্যার অনুশীলনের বির"দ্ধে বিভিন্ন নৈতিক কারণের মধ্যে রয়েছে পশু অধিকার, পরিবেশগত নীতি অথবা ধর্মীয় বাঁধা। ***অধিকাংশ নৈতিক নিরামিষভোজীরা মত প্রকাশ করেন যে, খাদ্যের জন্য নরহত্যার বির"দ্ধে যে কারণ রয়েছে ঠিক একই কারণ রয়েছে খাদ্যের জন্য পশু হত্যার বির"দ্ধে।*** তারা এটাও বিশ্বাস করেন যে, পশুহত্যা করা একমাত্র চরম পরিস্থিতিতেই ন্যায়সংগত বলে বিবেচ্য হওয়া উচিৎ (যেমনটা মানব হত্যার ক্ষেত্রে হয়), কিন্তু খাদ্য হিসাবে সুস্বাদু হওয়া, সহজলভ্যতা কিংবা পুষ্টিগতভাবে উন্নত মান হওয়া কোন পর্যাপ্ত যুক্তি হতে পারে না। তাছাড়া মানুষের পক্ষে পশু হত্যা করা সঠিক নয়, যেহেতু মানুষ তাদের আচরণ বা স্বভাবের দিক থেকে নৈতিকভাবে অনেক বেশী সচেতন, অন্যান্য প্রাণীরা যা নহে। কেবলমাত্র আনন্দ উপভোগের জন্য নিষ্ঠুরভাবে পশুকে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু প্রদান করা কোন নৈতিক দায়িত্বশীলতার পরিচায়ক হতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিক ও প্রবন্ধকার Matthew Scully বলেছেন- "যদি যুক্তিগ্রাহীতা ও নৈতিকতার স্বভাব মানুষকে পশু হতে পৃথক করে, তবে সেই যুক্তিগ্রাহীতা এবং নৈতিকতাই মানুষকে পশুর প্রতি কেমন আচরণ করতে হবে সেই লক্ষ্যে পরিচালিত করবে"।

ধর্ম

হিন্দু এবং জৈনধর্মে নিরামিষভোজনকে একটি নৈতিক আচরণ হিসেবে গণ্য করা হয়। বৌদ্ধ ধর্মে সাধারণভাবে মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ নয়, তবে মহায়ানা বৌদ্ধরা নিরামিষ ভোজনকে জীব বা প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি বর্ধনের নিমিত্তে উপকারী বলে মনে করে থাকেন। অন্যান্য আধুনিক ধর্ম-সম্প্রদায়, যারা নিরামিষ ভিত্তিক খাদ্য প্রণালীর পক্ষে সমর্থন প্রদান করেন তারা হলো- 'Seventh Day Adventists', The Rastafari Movement' এবং The Hare Krishnas'।

হিন্দু ধর্ম: হিন্দু মতবাদের অধিকাংশ অনুসারীগণই নিরামিষভোজনকে একটি আদর্শ হিসেবে ধরে রেখেছে। এক্ষেত্রে ৩টি কারণ বিদ্যমান রয়েছে, যথা-

- জীবের প্রতি অহিংসা মতবাদের প্রয়োগ,
- দেবতা বা ঈশ্বরকে 'বিশুদ্ধ' (নিরামিষ) খাবার ভোগ হিসেবে প্রদান করা এবং প্রসাদ হিসাবে তা ফিরে পাওয়া, এবং

- অনিরামিষ জাতীয় খাবার হৃদয় ও আত্মার উন্নয়নের জন্য ক্ষতিকর' এই দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করা।

হিন্দু নিরামিষ ভোজীরা সাধারণতঃ ডিম এবং মাছ-মাংস খাওয়া বর্জন করে, কিন্তু দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য গ্রহণ করে; অতএব, তারা ল্যাক্টো-ভেজিটারিয়ান।

জৈন ধর্ম: জৈনধর্মের অনুসারীগণ বিশ্বাস করেন যে, জীবিত এবং নির্জীব সকল বস্তুরই বিভিন্ন পরিমাণে 'জীবন' (Life) রয়েছে এবং ইহাদের প্রতি ক্ষতি হ্রাস বা নিবারণের জন্য তারা সর্বান্তকরণে চেষ্টা করে থাকেন। অধিকাংশ জৈন ধর্মবাদীরা ল্যাক্টো-ভেজিটেরিয়ান, কিন্তু অধিক ধর্মনিষ্ঠ জৈনরা মূল জাতীয় শাক্‌সব্জি খায়না, কারণ এতে উদ্ভিদটির মৃত্যু হতে পারে। পরিবর্তে তারা সীম এবং ফলজ খাদ্যগ্রহণে মনোনিবেশ করেন, যার চাষাবাদে উদ্ভিদের মৃত্যু হয় না। মৃত জন্তু হতে সংগৃহীত সকল দ্রব্যও খাদ্যদ্রব্য তারা পরিহার করেন। আধ্যাত্মিকভাবে উচ্চস্তর প্রাপ্তির জন্য এ সমস্ত কার্য সাধনকে তারা অপরিহার্য বলে মনে করে থাকেন। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ধর্মপ্রাণ ব্যাক্তি কেবলমাত্র ফলফলাদি-ই খেয়ে থাকেন। মধুপান করা তাদের জন্য সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ; কারণ ইহা মৌমাছিদের প্রতি নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। কিছু সংখ্যক জৈনরা 'মূল' এবং পেঁয়াজ জাতীয় খাদ্য খায়না, কারণ এদেরকে মাটি থেকে উঠিয়ে আনতে গেলে অনেক ক্ষুদ্র প্রাণী মারা যেতে পারে।

বৌদ্ধ ধর্ম: বৌদ্ধধর্মে একটি প্রথা আছে, যদি বৌদ্ধ সন্যাসীরা তাদেরকে খাওয়ানোর নিমিত্তে কোন জীবিত পশুকে হত্যা করতে "দেখে, শুনে অথবা জানে" তবে অবশ্যই তাদেরকে তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে, নতুবা তাদের পাপ হবে। তবে ভিক্ষা হিসেবে প্রাপ্ত মাংস কিংবা বাণিজ্যিকভাবে ক্রয়কৃত মাংস এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত নহে। গৌতম বুদ্ধ (খ্রিঃপূঃ 563 - খ্রিঃপূঃ 483) মাংস ভক্ষনকে নিরুৎসাহিত করে কোন মন্তব্য করেননি; (ব্যতিক্রমী কিছু ক্ষেত্র ছাড়া, যেমন- মানুষ, হাতি, ঘোড়া, কুকুর, সাপ, সিংহ, বাঘ, ভাল-ুক এবং হায়নার মাংস)। তবে তিনি স্পষ্টতই নিরামিষভোজনকে তাঁর সন্যাসী আচরণ বিধিতে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দিতে অমত পোষন করেছেন। কিন্তু বৌদ্ধদের একটি দল মহায়ানা (মহায়ানা ও বেরাভাদা-দুটি বৌদ্ধীয় দল) বৌদ্ধদের মতে, *সংস্কৃত ভাষায় এমন কিছু উদ্ধৃতি রয়েছে যেখানে গৌতম বুদ্ধ তাঁর অনুসারীগণকে মাংস খাওয়াকে পরিত্যাগ করতে আদেশ করেছেন।* অধিকাংশ চায়নিজ বৌদ্ধরা মাংস ভক্ষন করেন না।

শিখ ধর্ম: শিখ ধর্মীয় মতবাদ নিরামিষভোজন অথবা মাংসভোজন কোনটার পক্ষেই বিশেষ কোন জোর আরোপ করেনা। বরং খাদ্য নির্বাচনের ব্যাপারটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিয়েছে। যাই হোক, দশম গুরু (22/12/1666 - 7/10/1708) গুরু গোবিন্দ সিং (1699 সালে প্রতিষ্ঠিত) অমৃতধারী শিখদেরকে ইসলামী পদ্ধতিতে জবাইকৃত পশুর মাংস খেতে নিষেধ করেছিলেন। তবে, এর পিছনে রাজনৈতিক কারণ ছিলো এবং তা হলো তৎকালীন নও-মুসলিম নেতৃত্ব হতে নিজেদেরকে পৃথক করা, কারণ মুসলিম জনগোষ্ঠী তখন ব্যাপকভাবে হালাল মাংস খাওয়ায় লেগেছিল।

'অমৃতধারী' শিখ (যেমন অখন্ড কীর্তনী, দমদমী টাক্‌শাল, নামধারী, রারিহানওয়ালে) রা তীব্রভাবে মাছমাংস ও ডিম খাওয়ার বিরুদ্ধে; তবে তারা দুধ, মাখন এবং পনির খায় ও অন্যদেরকে খেতে উৎসাহিত করে। শিখ জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত এরকম বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষণ করে- শিখ গুরুগণ খাবারের সামান্যতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে খাদ্য সম্পর্কিত তাদের ধর্মীয় অবস্থান পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। গুরু নানক বলেছিলেন, অতিরিক্ত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ লোভের পরিচায়ক। তাদের ধর্মগ্রন্থে উদ্ধৃত আছে যে, পশু জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া বোকামী ছাড়া কিছু নয়, যদিও সমস্ত জীবজগৎ পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত; একমাত্র মানব জীবনই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তবে শিখ লঙ্গর খানায় (যেখানে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করা হয়), তা মূলতঃ 'ল্যাক্টোওভেজিটারিয়ান' খাদ্য।

ইহুদী ধর্ম: ইহুদী ধর্মাবলম্বী মধ্যযুগীয় অনেক পন্ডিত (যেমন জোসেফ আলবো) নিরামিষ ভোজনকে একটি নৈতিক আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যা কেবলমাত্র জীবের মঙ্গলার্থেই নয়, বরং এজন্য যে, এহেন খাদ্যের জন্য 'প্রাণীবধ" তার সাথে জড়িত ব্যক্তির কুটিল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে জাগিয়ে তুলতে পারে। অতএব, এক্ষেত্রে

জীবের মঙ্গলের চেয়ে তাদের উদ্বেগের বেশী কারণ ছিলো মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাবের সম্ভাবনার শংকা। বস্তুতঃ র‍্যাবি (Rabbi- ইহুদী পুরোহিত) 1380 খ্রিঃ -1444 খ্রিঃ) জোসেফ অ্যালবো (নিরামিষ ভোজনের বিপক্ষাবলম্বী) মত প্রকাশ করেন যে, পশু বা জীবের হিতার্থে মাংস খাওয়া পরিত্যাগ করা কেবল ভ্রান্ত-ই নয়, অপ্রীতিকরও বটে।

নিরামিষ ভোজনের পক্ষাবলম্বী একজন আধুনিক ইহুদী পন্ডিত ছিলেন র‍্যাবি আব্রাহাম-আইজ্যাক কুক (1865 খ্রিঃ - 1935 খ্রিঃ)। র‍্যাবি কুক তাঁর রচনাবলীতে নিরামিষ ভোজনকে একটি আদর্শ হিসাবে পরিগণিত করেছেন। তিনি উলে- খ করেছেন যে, *আদি পিতা আদম পশুর মাংস খেতেন না।*

কিছু সংখ্যক কাব্বালিষ্ট (Kabbalist- ইহুদীদের অধ্যাত্মবাদী একটি মতাদর্শের অনুসারীগণ) বিশ্বাস করেন যে, কোনভাবেই মাছ মাংস খাওয়া মানুষের জন্য অনুমোদিত হতে পারে না, কারণ তা তাদের আত্মাকে কলুষিত করতে পারে।

প্রাচীন ইহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্মের সাথে বন্ধনযুক্ত একটি প্রাচীন ইহুদী ধর্ম সম্প্রদায় (Essene) খ্রিঃ পূর্ব ২য় শতব্দী হতে বিন্দু খ্রিঃ পূর্ব ১ম শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু ও জৈন ধর্মানুসারীদের মতই কড়া নিরামিষভোজী ছিলেন।

প্রচীন গ্রীক ও রোমান দর্শন: নিরামিষভোজন সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীক দর্শনের রয়েছে একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য। ***পিথাগোরাস*** (খ্রিঃপূর্ব 570- খ্রিঃ পূর্ব 495) নিরামিষভোজী ছিলেন এবং তাঁর অনুসারীগণও। ***সক্রেটিস*** (খ্রিঃ পূর্ব 469 - খ্রিঃপূর্ব 399) নিরামিষভোজী ছিলেন এবং তাঁর রচনায় একটি আদর্শ প্রজাতন্ত্রে সাধারণ জনগণ অথবা কমপক্ষে দার্শনিক নেতারা খাদ্য হিসাবে কি গ্রহণ করবেন তার উত্তরে তিনি কেবলমাত্র নিরামিষ ভিত্তিক খাদ্যাভ্যাসের কথাই উলে- খ করেছেন। বিশেষ করে তিনি উলে- খ করেছেন যে, মাংস ভক্ষন ন্যায্য বলে বিবেচিত হলে সমাজে বেশী সংখ্যক চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে।

রোমান লেখক ও কবি Publius Ovidius Nasu (খ্রিঃ পূর্ব 43 -18 খ্রিঃ) ওভিদ (Ovid) তাঁর বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম মেটামরফসিস' (Metamorphoses) এ নিরামিষ ভোজনকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে উলে- খ করেছেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস বা নীতিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, মানুষ এবং জীবের প্রাণ এমনই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে, ***একটা প্রাণীকে হত্যা করা কার্যতঃ একজন মানুষকে হত্যা করার সমান।*** তাঁর ভাষায় *"সব কিছুই পরিবর্তিত হয়; কিন্তু কোন কিছুই নিঃশেষ হয়ে যায় না; আত্মা এদিক ওদিক ঘুরাফেরা করে এখন এখানে আবার পরে ওখানে এবং তার জন্য নির্ধারিত দৈহিক গঠনকে গ্রহণ করে, পশু হতে মানবদেহে ভ্রমন করে, আবার আমাদের নিজস্ব গঠন হতে পশুতে এবং কখনোই নিঃশেষ হয়না।* অতএব, এই আশংকা থেকে যায় যে, ক্ষুধা এবং লোভ ভালোবাসা ও কর্তব্যের বন্ধন ধ্বংস করে দেয়, আমার এই বাণী মনোযোগ সহকারে শোন। ***বিরত থাকো! কখনোই বধ করার মাধ্যমে আত্মাকে কলুষিত করোনা"।***

খ্রিষ্ট ধর্ম: বর্তমান খ্রিষ্টীয় সংস্কৃতিতে নিরামিষ ভোজন কোন প্রচলিত বা সাধারণ খাদ্যাভ্যাস নয়; তবে কিছু সংখ্যক সন্যাসী এবং গোঁড়া খ্রিষ্টবাদী এই মত অনুসরণ করে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই মতবাদের শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক সমর্থন রয়েছে।

ইসলাম ধর্ম: মুসলমানদের চিকিৎসাগত কারণে অথবা ব্যক্তিগত র"চিবোধের কারণে নিরামিষভোজী হওয়ার নির্বাচনের স্বাধীনতা রয়েছে। তবে যাই হোক, অচিকিৎসাগত কারণে নিরামিষভোজী হওয়া, কোন কোন ক্ষেত্রে বিতর্কিত বলে প্রতীয়মান হয়। অনেক প্রভাবশালী মুসলিম মণিষীরা নিরামিষভোজী ছিলেন যথাগু অধ্যাত্মবাদী এবং মহীয়সী নারী কবি রাবেয়া বস্‌রী (মৃত্যু- ৮০১ খ্রিঃ), মুহাম্মদ আল গাজালী, হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী, হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া, শাহ আবদুল করিম, বুললে শাহ্ এবং শ্রীলঙ্কান সূফী সাধক বাওয়া মুহাইয়াদ্দিন (মৃত্যু 8/12/1986) যিনি উত্তর আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ার (Bawa Muhaiyaddin Fellowship) এর প্রতিষ্ঠাতা।

পরিবেশগত

পরিবেশগতভাবে নিরামিষভোজন এই ধারণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে, বৃহৎ মাত্রায় পশু মাংস ও পশুজাত দ্রব্য উৎপাদন পরিবেশগতভাবে অসহনীয়। ২০০৬ সালে জাতি সংঘের একটি গবেষণালব্দ ফলাফল মতে, গৃহপালিত পশু উৎপাদন হলো, বিশ্বজুড়ে পরিবেশগত অবনতির একটি বড় কারণ এবং খাদ্যের জন্য পশু পালন বা উৎপাদন বৃহৎ মানে বায়ূ ও পানি দূষন, জলাবায়ূ পরিবর্তন, জীব বৈচিত্র হারানো ইত্যাদির ক্ষেত্রে বড় প্রভাব ফেলে এবং ঐ গবেষণামতে স্থানীয় ও বৈশ্বিকভাবে পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য শিল্পের গৃহপালিত পশু সেক্টরটি একটি বড় প্রভাবক।

মনোবিজ্ঞান

একথা সর্বজন গ্রাহ্য যে, প্রকৃতিগত বা স্বতঃস্ফুর্ত যে কোন জিনিসই উত্তম বা সঠিক। স্কটিশ কবি Douglas Dunn (জন্ম-23/10/1942) একটি রূপক বা উপমা উপস্থাপন করেছেন এভাবে "যদি কেউ একটি ছোট শিশুকে একটি আপেল এবং একটি জীবিত মুরগী দেয়, তবে শিশুটি স্বতঃস্ফুর্তভাবে মুরগীটিকে নিয়ে খেলবে এবং আপেলটি খাবে; পক্ষান্তরে একটি বিড়ালকে যদি উক্ত একই রকম মুরগী ও আপেল দেওয়া হয় তবে তার প্রতিক্রিয়া হবে ঠিক তার বিপরীত। সর্বভোজী এবং তুলনামূলকভাবে মানব সদৃশ প্রজাতি, যেমন- শিম্পাঞ্জি, হয়তো শিকার-জন্তুকে এমন স্বততঃ হত্যা করবেনা যদি শিম্পাঞ্জির সম্মুখে এমন একটি শিকার ও ফল দেওয়া হয়"। অনুরূপভাবে আমেরিকার নিরামিষভোজী Scott Adams কৌতুকভরে লিখেছেন "একটি সিংহ জীবিত গরু দেখলে লালায়িত হয়, অথচ একজন মানুষ একটি গরুর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে 'হাম্বা' রব করে এবং দেখে যে গরুটি প্রত্যুত্তর দেয় কিনা"। এখানে রূপকের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, উন্নততর প্রাণীতে হিংস্রতা কম এবং জীবের প্রতি দয়া কোমলভাব বেশী থাকে।

"নিরামিষ ভোজনের কারণ ব্যাখ্যা"

বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা: পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন হতে হাজার হাজার কোটি বছর পর পর্যন্ত উত্তপ্ত অগ্নি পিন্ডের ন্যায় গ্যাসীয় বা বায়বীয় পদার্থের পৃথিবী ক্রমে ক্রমে শীতল হতে শীতলতর হয়ে তরলে পরিণত হলো। আরো বহু কোটি বছর পর তরল পৃথিবী, বর্তমান কঠিন গোলাকার পৃথিবীর রূপ নিয়েছে। পৃথিবীর আকাশ ছিল বিভিন্ন বায়বীয় পদার্থে ভরপুর। ঘন ঘন ভুমি কম্পন, অগ্নেয়গিরির অগ্নুতপাত, গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদির আকর্ষণ-বিকর্ষণ ইত্যাদি নৈসর্গিক কারণে পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, নদ-নদী ইত্যাদি সৃষ্টি হলো। তবে সৃষ্টির আদিকালে এগুলোতে কোন পানি ছিল না। এগুলো ছিল শুন্য বা খালি অবস্থায়।

আরো বহু কোটি বছর পর তাপমাত্রা হ্রাস ও আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে ভূমির সংলগ্ন বায়বীয় অঞ্চলে জলীয়বাষ্প সৃষ্টি হতে লাগলো। জলীয়বাষ্প ক্রমে ক্রমে শীতল হয়ে মেঘ সৃষ্টি হলো। উক্ত মেঘ একত্রে জমে আবহাওয়াগত কারণে বৃষ্টিপাত শুরু হলো। এভাবে বৃষ্টির জলে সকল সমুদ্র, মহাসমুদ্র, নদ-নদী ইত্যাদি জলে পরিপূর্ণ হলো। স্রষ্টার অপার কৃপায় এমন পরিবেশ সৃষ্টি হলো, যাতে জলে এককোষী শেওলা সৃষ্টি হতে লাগলো। অতঃপর বিবর্তন ও অনুকুল পরিবেশে বহুকোষী ও জটিল জৈব অনু সৃষ্টি হতে লাগলো। এমনিভাবে লক্ষ লক্ষ বছর পর বিবর্তনের ধারায় জৈব অনু হতে বহুকোষী উদ্ভিদ, গাছপালা, তরুলতা ইত্যাদি সৃষ্টি হতে লাগলো। এভাবে কেটে গেলো বহু বছর।

অতঃপর উদ্ভিদ সৃষ্টি হওয়ার কারণে নতুন পরিবেশে গাছে ফল-ফুল দ্বারা পৃথিবী সজ্জিত হলো। একই সাথে প্রাণী বা জীব সৃষ্টি হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হলো। জীব সৃষ্টির এ উত্তম পরিবেশে এককোষী প্রাণী এবং ক্রমান্বয়ে প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক কারণে জটিল জৈবঅনু বিশিষ্ট প্রাণী ও জীব সৃষ্টি হতে লাগলো।

তারও বহু বছর বা লক্ষ লক্ষ বছর পর স্রষ্টার কৃপায় তিনি নিজে এ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি রূপে প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) কে প্রেরণ করেন। স্রষ্টার ইচ্ছায়ই মানবসহ চৌরাশি লক্ষ প্রকার প্রাণী সৃষ্টি করলেন।

পুনঃজন্ম ও জন্মান্তরবাদ নীতি অনুযায়ী পৃথিবীতে মানবাত্মা সমূহ জন্মচক্র অনুসারে বিভিন্ন জীবে জন্ম নিয়ে ভ্রমন শুর" হলো।

প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) এর খাদ্য শুর" হয় ফলমূল, উদ্ভিদ ইত্যাদি দ্বারা।

সুতরাং, এ সময় হতে মানব খাদ্য ফলমূল, শাকসবজি বা নিরামিষ দ্বারাই শুর" হয়। আগুন দিয়ে মাছ মাংস রান্না করতঃ খাবার ব্যবস্থাপনা আদি মানবগোষ্ঠী জানতেন না এবং ইহার কোন প্রয়োজনও ছিল না। লক্ষ লক্ষ বছর মানুষ তৃণভোজী হিসেবেই ছিল।

স্রষ্টার দেয়া আদি খাদ্যই ছিল ফলমূল, তৃনলতা, বীজ ইত্যাদি অর্থাৎ মানবের আদি খাদ্য ছিল নিরামিষ, সুতরাং আধ্যাত্মিকভাবে নিরামিষই মানবের জন্য নির্ধারিত আদর্শ খাদ্য।

মাতৃশিশু জন্ম হওয়ার পূর্বেই যেমন স্রষ্টা শিশুর মায়ের স্তনে শিশু খাদ্য হিসেবে দুগ্ধের সঞ্চার করেন, ঠিক তেমনি মানব সৃষ্টি করার পূর্বেও তাঁর খাদ্য হিসেবে মাতারূপী বসুন্ধরা (মাটিময় পৃথিবী) উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছেন।

প্রাণী বা জীব সৃষ্টির জন্য স্রষ্টা পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, সৌরজগত বা মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তা হলে, ***প্রাণীর জন্যই (মানবসহ) প্রকৃতি সৃষ্টি হয়েছে, প্রকৃতির জন্য প্রাণীর সৃষ্টি হয়নি।*** তাই, মহাবিশ্বের মধ্যে প্রাণীই স্রষ্টার সবচেয়ে বড় এবং গুর"ত্বপূর্ণ সৃষ্টি। আরো দেখা যাচ্ছে যে, প্রাকৃতিক সকল শক্তি বা ক্ষমতাই প্রাণীর সেবায় নিয়েজিত। সেজন্যে প্রাণীই হচ্ছে স্রষ্টার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি। তাই, প্রাণীকে হত্যা করতঃ ভক্ষন করা অত্যন্ত হৃদয় বিদারক ও নিষ্ঠুর কর্ম। যা স্রষ্টার জন্য প্রিয় তা মানবের জন্যও প্রিয় হওয়া উচিৎ।

আর সে জন্যই জীবে দয়া প্রদর্শন করার এক মহান দৃষ্টান্ত হিসেবে মহাগুর" রমিজের অনুসারীগণ মাছ-মাংস–ডিম ভক্ষন না করে নিরামিষ ভোজী হয়ে থাকেন। মানুষ সকল সৃষ্টির সেরা (আশ্‌রাফুল মাখ্‌লুকাত)। মানুষের মস্তিস্ক অন্য প্রাণী হতে অনেক উন্নত। মানব মস্তিস্কের অভিনব গঠন, দেহের গঠন, তার দেহের হরমোন এবং এমন কিছু জৈব বস্তু আছে যে কারণে তার আচরণ সকল পশু হতে উন্নততম। মানবের মানবীয় আচরণ নিজগৃহ থেকে সর্বত্র কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

পক্ষান্তরে পশুর পাশবিক স্বভাব হল হিংস্রতা। এই হিংস্র স্বভাবের জন্যই পশু নিকৃষ্ট প্রাণী বা জীব হিসেবে পরিগণিত হয়। পশুর এ হিংস্র স্বভাবের জন্য নিশ্চয়ই তার দেহে ও তার মস্তিস্কে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যার কারণে ইহার দেহ ও আচরণ হিংস্র স্বভাব দ্বারা গঠিত হয়েছে। এ সমস্ত উপাদানের উপস্থিতিতে ইহাদের স্বভাব ও আচরণ হিংস্র বা উগ্র হয়ে থাকে।

পশুর মাংস ভক্ষন করলে পশুদের পশুত্ব বা হিংস্র স্বভাবের জন্য কার্যকর যে সমস্ত উপাদান ইহাদের দেহে ও মস্তিস্কে বিদ্যমান আছে ঐ সমস্ত উপাদানগুলো যিনি পশু মাংস ভক্ষন করবেন তার দেহে সংক্রমিত হবে বা উলি- খিত উপাদানগুলো তার দেহে দেহান্তরিত হবে। ইহার ফলশ্র"তিতে যিনি মাংস ভক্ষনকারী তার আত্মা ও মস্তিস্ক ক্রমে ক্রমে পাশবিক স্বভাবে পরিণত হবে। তার মানবিক আচরণ (Humanity) হ্রাস পাবে এবং পাশবিক আচরণ (Animaliuty) ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

এভাবে মানবাত্মার স্বভাব ক্রমান্বয়ে পশু আত্মার স্বভাবে রূপান্তরিত হবে। জন্মান্তরবাদ অনুযায়ী উক্ত পশুর আচরণে পরিণত পাশবিক আত্মা, মানবের আত্মা হয়েও পরজন্মে পশুতে জন্ম ধারণ করতে হবে এবং জীব হত্যার কর্মফল ভোগতে হবে।

উক্ত কারণেই মহাগুর ্ রমিজ নিরামিষভোজী ছিলেন এবং তাঁর অনুসারী সবাই নিরামিষভোজী।

এই নিরামিষ ভোজনের প্রেক্ষিতে মহাগুর ্ রমিজ তাঁর উক্ত বলিষ্ট যুক্তি উপস্থাপন করতেন। অধ্যাত্ম বিষয়ে তিনি কোন সময়ও গোরামী বা অন্ধ বিশ্বাসকে পছন্দ করতেন না। এ বিষয়ে যুক্তি নির্ভর তত্ত্বকেই তিনি বেশী মূল্যায়ন করতেন। কারণ, বর্তমান সময়ে বিবেক ও বুদ্ধির অধিকারী মানুষের চিন্তা-চেতনা মহাকালের পালাবদলের সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে। এককালে গুহায়-জঙ্গলে বসবাসকারী মানুষ সভ্যতার বিকাশের ধারায় আজকের দিনে পৃথিবীর গন্ডি অতিক্রম করে মহাবিশ্বের রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে। ফলে, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত বিভিন্ন ধর্ম ও পথের মানুষ অন্য সব বিষয়ের মত ধর্ম ও পথ গুলোকে নিছক অন্ধ বিশ্বাসের বিষয়বস্তু হিসেবে মেনে নিতে রাজি নয়, বরং তারা চায় এর যুক্তিসংগত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা। তাই মহাগুর ্ রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন-

"সাইন্টিস্ট দেখিয়া নেয় কোথায় কি রয়েছে,

তোমরা প্রমাণ কর স্রষ্টা কোথায় আছে"।

নিরামিষ ভোজন সম্বন্ধে বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা পূর্বেই দেয়া হয়েছে।

উপরোক্ত আপ্তবাক্যে গুর ্ রমিজ বলেন- বিজ্ঞানীরা যেমন মহাবিশ্বের কোথায় কি রয়েছে তা আবিষ্কার করতে বা উদ্‌ঘাটন করতে সচেষ্ট আছে, তদ্র ্প যারা আধ্যাত্মিক বিষয়ে গবেষণায় আছেন তাদেরকে স্রষ্টার অবস্থান কোথায়, তার স্বর ্প কি, তাকে কিভাবে চেনা যায়, কি ভাবে তার নৈকট্য লাভ করা যায় তা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করার জন্য রমিজ পন্থীদেরকে আহ্‌বান ও আদেশ করেছেন। স্রষ্টা সর্বজীবে বিরাজমানণ্ড ইহা গুর ্ রমিজের মতবাদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীতে মানবাত্মাসহ সকল জীবের আত্মা স্রষ্টার মূলসত্বা বা আদি-আত্মা হতে সৃষ্ট। যে সমস্ত মানুষ ষড়রিপু ও ইন্দ্রিয়াদির তাড়নায় জ্ঞান ও বিবেককে যথাযথ কাজে না লাগিয়ে বিবেক বর্জিত যথেচ্ছাচারভাবে কাজে লাগিয়েছে এবং বিকৃত জ্ঞানকে পাশবিক ও অমানবিক কাজে ব্যবহার করেছে তারই ফলশ্র ্তিতে, তাঁরা মানুষ হয়েও যে সমস্ত পশু সুলভ আচরণ করেছে ঐ সমস্ত পশুর আকার ধারণ করতঃ পুনঃজন্ম নিয়েছে।

সুতরাং, আমাদের চারদিকে বর্তমানে যে সমস্ত পশু, পাখি, মাছ ইত্যাদি যে সমস্ত প্রাণী দেখছি তা সবই এক পরমাত্মা বা স্রষ্টার জাত। কর্ম অনুযায়ী তারা বিভিন্ন প্রাণী বা জীবে থেকে কর্ম ফল ভোগছে। মানবের ক্বাল্‌ব বা হৃদয়ে স্রষ্টা বাস করেন। তা হলে আপাতত পশু আকারের মানবগুলোর হৃদয়েও স্রষ্টা বাস করেন। তার মানে স্রষ্টা সকল জীবের মধ্যেই আছেন।

সুতরাং, সকল প্রাণী বা জীবকে ভালোবাসলেই স্রষ্টাকে ভালবাসা হলো।

মূল কথা হচ্ছে, স্রষ্টাকে ভালোবাসতে হলে তার সৃষ্ট সর্বজীবকে ভাল বাসতে হবে। আর একারণেই জীব হত্যা করতঃ তার মাংস ভক্ষন না করে, স্রষ্টার প্রেমে মগ্ন হয়ে নিরামিষ ভোজন করতঃ আজীবন সংযম পালন করা হয়। মানবসহ সর্বজীব স্রষ্টার অতি উত্তম সৃষ্টি (আশ্‌রাফুল মাখ্‌লুকাত্)।

পবিত্র হাদীসে সকল মানুষ ও সর্বজীবকে দয়া প্রদর্শনের কথা উলে- খ আছে।

ইসলাম ধর্ম শিক্ষাও১৯৯৬ নবম দশম শ্রেণী- হাদীস নং-০৬।

বর্ণিত আছে যে ***"সকল সৃষ্টিই আল-াহ্‌র আপনজন। অতএব, তিনিই স্রষ্টার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় যিনি তাঁর পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করেন"।***

অর্থ- *যে ব্যক্তি আল-াহ্‌র সৃষ্টির প্রতি দয়া করেন আল-াহ্‌ও তাঁহার প্রতি দয়া করেন।*

এ হাদীসে পরোক্ষভাবে জীব বা প্রাণী হত্যা নিষেধ করারই সামিল।

সহীহ্ বোখারী শরীফ- (সকল খন্ড একত্রে)
প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ জুবায়েদ তালুকদার (জনি)
প্রকাশকাল ঃ ২০০৫ জুলাই ১ম মুদ্রণ

১২৮৪। হাদীস ঃ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হযরত নবী করিম (সঃ) বলেছেনঃ জনৈক ব্যাভিচারিনীকে ক্ষমা করে দেয়া হয় যে, একদিন সে একটি কুকুরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। দেখল কুকুরটি একটি কুপের পাশে বসে হাপাচ্ছে। বর্ণনাকারী বলেন, পানির পিপাসায় তাকে মৃত প্রায় করে দিয়েছিল। তখন ব্যাভিচারিনী মহিলাটি তার মোজা খুলে ওড়নার সাথে বাঁধল তার পর সে কুফ হতে পানি তুলে কুকুরটিকে পানি পান করাল। এ কারণে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো।

একটি প্রাণীকে মৃত্যুর পথ হতে জীবনে বাঁচানো হয়েছে বলে প্রাণ রক্ষাকারী ব্যাভিচারিনী মহিলা যদি তার পাপ হতে মুক্তি পায় তবে আজীবন প্রাণী হত্যা না করে নিরামিষ ভোজন করতঃ লক্ষ লক্ষ জীবকে যিনি হত্যা হতে রক্ষা করবেন তিনি অবশ্যই স্রষ্টার নিকট হতে তাঁর দয়া বা কৃপা পাবেন এবং পাপমুক্ত হবেন বলে উক্ত হাদীসে প্রতীয়মান হয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন- ***"বহুরূপে ছাড়ি কোথা খুঁজেছ ঈশ্বর***
জীবে প্রেম করে যেইজন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর"।

এখানেও স্বামী বিবেকানন্দ সর্বজীবেই স্রষ্টা বিরাজিত এবং জীবের মাঝেই শিবকে বা স্রষ্টাকে পাওয়া যাবে বলে বিবৃত আছে।

স্রষ্টার সৃষ্ট যত প্রাণী আছে তাদেরকে ভালোবাসলেই স্রষ্টাকে ভালবাসা হলো। তাতেই স্রষ্টা দয়াবান হবেন।

মহাগুরু রমিজ স্রষ্টাকে ভালোবাসা ও তাঁর জাতের সঙ্গে মিশে যাওয়া প্রসঙ্গে বলেছেন *"তোমরা সর্বজীবকে ভালোবাসতে পারলেই স্রষ্টাকে ভালোবাসা হলো। স্রষ্টার সাথে প্রেম করা আর তাঁর সৃষ্ট সকল প্রাণী এবং অন্যান্য সৃষ্টির সাথে প্রেম করা একই জিনিস"* তিনি তাঁর ভাষায় বলেন-

১. *মানবকে ভালবাস হৃদয়ে রাখি ভক্তি*
মানবেতে আছেন প্রভু তাঁরে জানাও স্তুতি।
২. *যাহার হস্তে কি মুখের বাক্যে জীবে না পায় কষ্ট*
তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী সর্বজীবে রাষ্ট্র।
৩. *প্রতিবেশীর প্রতি কর ভাল ব্যবহার*
বিপদে সম্পদে তাদের করিও উদ্ধার।
৪. *কর্মফল বিশ্বমাঝে যদি হয় সত্য*
জীবে দয়া না থাকিলে কেহ নয় মুক্ত।

বিঃ দ্রঃ জীবে দয়া বিষয়টি নিরামিষ ভোজনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর সে জন্যই উক্ত আপ্তবাক্যগুলোতে মহাগুর" রমিজ সকল মানুষকে ভালবাসার কথা, কোন জীব বা মানুষ কারো হাতে বা মুখের বাক্যে যেন কষ্ট না পায় তার কথা, প্রতিবেশীর প্রতি ভাল ব্যবহার করার কথা এবং সব শেষে জীবে দয়া না থাকিলে কেহ মুক্ত হতে পারবেন না বলে তাঁর পন্থীদের এ সমস্ত মূল্যবান উপদেশগুলো দিয়েছেন।

নিরামিষ ভোজনের সাথে অধ্যাত্মবাদের একটি অনন্য সম্পর্ক রয়েছে বিধায় মহাগুর" রমিজ তাঁর বিধানে নিরামিষ ভোজনকে একটি অন্যতম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং তাই তাঁর অনুসারী সকলেই নিরামিষভোজী।

নিরামিষভোজী প্রখ্যাত মুসলিম মণিষীদের তালিকা

নং	নাম	পরিচয়	জন্মভূমি	জীবনকাল
১.	মুহাম্মদ আল গাজালী	ইসলামী প"িত ও সূফী সাধক	ইরান	১০৫৮ খ্রিঃ - ১১১১ খ্রিঃ
২.	হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী	চিশতী সম্প্রদায়ের প্রথম নেতা	আফগানিস্থান	১১৪১ খ্রিঃ - ১২৩০ খ্রিঃ
৩.	হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া	ভারতীয় সূফী সাধক ও চিশ্‌তী নেতা	ভারত	১২৩৮ খ্রিঃ - ১৩২৫ খ্রিঃ
৪.	শেখ নাসির"্‌দ্দিন মাহমুদ	সূফী সাধক	ভারত	১২৭৪ খ্রিঃ - ১৩৫৬ খ্রিঃ
৫.	মুহিদ্দিন ইব্‌ন আরাবী	ইসলামী পন্ডিত, সূফী সাধক ও দার্শনিক	স্পেন	১১৬৫ খ্রিঃ - ১২৪০ খ্রিঃ
৬.	মুহাম্মদ রহিম বাওয়া-মুহাইয়াদিন	ইসলামী গ্রন্থাকার ও সূফী সাধক	শ্রীলঙ্কা	মৃত্যু - ১৯৮৬ খ্রিঃ
৭.	সূফী কবির সাহিব	ইসলামী চিন্তাবিদ	ভারত	১৪৪০ খ্রিঃ - ১৫১৮ খ্রিঃ
৮.	আল্‌ হাফিজ বি. এ মাসরি	ব্রিটিশ ভারতীয় ঈমাম	ভারত	১৯১৪ খ্রিঃ - ১৯৯৩ খ্রিঃ
৯.	সাদেক হেদায়েত	উপন্যাসিক	ইরান	১৯০৩ খ্রিঃ - ১৯৫১ খ্রিঃ
১০.	সুলতান বাহু	মুসলিম সূফী সাধক	পাকিস্তান	১৬২৮ খ্রিঃ -১৬৯১ খ্রিঃ
১১.	আবু আলি কালান্দার	মুসলিম মণিষী	আজারবাইজান	১২০৯ খ্রিঃ - ১৩২৪ খ্রিঃ
১২.	ইনায়েত খান	মুসলিম সাধক	ভারত	১৮৮২ খ্রিঃ - ১৯২৭ খ্রিঃ
১৩.	রাবেয়া বস্‌রী	মুসলিম সূফী সাধক	ইরাক	৭১৭ খ্রিঃ - ৮০১ খ্রিঃ
১৪.	শাহ আব্দুল করিম	সূফী ও কবি	পাকিস্তান	১৬৮৯ খ্রিঃ - ১৭৫২ খ্রিঃ

১৫.	বুল্‌লে শাহ্‌	সূফী সাধক	পাকিস্তান	১৬৮০খ্রিঃ - ১৭৫৭ খ্রিঃ

বিশ্ববিখ্যাত নিরামিষভেজীদের তালিকা (অতীত)

ক্র.নং	নাম	পরিচয়	জন্মভুমি	জীবনকাল
১৬	গৌতম বুদ্ধ	ধর্মীয় নেতা ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রণেতা	নেপাল	৫৬৩ খ্রিঃ পূর্ব - ৪৮৩ খ্রিঃ পূর্ব
১৭	যীশুখৃষ্ট	ধর্মীয় নেতা ও খৃষ্টান ধর্মের প্রবর্তক	ইসরায়েল	৫ খ্রিঃ পূর্ব - ৩০ খ্রিঃ
১৮	তিতুস ফ্লাভিয়াস ক্লেমেন্ট (ক্লেমেন্ট অফ আলেকজান্দ্রিয়া)	চার্চ অফ আলেকজান্দ্রিয়া প্রথম সদস্য	গ্রীস	১৫০ খ্রিঃ - ২১৫ খ্রিঃ
১৯	কৃষ্ণ মূর্তি জিদ্দু	ধর্মীয় গুরু	ভারত	১২/০৫/১৮৯৫ - ১৭/০২/১৯৮৬
২০	মহাভির	জৈন ধর্মের প্রবর্তক	ভারত	৫৯৯ খ্রিঃ পূর্ব - ৫২৭ খ্রিঃ পূর্ব
২১	অরিগেন	খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ববিদ	মিশর	১৮৫ খ্রিঃ - ২৫৪ খ্রিঃ
২২	প-াটিনাস্‌	ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরু	গ্রীস	২০৪ খ্রিঃ - ২৭০ খ্রিঃ
২৩	পরমহংস যোগানন্দ	ভারতীয় ধর্মগুরু	ভারত	৫/১/১৮৯৩ - ৭/৩/১৯৫২
২৪	সেন্ট ফ্রান্সিস অব আসিস্‌	খ্রিষ্টীয় ধর্মযাজক	ইতালী	১১৮১ খ্রিঃ - ১২২৬ খ্রিঃ
২৫	লাওজু	ধর্মগুরু ও দার্শনিক	চীন	খ্রিঃ পূর্ব - ৬ষ্ঠ শতক
২৬	ভক্তিবেদান্ত প্রভূপাদ	ইস্‌কন এর প্রতিষ্ঠাতা	ভারত	১/৯/১৮৯৬ - ১৪/১১/১৯৭৭
২৭	স্বামী শচীদানন্দ	ধর্মীয় নেতা	ভারত	২২/১২/১৯১৪ - ১৯/০৮/২০০২
২৮	জন ওয়েসলি	ধর্মীয় নেতা	যুক্তরাজ্য	২৮/৬/১৭০৩ - ২/৩/১৭৯১
২৯	লিওনার্দাস লেসিয়াস	খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ববিদ	বেলজিয়াম	১/১০/১৫৫৪ - ১৫/০১/১৬২৩
৩০	অন্যান্থনী দ্যা গ্রেট	খ্রিষ্টীয় সন্যাসবাদের জনক	মিশর	২৫১ খ্রিঃ - ৩৫৬ খ্রিঃ
৩১	সেইন্ট হিলারিওন	ধর্মীয় সাধক	ফিলিস্থিনী	২৯১ খ্রিঃ - ৩৭১ খ্রিঃ
৩২	ফ্রান্সিস অফ পাওলা	ধর্মীয় সাধক	ইতালী	২৭/০৩/১৪১৬ - ২/০৪/১৫০৭
৩৩	ফিলিপ রোমোলো নেরি	গীর্জার পুরোহিত	ইতালী	২২/০৭/১৫১৫ -২৫/০৫/১৫৯৫
৩৪	পাদ্রে হিমালয়া	পুরোহিত ও বিজ্ঞানী	পর্তুগাল	০৯/১২/১৮৬৮ - ২১/১২/১৯৩৩
৩৫	জন ডি ব্রিতো	সাধক ও ধর্ম প্রচারক	পর্তুগাল	০১/০৩/১৬৪৭ - ০৪/০২/১৬৯৩
৩৬	বাসিল দ্যা গ্রেট	বিশপ, গীর্জার চিকিৎসক	তুরস্ক	৩৩৫ খ্রিঃ - ৩৭৯ খ্রিঃ
৩৭	জন ক্রিসোসতম	বিশপ, গীর্জার চিকিৎসক	তুরস্ক	৩৪৭ খ্রিঃ - ৪০৭ খ্রিঃ

৩৮	রিচার্ড অফ চিচেস্টার	বিশপ	যুক্তরাজ্য	১১৯৭ খ্রিঃ - ১২৫৩খ্রিঃ
৩৯	ডিওগেনেস্	দার্শনিক ও সৃষ্টি তত্ত্ববিদ	গ্রীস্	৪১২খ্রিঃ পূর্ব - ৩২৩ খ্রিঃ পূর্ব
৪০	স্কোপেনহয়ের	দার্শনিক	জার্মানী	২২/০২/১৭৮৮-২১/০৯/১৮৬০
ক্র.নং	**নাম**	**পরিচয়**	**জন্মভুমি**	**জীবনকাল**
৪১	হেনরি ডেভিড থোরি	নিসর্গবাদী ও দার্শনিক	যুক্তরাষ্ট্র	১২/০৭/১৮১৭- ০৬/০৫/১৮৬২
৪২	রালফ ওয়াল্ড এমারসন	গ্রন্থকার, কবি ও দার্শনিক	যুক্তরাষ্ট্র	২৫/০৫/১৮০৩- ২৭/০৪/১৮৮২
৪৩	অ্যানি বেসান্ট	ব্রহ্মজ্ঞানী, নারীবাদী	যুক্তরাজ্য	০১/১০/১৮৪৭- ২০/০৯/১৯৩৩
৪৪	মার্টিন লুথার	ধর্ম তত্ত্ববিদ, যাজকীয়, সংস্কারক	জার্মানী	১০/১১/১৪৮৩- ১৮/০২/১৫৪৬
৪৫	অ্যালান ওয়াটস্	দার্শনিক ও ধর্মীয় লেখক	যুক্তরাজ্য	০৬/০১/১৯১৫ -১৬/১১/১৯৭৩
৪৬	ইমানুয়েল কান্ট	দার্শনিক	জার্মানী	২২/৪/১৭২৪ - ১২/০২/১৮০৪
৪৭	বেঞ্জামীন ফ্রাংকলিন	আমেরিকান স্টেটস্ ম্যান, দার্শনিক, বিজ্ঞানী	যুক্তরাষ্ট্র	১৭/০১/১৭০৬ - ১৭/৪/১৭৯০
৪৮	পে- টো	পদার্থবিদ, লেখক ও দার্শনিক	গ্রীস্	৪২৭ খ্রিঃ পূর্ব - ৩৪৮ খ্রিঃ পূর্ব
৪৯	পিথাগোরাস	দার্শনিক	গ্রীস	৫৭০ খ্রিঃ পূর্ব - ৪৯৫ খ্রিঃ পূর্ব
৫০	সক্রেটিস্	দার্শনিক	গ্রীস	৪৬৯ খ্রিঃ পূর্ব - ৩৯৯ খ্রিঃ পূর্ব
৫১	ইয়ামবি- কাস চালসিডেনসিস	দার্শনিক	সিরিয়া	২৪৫ খ্রিঃ - ৩২৫ খ্রিঃ
৫২	অ্যাপোলোনিয়াস অফ তিয়ানা	দার্শনিক	গ্রীস	১৫ খ্রিঃ - ১০০ খ্রিঃ
৫৩	অ্যামবেদোক্লিস	প্রাক্ সক্রেটিয় দার্শনিক	গ্রীস	৪৯০ খ্রিঃ পূর্ব - ৪৩০ খ্রিঃ পূর্ব
৫৪	পোরফেরি অফ টায়ার	নিওপ- াটোনীয় দার্শনিক	গ্রীস	২৩৪ খ্রিঃ - ৩০৫ খ্রিঃ
৫৫	সোটিয়ন	নিওপিথাগোরীয় দার্শনিক	গ্রীস	খ্রিস্টিয় - ১ম শতক
৫৬	থিওফ্রাসটাস	দার্শনিক	গ্রীস	৩৭১খ্রিঃ পূর্ব - ২৮৭খ্রিঃ পূর্ব
৫৭	মারসিলিও ফিসিনো	রেনেসাঁ দার্শনিক	ইতালী	১৯/১০/১৪৩৩ -০১/১০/১৪৯৯
৫৮	কুইনটাস সেক্সটিয়াস	রোমান দার্শনিক	ইতালী	৫০ খ্রিঃ পূর্ব
৫৯	হেনরিয়েট রোলান্ড	আধ্যাত্মিক সাধক, কবি, লেখক	হল্যান্ড	২৪/১২/১৮৬৭ -২১/১০/১৯৫২
৬০	জান পি স্ট্রিসবস্	প্রকৃতিবাদী, লেখক	হল্যান্ড	১৮৯১ - ১৯৮৩
৬১	ইমানুয়েল সুইডেনবর্গ	দার্শনিক	সুইডেন	২৯/০১/১৬৮৮-২৯/০৩/১৭৭২
৬২	কনফুসিয়াস	লেখক	চীন	৫৫১ খ্রিঃ পূর্ব - ৪৭৯ খ্রিঃ পূর্ব
৬৩	লুওসা মে অ্যালকট	ঔপন্যাসিক	যুক্তরাষ্ট্র	২৯/১১/১৮৩২-০৬/০৩/১৮৮৮
৬৪	চার্লস রবার্ট ডারউইন	গ্রন্থাকার ও বিজ্ঞানী	যুক্তরাজ্য	১২/০২/১৮০৯- ১৯/০৪/১৮৮২

৬৫	জন মিল্টন	লেখক	যুক্তরাজ্য	০৯/১২/১৬০৮ - ৮/১১/১৬৭৪
৬৬	ভলটেয়ার	লেখক	ফ্রান্স	২১/১১/১৬৯৪- ৩০/০৫/১৭৭৮
৬৭	মারি উলস্টোনক্রাফ্‌ট শেলী	ঔপন্যাসিক	যুক্তরাজ্য	৩০/০৮/১৭৯৭-০১/০২/১৮৫১
ক্র.নং	**নাম**	**পরিচয়**	**জন্মভুমি**	**জীবনকাল**
৬৮	পার্সি বিশী শেলী	কবি	যুক্তরাজ্য	০৪/০৮/১৭৯২-০৮/০৭/১৮২২
৬৯	আপটন সিনক্লেয়ার	গ্রন্থকার	যুক্তরাষ্ট্র	২০/০৯/১৮৭৮- ২৫/১১/১৯৬৮
৭০	লিও টলস্টয়	গ্রন্থকার	রাশিয়া	০৯/০৯/১৮২৮- ২০/১১/১৯১০
৭১	এইচ জি ওয়েলস্	গ্রন্থকার	যুক্তরাজ্য	২১/০৯/১৮৬৬- ১৩/০৮/১৯৪৬
৭২	পাবলিউস ওভিদিউস নাসো	রোমান কবি ও লেখক	ইতালী	৪৩ খ্রিঃ পূর্ব - ১৮ খ্রিঃ
৭৩	মার্ক টোয়েন	লেখক	যুক্তরাষ্ট্র	৩০/১১/১৮৩৫- ২১/০৪/১৯১০
৭৪	প-ুটারচ	লেখক	গ্রীস	৪৬ খ্রিঃু - ১২০ খ্রিঃ
৭৫	আলেকজান্ডার পোপ	কবি	যুক্তরাজ্য	২১/০৫/১৬৮৮-৩০/০৫/১৭৪৪
৭৬	র ্পার্ট ব্রুক	কবি	যুক্তরাজ্য	০৩/০৮/১৮৮৭-২৩/০৪/১৯১৫
৭৭	উইলিয়াম বে- ইক	কবিও চিত্রকার	যুক্তরাজ্য	২৮/১১/১৭৫৭- ১২/০৮/১৮২৭
৭৮	ফ্রানজ কাফকা	লেখক	অস্ট্রিয়া	৩/০৭/১৮৮৩ - ০৩/০৬/১৯২৪
৭৯	অ্যালেন গিনসবার্গ	কবি	যুক্তরাষ্ট্র	৩/০৬/১৯২৬ - ০৫/০৪/১৯৯৭
৮০	গুস্তেভ ফ্লবার্ট	লেখক ও ঔপন্যাসিক	ফ্রান্স	১২/১২/১৮২১-০৮/০৫/১৮৮০
৮১	লর্ড বাইরন	লেখক ও কবি	যুক্তরাজ্য	২২/১/১৭৮৮ - ১৯/০৪/১৮২৪
৮২	রেইনার মারিয়া রিলকে	কবি, উপন্যাসিক	অষ্ট্রিয়া	০৪/১২/১৮৭৫ -২৯/১২/১৯২৬
৮৩	মরিস মায়েটারলিংক	নাট্যকার কবি	বেলজিয়াম	২৯/০৮/১৮৬২-০৬/০৫/১৯৪৯
৮৪	জিন আন্টোনি গে- ইজস	লেখক	ফ্রান্স	১৭৭৩ খ্রিঃ - ১৮৪৩ খ্রিঃ
৮৫	বার্নাডিন.ডি.সেন্ট পিয়েরে	লেখক, উদ্ভিদবিদ	ফ্রান্স	৯/০১/১৭৩৭-২১/০১/১৮১৪
৮৬	আলফানসে মারি লুইস	লেখক,কবি, রাজনীতিবিদ	ফ্রান্স	২১/১০/১৭৯০- ২৮/০২/১৮৬৯
৮৭	জুলস মিশেলেট	ইতিহাসবিদ	ফ্রান্স	২১/০৮/১৭৯৮-০৯/০২/১৮৭৪
৮৮	এলিসি রেকলাস	ভূগোলবিদ, লেখক	ফ্রান্স	১৫/০৩/১৮৩০-০৪/০৭/১৯০৫
৮৯	রোমেইন রোল্যান্ড	নাট্যকার, উপন্যাসিক	ফ্রান্স	২৯/০১/১৮৬৬- ৩০/১২/১৯৪৪
৯০	মার্গারিট ইউরসেনার	গ্রহন্থকার, কবি	বেলজিয়াম	০৮/০৬/১৯০৩- ১৭/১২/১৯৮৭
৯১	গুস্তেভ স্র ্ভে	রাজনীতিবিদ, আইনজীবি	জার্মানী	১১/১০/১৮০৫- ২১/০৮/১৯৭০

৯২	কিস্ বোয়েকে	শিক্ষাবিদ	হল্যান্ড	১৮৮৪ - ১৯৬৬
৯৩	জান লিগথার্ট	শিক্ষাবিদ, লেখক	হল্যান্ড	১৮৫৯ - ১৯১৬
৯৪	জেমি ডি মেগালহেস লিমা	লেখক	পর্তুগাল	১৫/১০/১৮৫৯ - ২৬/২/১৯৩৬
ক্র.নং	**নাম**	**পরিচয়**	**জন্মভুমি**	**জীবনকাল**
৯৫	স্যার বারনেস নেভিল ওয়ালিস্	বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, আবিস্কারক	যুক্তরাজ্য	২৬/০৯/১৮২৭-৩০/১০/১৯৭৯
৯৬	স্যার আইজ্যাক পিটম্যান	পিটম্যন শর্টহ্যান্ড -এর উদ্ভাবক	যুক্তরাজ্য	০৪/০১/১৮১৩ - ১২/০১/১৮৯৭
৯৭	শ্রীণিভাস্ রামানুজান	গণিতজ্ঞ	ভারত	২২/১২/১৮৮৭- ২৬/০৪/১৯২০
৯৮	নিকোলা তেসলা	আবিস্কারক, পদার্থবিদ ও প্রকৌশলী	সার্বিয়া	১০/০৭/১৮৫৬ - ০৭/০১/১৯৪৩
৯৯	টমাস্ আলভা এডিসন	আবিস্কারক	যুক্তরাষ্ট্র	১১/০২/১৮৪৭ - ১৮/১০/১৯৩১
১০০	সিলভেস্টার গ্রাহাম	আবিস্কারক	যুক্তরাষ্ট্র	০৫/০৭/১৭৯৪ - ১১/০৯/১৮৫১
১০১	জন হার্ভে কেলগ	পদার্থবিদ ও বিজ্ঞানী	যুক্তরাষ্ট্র	২৬/০২/১৮৫২ - ১৪/১০/১৯৪৩
১০২	স্যার আইজ্যাক নিউটন	পদার্থবিদ	যুক্তরাষ্ট্র	০৪/০১/১৬৪৩ - ৩১/০৩/১৭২৭
১০৩	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বাঙ্গালী কবি, ব্রহ্মদার্শনিক, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী	ভারত	০৭/০৫/১৮৬১ - ০৭/০৮/১৯৪১
১০৪	অ্যালবার্ট আইনস্টাইন	পদার্থবিদ, পদার্থ বিদ্যায় নোবেল বিজয়ী	জার্মানী	১৪/০৩/১৮৭৯ - ১৮/০৪/১৯৫৫
১০৫	জর্জ বার্নড শ	লেখক ও সাহিত্য নোবেল বিজয়ী	আয়ারল্যান্ড	২৭/০৭/১৮৫৬ - ২/১১/১৯৫০
১০৬	স্যার সি ভি রমন	পদার্থবিদ, পদার্থ বিদ্যায় নোবেল বিজয়ী	ভারত	০৭/১১/১৮৮৮ - ২১/১১/১৯৭০
১০৭	অ্যালবার্ট শোয়েজার	দার্শনিক ও সৃষ্টিতত্ত্ববিদ	জার্মানী	১৪/০১/১৮৭৫ - ০৪/০৯/১৯৬৫
১০৮	লিনাস পাউলিং	রসায়নবিদ ও রসায়ন বিদ্যায় নোবেল বিজয়ী	যুক্তরাষ্ট্র	২৮/০২/১৯০১ - ১৯/০৮/১৯৯৪
১০৯	জর্জ ওয়াল্ড	প্রাণ রসায়নবিদ এবং মেডিসিনে নোবেল বিজয়ী	যুক্তরাষ্ট্র	১৮/১১/১৯০৬ -১২/০৪/১৯৯৭
১১০	আইজ্যাক বাশেভিস্	ইহুদী লেখক, ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী	পোল্যান্ড	২১/১১/১৯০২ - ২৪/০৭/১৯৯১
১১১	চন্দ্র শেখর সুব্রমনিয়ম	মহাকাশবিদ ও পদার্থ বিদ্যায় নোবেল বিজয়ী	ভারত	১৯/১০/১৯১০ - ২১/০৮/১৯৯৫
১১২	জন রে	প্রকৃতিবিদ ও ব্রিটিশ প্রকৃতি ইতিহাসের জনক	যুক্তরাজ্য	১৯/১১/১৬২৭ - ১৭/০১/১৭০৫
১১৩	লিওনার্দো দা ভিঞ্চি	শিল্পী	ইতালী	১৫/০৪/১৪৫২ - ০২/০৫/১৫১৯
১১৪	সুসান বি অ্যান্থনী	নারীবাদী নেত্রী	যুক্তরাষ্ট্র	১৫/০২/১৮২০ - ১৩/০৩/১৯০৬
১১৫	রিচার্ড সেন্ট বার্ব বেকার	প্রখ্যাত পরিবেশ বিদ	যুক্তরাজ্য	১৮৮৯ ১৯৮২

১১৬	মনটেন	রেণেঁসা সর্ম্পকীয় লেখক	ফ্রান্স	২৮/০২/১৫৩৩ - ১৩/০৯/১৫৯২
১১৭	ক্লারা বার্টন	নার্স এবং আমেরিকান রেডক্রসের প্রথম সভাপতি	যুক্তরাষ্ট্র	২৫/১২/১৮২১ - ১২/০৪/১৯১২
১১৮	ইসাদোরা ডুনকান্	নৃত্যশিল্পী	যুক্তরাষ্ট্র	২৬/০৫/১৮৭৭ - ১৪/০৯/১৯২৭
ক্র.নং	**নাম**	**পরিচয়**	**জন্মভুমি**	**জীবনকাল**
১১৯	ডুগ হেণিং	যাদুশিল্পী	ক্যানাডা	০৩/০৫/১৯৪৭ - ৭/০২/২০০০
১২০	রিভার ফনিক্স	অভিনেতা	যুক্তরাষ্ট্র	২৩/০৮/১৯৭০ - ৩১/১০/১৯৯৩
১২১	বেনজামিন স্পোক	গ্রন্থকার ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ	যুক্তরাষ্ট্র	০২/০৫/১৯০৩-১৫/০৩/১৯৯৮
১২২	ভিনসেন্ট ভেন গগ্	চিত্রকর	ফ্রান্স	৩০/৩/১৮৫৩- ২৯/০৭/১৮৯০
১২৩	ডেভিড ক্যারাডিন	অভিনেতা	যুক্তরাষ্ট্র	০৮/১২/১৯৩৬-০৩/০৬/২০০৯
১২৪	আব্রাহাম লিংকন	যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট	যুক্তরাষ্ট্র	১২/০২/১৮০৯-১৫/০৪/১৮৬৫
১২৫	ডঃ জানেজ দ্রনোভসেক	স্লোভেনিয়া সাবেক প্রেসিডেন্ট	স্লোভেনিয়া	১৭/০৫/১৯৫০-২৩/০২/২০০৮
১২৬	মহাত্মা গান্ধী	রাজনৈতিক নেতা ও মানবতাবাদী ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী	ভারত	০২/১০/১৮৬৯-৩০/০১/১৯৪৮
১২৭	অশোক দ্যা গ্রেট	সম্রাট	ভারত	৩০৪ খ্রিঃ পূর্ব- ২৩২ খ্রিঃ পূর্ব
১২৮	মোরারজি দেশাই	সাবেক প্রধানমন্ত্রী, ভারত	ভারত	২৯/০২/১৮৯৬-১০/০৪/১৯৯৫
১২৯	ফারদিনান্দ দোমেলা	রাজনীতিবিদ	হল্যান্ড	১৮৪৬ - ১৯১৯
১৩০	জনি অ্যাপলসিড	ধর্ম প্রচারক, নেতা	যুক্তরাষ্ট্র	১৭৭৪ - ১৮৪৫
১৩১	ফ্রানটিসেক কুপকা	চিত্রশিল্পী	চেকপ্রজাতন্ত্র	২৩/০৯/১৮৭১-২৬/০৪/১৯৫৭
১৩২	রুকমিনি দেবি অরুন্দালে	ব্রহ্মজ্ঞানী সাধিকা	ভারত	১৯০৪ - ১৯৮৬
১৩৩	গুস্তাব মেহলার	সঙ্গীতকার	অষ্ট্রিয়া	১৮৬০ - ১৯১১
১৩৪	ইউজেন ডি অ্যালবার্ট	পিয়ানিষ্ট	স্কটল্যান্ড	১০/৪/১৮৬৪- ০৩/০৩/১৯৩২
১৩৫	উইল হেলম রিচার্ড ওয়াগনার	নাট্য পরিচালক	জার্মানী	১৮১৩ - ১৮৮৩
১৩৬	মাইকেল জ্যাকসন	গায়ক	যুক্তরাষ্ট্র	২৯/৮/১৯৫৮- ২৫/৬/২০০৯
১৩৭	স্কিটার ডেভিস	গায়ক	যুক্তরাষ্ট্র	৩০/১২/১৯৩১-১৯/০৯/২০০৪
১৩৮	বব মারলি	সঙ্গীতকার	জামাইকা	৬/০২/১৯৪৫-১১/০২/১৯৮১

১৩৯	জেরী গার্সিয়া	সঙ্গীতকার	যুক্তরাষ্ট্র	১/০৮/১৯৪২- ৯/০৮/১৯৯৫
১৪০	জর্জ হ্যারিসন	সঙ্গীতকার	যুক্তরাজ্য	২৫/০২/১৯৪৩-২৯/১১/২০০১
১৪১	কল্পনা চাওলা	মহাকাশ বিজ্ঞানী	ভারত	১৭/৩/১৯৬২ -১/০২/২০০৩

বিশ্ববিখ্যাত নিরামিষভোজীদের তালিকা (বর্তমান)

ক্র.নং	নাম	পরিচয়	জন্মভুমি	জন্মতারিখ
১৪২	এ.পি.জে. আবদুল কালাম	সাবেক রাষ্ট্রপতি, ভারত	ভারত	১৫/১০/১৯৩১
১৪৩	এলি উইসেল	ঔপন্যাসিক, পদার্থবিদ, নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী	হাঙ্গেরী	৩০/০৯/১৯২৮
১৪৪	অং সান সুচি	গণতন্ত্রকামী নেত্রী ও নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী	মায়ানমার	১৯/০৬/১৯৪৫
১৪৫	ভি.এস ন্যায়পল	সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী	ত্রিনিদাদ ও টোবাগো	১৭/০৮/১৯৩২
১৪৬	জে.এম কোয়েটজি	সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী	দক্ষিণ আফ্রিকা	০৯/০২/১৯৪০
১৪৭	এডওয়ার্ড উইটেন	গাণিতিক, পদার্থবিদ	যুক্তরাষ্ট্র	২৬/০৮/১৯৫১
১৪৮	ব্রায়ান গ্রীণ	পদার্থবিদ ও তন্তুতত্ত্ববিদ	যুক্তরাষ্ট্র	০৯/০২/১৯৬৩
১৪৯	জেইন গুডাল	নৃতত্ত্ববিদ	যুক্তরাজ্য	০৩/০৪/১৯৩৪
১৫০	নাথানিয়েল বোরেনস্টেইন	ই-মেইল ভাষার উদ্ভাবক	যুক্তরাষ্ট্র	২৩/০৯/১৯৫৭
১৫১	মনমোহন সিংহ	ভারতের প্রধানমন্ত্রী	ভারত	২৬/০৯/১৯৩২
১৫২	মুতাবার ্কা	কবি	জ্যামাইকা	২৬/১২/১৯৫২
১৫৩	পিটার সিংগার	মানবতাবাদী ও দার্শনিক	অষ্ট্রেলিয়া	০৬/০৭/১৯৪৬
১৫৪	বার্ক ব্রেথেড	কার্টুনিষ্ট	যুক্তরাষ্ট্র	১৪/০৫/১৯৭৬
১৫৫	লরেন বুশ	মডেল (প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের ভাগ্নী)	যুক্তরাষ্ট্র	২৭/০২/১৯৮০
১৫৬	চেলসি ক্লিনটন	সাবেক প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের কন্যা	যুক্তরাষ্ট্র	২৭/০২/১৯৮০
১৫৭	দিপক চোপড়া	ডাক্তার এবং গ্রন্থাকার	ভারত	১৯৪৬ ইং
১৫৮	মাইকেল ইসনার	সি ই ও ডিজনী	যুক্তরাষ্ট্র	০৭/০৩/১৯৪২
১৫৯	বিল ফোর্ড	সি ই ও ফোর্ড মোটর কোম্পানী	যুক্তরাষ্ট্র	০৩/০৫/১৯৫৭
১৬০	আন্দ্র ্জ্রাকবস্ জুনিয়র	কংগ্রেসম্যান	যুক্তরাষ্ট্র	২৪/০২/১৯৩২

১৬১	স্টিভ জবস্	প্রতিষ্ঠাতা, অ্যাপল কম্পিউটার	যুক্তরাষ্ট্র	২৪/০২/১৯৫৫
১৬২	কার্ল লুইস	অ্যায়থেট ও নয়বার অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান	যুক্তরাষ্ট্র	০১/০৭/১৯৬১
১৬৩	বব ডিলান	গায়ক ও সঙ্গীতকার	যুক্তরাষ্ট্র	২৫/০৫/১৯৪১
ক্র.নং	**নাম**	**পরিচয়**	**জন্মভুমি**	**জীবনকাল**
১৬৪	মাধুরী দীক্ষিত	অভিনেত্রী	ভারত	১৫/০৫/১৯৬৭
১৬৫	জুহি চাওলা	অভিনেত্রী	ভারত	১৩/১১/১৯৬৭
১৬৬	রোসানা আরকুয়েটে	অভিনেত্রী	যুক্তরাষ্ট্র	১০/০৮/১৯৫৯
১৬৭	অমিতাভ বচ্চন	অভিনেতা	ভারত	১১/১০/১৯৬৪
১৬৮	কিম বেসিনগার	অভিনেত্রী	যুক্তরাষ্ট্র	০৮/১২/১৯৫৩
১৬৯	অ্যাঞ্জেলা বাসেট	অভিনেত্রী	যুক্তরাষ্ট্র	১৬/০৮/১৯৫৮
১৭০	ইলজাবেথ বার্কলে	অভিনেত্রী	যুক্তরাষ্ট্র	২৮/০৭/১৯৭২
১৭১	লিন্ডা বে- য়ার	অভিনেত্রী	যুক্তরাষ্ট্র	২২/০১/১৯৫৯
১৭২	জুলি ক্রিস্টি	অভিনেত্রী	যুক্তরাষ্ট	১৪/০৪/১৯৪১
১৭৩	রাচায়েল লেই কুক	অভিনেত্রী	যুক্তরাষ্ট্র	০৪/১০/১৯৭৯
১৭৪	জেমস্ ক্রমওয়েল	অভিনেত্রী	যুক্তরাষ্ট্র	২৭/০১/১৯৪০
১৭৫	ডরিস ডে	অভিনেত্রী	যুক্তরাষ্ট্র	০৩/০৪/১৯২২
১৭৬	ডেভিড বুকোভনি	অভিনেতা	যুক্তরাষ্ট্র	০৭/০৮/১৯৬০
১৭৭	পিটার ফাল্ক	অভিনেতা	যুক্তরাষ্ট্র	১৬/০৯/১৯২৭
১৭৮	রিচার্ড গেরে	অভিনেতা	যুক্তরাষ্ট্র	৩১/০৮/১৯৪৯
১৭৯	এলিয়ট গুল্ড	অভিনেতা	যুক্তরাষ্ট্র	২৯/০৮/১৯৩৮
১৮০	ডেমি মুর	অভিনেত্রী	যুক্তরাষ্ট্র	১১/১১/১৯৬২
১৮১	অনিল কুম্বলে	ক্রিকেটার	ভারত	১৭/১০/১৯৭০
১৮২	বিল পার্ল	চার-বার মিস্টার ইউনিভার্স	যুক্তরাষ্ট্র	৩১/১০/১৯৬০
১৮৩	ফিওনা অ্যাপল	গায়িকা	যুক্তরাষ্ট্র	১৩/০৯/১৯৭৭
১৮৪	এরিকা বাদু	গায়িকা	যুক্তরাষ্ট্র	২৬/০২/১৯৭১

১৮৫	ব্রিজিত বার্দ্দোত	গায়িকা	ফ্রান্স	১৮/০৯/১৯৩৪
১৮৬	জেফ বেক্	সঙ্গীতকার	যুক্তরাজ্য	২৪/০৬/১৯৪৪
১৮৭	অ্যাডাম কারসন	সঙ্গীতকার	যুক্তরাষ্ট্র	০৫/০২/১৯৭৫
ক্র.নং	**নাম**	**পরিচয়**	**জন্মভুমি**	**জীবনকাল**
১৮৮	ফিল কলিন	সঙ্গীতকার	যুক্তরাজ্য	০৮/১২/১৯৫৭
১৮৯	কেভিন এপবাংকস	সঙ্গীতকার	যুক্তরাষ্ট্র	১৫/১১/১৯৫৭
১৯০	পিটার গাব্রিয়েল	সঙ্গীতকার	যুক্তরাজ্য	১৩/০২/১৯৫০
১৯১	রিচি হাবেনস	সঙ্গীতকার	যুক্তরাষ্ট্র	২১/০১/১৯৪১
১৯২	ক্রিসি হিন্ডে	সঙ্গীতকার	যুক্তরাষ্ট্র	০৭/০৯/১৯৫১
১৯৩	জ্যানেট জ্যাকসন	গায়িকা	যুক্তরাষ্ট্র	১৬/০৫/১৯৬৬
১৯৪	মিক্ জেগার	সঙ্গীতকার	যুক্তরাজ্য	২৬/০৭/১৯৪৩
১৯৫	অ্যান্থনী কিয়েডিস	সঙ্গীতকার	যুক্তরাষ্ট্র	০১/১১/১৯৬২
১৯৬	কেনি, লগইনস্	সঙ্গীতকার	যুক্তরাষ্ট্র	০৭/০১/১৯৪৮
১৯৭	পল ম্যাককার্টনী	সঙ্গীতকার	যুক্তরাজ্য	১৮/০৬/১৯৪২
১৯৮	কেডি লাংগ	সঙ্গীতকার	কানাডা	০২/১১/১৯৬১
১৯৯	বব বারকার	টিভি ব্যক্তিত্ব	যুক্তরাষ্ট্র	১২/১২/১৯২৩
২০০	ক্যাসি কাসেম	রেডিও ব্যক্তিত্ব	যুক্তরাষ্ট্র	২৭/০৪/১৯৩২

http://al.godsdirectcontact.org.tw/vg-vip
www.vegetarian-restaurant.com
www.gdc2.org/eng/news/178/vg-55.htm
www.en.wikipedia.org/wiki/list_of_veget

....হইতে সংগৃহীত

নিরামিষ ভোজন সম্পর্কে মহাগুরু-মহাসূফী রমিজের মতবাদ

স্রষ্টা তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে অতি উত্তম এবং সর্বাপেক্ষা স্রেষ্ট জাতী হিসেবে (আশরাফুল মাখলুকাত) সৃষ্টি করেছেন। মানুষের সাথে আল-াহর (স্রষ্টার) গভীর সম্পর্ক ও মমত্ব বোধের বিষয়ে হাদীসে কদ্‌সী-তে তিনি নিজেই এরশাদ করেন,

"আল্ ইন্‌ছানু সিররী ওয়া আনা সির্‌রুহু।"

অর্থ: মানুষ আমার রহস্য আর আমি মানুষের রহস্য।

এখানে, রহস্য বলতে বুঝায়- **দূর্বোধ্য গুপ্ততথ্য**। তাহলে স্রষ্টা মানুষকে (আদমকে) এতই পবিত্র ও সুন্দর গুনাবলী দিয়ে তাঁর নিজ ছুরতে এবং পছন্দমতে সৃষ্টি করেছেন, যে কারনে মানুষ তাঁর অতি কাছাকাছি চলেগেছে।

সৃষ্টির এ সেরা মানব জাতির সাথে স্রষ্টার অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে যে প্রভেদ তা হচ্ছে বিবেক। আর মুক্ত ও সুষ্ঠু বিবেকের অধিকারী যে বেক্তি জাতি ধর্ম নিরবিশেষে মানব সহ সকল প্রাণীকে ভালবাসতে পারেন তিনিই হচ্ছেন একজন ধার্মীক ও মহামানব। তাই, গুরুরমিজের মতে বিবেকশাস্ত্র মতে কোন প্রাণীকেই হত্যা করতঃ ইহার মাংস ভক্ষন করা সমীচীন নয়। কারন ***"সকল প্রণীই স্রষ্টার পরিজন"***। তাই, প্রাণী হত্যা করতঃ ইহার মাংস ভক্ষন করা বিবেক সম্মত হতে পারেনা।

গুরু রমিজ জীব বা প্রাণীর মাংস ভক্ষন না করে নিরামিষ ভোজনের জন্য তাঁর ভক্তদের আদেশ-উপদেশ দিয়েছেন। গুরু রমিজ কর্মবাদ ও পূনঃজন্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে পশুমাংস ভক্ষন করতে করতে মানুষের আত্মা ক্রমে ক্রমে পশুর স্বভাব ধারন করতঃ পশুর হিংস্র স্বভাবে পরিণত হয়। পরজন্মে উক্ত স্বভাবের আত্মা পশুদেহ ধারন করে পশুতে জন্ম নিয়ে দেহান্তরিত হয়।

গুরু রমিজের মতে, জীবে দয়া না থাকলে কেহ আত্মার মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করতে পরেন না। এমনকি প্রাণী হত্যা করে মানবের মুক্তি ও কল্যানের কামনাও করা যায় না। গুরু রমিজ তাঁর ভাষায় নিজেই বলেন,- ***"কর্মফল বিশ্বমাঝে যদি হয় সত্য,***

জীবে দয়া না থাকিলে কেহ নয় মুক্ত।"

পুন্য লাভের আশাঁয় কাবা শরীফে গমন করে উহার আওতাভুক্ত স্থানে কোন প্রকার প্রাণী হত্যা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মহা গুরু রমিজ সারা জীবন জীব হত্যা না করে নিজ দেহকে কাবা শরীফে রূপান্তরিত করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন।

গুরু রমিজ আজীবন নিরামিষ ভোজন করে সংযম পালন করতঃ স্রষ্টার আরাধনায় লিপ্ত থাকার জন্য তাঁর পন্থিদের উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর অনুশারীগণ কর্মফল, কর্মবাদ, পুনঃজন্মবাদ এবং মহাগুরু রমিজের আধ্যাত্মিক উপদেশকে স্মরণ রেখেই মুক্তি বা মোক্ষ লাভের জন্য আজীবন অবিরত নিরামিষ ভক্ষন করে থাকেন।

ত্রিবেণী ও নির্বাণ

সনাতন ধর্ম মতে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী-এ তিন নদীর মিলন অথবা বিচ্ছেদ স্থলকে ত্রিবেণী বলা হয়। উলে-খিত নদী বা স্রোতের মধ্যে বহু প্রাচীনকাল হতেই ভারত বর্ষের হিন্দু সম্প্রদায়ের ভক্তবৃন্ধ বিশেষ ক্ষণ বা তিথীতে স্নানাদি ও পূজা অর্চনা করে আসছেন। তাদের মতে ইহাতে ভক্তদের আশা-আকাঙ্খা পূরণ, পাপমোচন, রোগব্যাধি হতে পরিত্রাণ, দেহ-মন-হৃদয়-আত্মার পবিত্রতা ইত্যাদি লাভ করা যায়। ত্রিবেণীর ধারক ও বাহক মঙ্গলময়ী স্রষ্টার উদ্দেশ্যেই উক্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

কিন্তু মঙ্গলময়ী স্রষ্টাতো মহাবিশ্বের সর্বভূমে, সর্বভূতে, সর্বজীবে, সর্বত্র, সর্বক্ষণ বিরাজিত।

আত্মিক পবিত্রতা ও মুক্তির জন্য সকল মানুষেরই মঙ্গলময়ীর উদ্দেশ্যে ত্রিবেণীরূপ পবিত্র স্থানে নিত্য স্নান করা আবশ্যক।

তবে, প্রশ্ন থেকে যায় যে, কোথায় সেই ত্রিবেণী ? কোথায় তার অবস্থান ? কি সেই নির্দিষ্ট ক্ষণ বা তিথী ? স্নান করার সেই ঘাট-ই বা কোথায় ? পৃথিবীর মহামানবগণ আত্মিক দর্শনের মাধ্যমে সেই পবিত্র স্নানাগারের অবস্থান নিজের দেহের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন। অর্থাৎ, নিজ দেহের মধ্যেই উক্ত ত্রিবেণীর সন্ধান লাভ করেছেন। তারা আধ্যাত্মিক ধ্যানের মাধ্যমে জাগ্রত কিংবা ঘুমন্ত অবস্থায় সর্বদা চোখের জলে (ত্রিবেণীর জলে) সিক্ত থাকেন। তাঁরা স্রষ্টার প্রতি পরম প্রেম, পরম ভালবাসা ও পরম মমতারূপ আকর্ষণকে তিনটি নদী বা স্রোত হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই তিনটি আকর্ষণ একিভুত হয়ে হৃদয় নামক স্থানে মিলিত হয়েছে। দেহ, মন, আত্মা ও জ্ঞান সমাহারে স্রষ্টা হৃদয় ত্রিবেণী নামক স্থানে বাস করেন। স্রষ্টার প্রতি উক্ত পরম প্রেম, পরম ভালবাসা ও মমতায় আবদ্ধ হয়ে অনুতাপের মাধ্যমে যে চোখের জল নির্গত হয় সেই চোখকেই ত্রিবেণীর ঘাট বলা হয়েছে। প্রেমের কোন নির্দিষ্ট সময় বা তিথী থাকে না।

যিনি উক্ত ত্রিবেণীর ঘাটে সর্বদা স্নান করেন অর্থাৎ যিনি স্রষ্টার প্রতি সর্বদা প্রেম, ভালবাসা ও মায়াতে অনর্গল চোখের জল দ্বারা সিক্ত হয়ে অনুতাপ করতঃ কুপ্রবৃত্তি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন তিনিই নিষ্পাপে পরিণত হতে পারেন।

মহাশক্তি খন্দকার রমিজের মতে, এ অবস্থায় স্রষ্টার প্রতি নিগূঢ় ধ্যানের মাধ্যমে আত্মিক অনুভূতি সঞ্চার হয়, ইহা হইতে আত্মার ইচ্ছাশক্তি সৃষ্টি হয় এবং এর ধারাবাহিকতায়-ই সূক্ষ্ম হৃদয়ে আমিত্বহীন এক প্রকান্ড স্বভাব ফুটে উঠে। লোকালয়ের মাঝেই অলৌকিকভাবে হৃদয়ের মধ্যে পরম আত্মার পরমত্ব (Absolute Being) বিকাশ ঘটে। বিলীন হয়ে যায় জীবত্ববোধ (Animality)। মানব তখন মহামানবে পরিণত হয়ে যায়। দৈহিক ইন্দ্রিয়াদি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্রষ্ঠাভিমুখী অতীন্দ্রিয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। অতীন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এলহাম, ওহী, এলমেলাদুন্নী, দৈববাণী, ব্রহ্মযোগ, ধ্যানযোগ (Meditation) ইত্যাদির মাধ্যমে পরম স্রষ্টার সাথে যোগাযোগ হয়ে যায়। পৃথিবীর সকল ধর্মমতের সংশি- ষ্ট মতবাদের নবী/রাসূল/ধর্মাবতার/ মহাপুর ষ/মণি-ঋষি প্রত্যেকেই উলে- াখিত উপায়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরম কর ণাময় স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করেছেন এবং ঐশ্বীবাণী প্রাপ্ত হয়েছেন। যুগে যুগে বা যুগ-যুগান্তরে মহামানবগনের উক্ত বাণী সমাহারে যুগোপযোগী মতবাদ মানব কল্যাণে ও অজ্ঞতা হতে মুক্তির জন্য প্রচারিত হয়েছে। প্রত্যেকটি মতবাদই সংশি- ষ্ট সময় বা যুগের জন্য সমকালীন মানবগোষ্ঠীর সম্পূর্ণ জীবনাদর্শ (Complete Code of life) ছিল।

উক্ত জীবনাদর্শের প্রেক্ষিতে স্রষ্টা প্রেমিক মানবগণ কোন প্রকার কাম- ক্রোধ-লোভ ইত্যাদি এবং মহাশক্তি রমিজ নির্দেশিত একাদশ ধরণের পাপ দ্বারা কোনক্রমেই স্পর্শিত হতে পারেন না। এই নিষ্পাপ (নিষ্কলুশ চরিত্র গঠিত) অবস্থায় পরিণত হওয়াকে বৌদ্ব ধর্ম মতে নির্বাণ, সনাতন ধর্ম মতে অহংব্রহ্মস্মি (আমি-ই সেই পরম ব্রহ্ম), ইসলাম ধর্ম মতে ফানাফিল- াহ্, বাকাবিল- াহ্ (আল- াহ্তে বিলীন), আনআল্ হক (আমি হক বা আমি সত্য) ইত্যাদিতে পর্যায়ভুক্ত বলা হয়।

এখানে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক ধর্ম বা সম্প্রদায়-ই অজ্ঞানতা থেকে মুক্তিলাভ, ভববন্ধন থেকে পরিত্রাণ লাভ, জীবন মুক্তি বা নির্বাণ চায়। ইসলামের সূফী সাধকগণ পূর্বোলি- খিত স্রষ্টার প্রতি নিগূঢ় প্রেম, পরম ভালবাসা ও পরম মমতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরম আনন্দময় সত্বার সান্নিধ্য লাভ করে থাকেন। এ সূফী মতবাদকে ইসলামী মরমীয়াবাদ (Islamic mysticism) বা ইসলামী অতীন্দ্রিয়বাদ বলা হয়। মরমীয়া বলতে ধর্মাদির বাইরের আড়ম্বর বর্জন পূর্বক তার মর্মোদঘাটনে প্রচেষ্টাকারী (Mystic) কে বুঝায়। আর মরমীয়া সাধক বলতে সাধারণ বুদ্ধির অতীত গূঢ় ঐশ্বরিক তত্ত্ব বিষয়ক অতীন্দ্রিয় বিষয়বোধ সমর্থ ব্যক্তিকে বুঝায়।

মহাগুর রমিজ অতীন্দ্রিয়বাদী ছিলেন। অতীন্দ্রিয়বাদের দৃষ্টান্ত হিসেবে মহাশক্তি রমিজ স্বপ্ন, এলহাম, ওহী, দৈববাণী ইত্যাদির বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন।

অতীন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মহামানবগণ স্রষ্টার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতঃ মিলন করে থাকেন।

স্রষ্টার সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলনেই মানবের একমাত্র স্বার্থকতা এ মিলন বুদ্ধির অতীত স্তরের কোন জ্ঞান প্রসূত বা কোন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম বা যাগযজ্ঞ নয়। ইহা একান্তভাবে হৃদয়াবেগ প্রসূত। একমাত্র প্রেমই স্রষ্টা ও মানুষের পরিপূর্ণ মিলনের সেতু। এ মিলনে সানুষের ব্যক্তিগত স্বত্ত্বা ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়ে ঐশ্বরিক স্বত্ত্বায় পরিণত হয়।

কেবল তখনই মানুষ নিজেকে নির্বাণ ভববন্ধন থেকে মুক্ত, ফানাফিল- াহ্, বাকাবিল- াহ্, আমি সত্য, আমি সেই পরম ব্রহ্ম, সত্যে পরিণত বলে আখ্যায়িত করাতে পারেন। স্রষ্ঠা আদি-মধ্য–অনু-অনন্ত সর্বদা সর্বভূতে সর্বজীবে বিরাজিত- ইহা একটি সর্ববাদী সম্মত সত্য। আবার মানুষ সর্বজীব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। কারণ বিজ্ঞান, দর্শন এবং সর্ব ধর্মের সর্বসম্মত মতামত অনুসারে মানুষই সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। স্বয়ং স্রষ্টা প্রথম মানব আদম (আদি মানব) সৃষ্টিলগ্নে তার র হ্ (আত্মা) আদি মানবের ভিতর (ক্বাল্ব বা হৃদয়ে) ফুকে দেন। এ বিষয়টি আধ্যাত্মিকভাবে বিশে- ষণ করলে কেবলমাত্র একটি সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, আত্মারূপে স্বয়ং স্রষ্টা আদমের হৃদয়ে (ক্বলব্) এ স্থান

করে নিয়েছেন। স্রষ্টা নিজ আত্মার মাধ্যমে আদি মানবের পূর্বে তৈরী করা জড়দেহের ভিতর প্রবেশ করা মাত্রই অবচেতন জড়দেহ তাৎক্ষণিকভাবে চৈতন্যময় সত্ত্বাধারণ পূর্বক দেহ-মন-হৃদয়-আত্মা-জ্ঞান-ইন্দ্রিয়-অতীন্দ্রিয় ইত্যাদি সমাহারে অনন্ত শক্তিধর নররূপে (আদম ... ইত্যাদি নামে) বিকাশ লাভ করেন। কোরআন, বাইবেল, সনাতন ধর্ম ইত্যাদি পড়লে এবং গবেষণা বা বিশে- ষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, স্রষ্টা যুগ-যুগান্তরে মহামানবগণের সাথে কথা বলেছেন এবং কণ্ঠস্বর মানব কণ্ঠের অনুরূপ। অর্থাৎ এখানে প্রতীয়মান হয় যে, স্রষ্টা এবং আদম নররূপে একই শক্তি। তার মানে হচ্ছে ***যিনি স্রষ্টা তিনিই আদম***। আমরা সবাই আদম সন্তান এবং আদমের জাত পাক। আমরা স্রষ্টা হতে সৃষ্টি হয়ে আদম রূপে বংশ পরমপরায় ভূমে এসেছি আবার কর্মের মাধ্যমে স্রষ্টায় বিলীন হয়ে যাওয়াই কাম্য। নদ, নদী, উপনদী ইত্যাদি শেষ পর্যন্ত সাগর মহাসাগরে বিলীন হয়ে যায় তেমনি সকল মানুষেরই গন্তব্যস্থল হচ্ছে স্রষ্টাতে বিলীন হওয়া। আর তার জন্য সর্ব প্রথম কাজটি হচ্ছে স্রষ্টার সাথে বন্ধুতা সৃষ্টি করা। আত্মার সাথে আত্মার বন্ধুতা। সে বন্ধুতার একমাত্র সেতু বন্ধনের ধারাবাহিকতা ১ম-মায়া, ২য়-ভালবাসা এবং সর্বশেষ হলো প্রেম।

মানুষ যখন স্রষ্টার প্রেমে মগ্ন হয়ে যান তখন সকল মানুষ, সর্বজীবের এবং সর্ব সৃষ্টির জন্য এক অনন্ত দয়া হৃদয়ে ধারণ করতঃ অনর্গল চোখের ধারা বহিতে থাকে। এই অনর্গল চোখের জল হৃদয় হতেই নির্গত হয়। মহাশক্তি রমিজ হৃদয়কে ত্রিবেণী নদী আখ্যায়িত করেছেন এবং অশ্রুসিক্ত দু'চোখকে তিনি ত্রিবেণীর ঘাট বলেছেন। মানবরূপে আত্মার ভুলের কারণে অহরহ অনুতাপের মাধ্যমে চোখের জল নির্গত হওয়াকে তিনি ত্রিবেণীর ঘাটে আত্মশুদ্ধির জন্য স্নান করাকে ইঙ্গিত করেছেন।

রমিজের ভাষায়- ***"ত্রিবেণীর ঘাটে যেবা নিত্য স্নান করে,***

কোটি কোটি পাপে তারে গ্রাসিতে না পারে।
হৃদয় ত্রিবেণী নদী, ঘাট হল তার আঁখি,
সেই জলেতে স্নান কর স্রষ্টা তোমার সাক্ষী"।

ত্রিবেণী সম্মন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো। ত্রিবেণীতে স্নান করা বা স্রষ্টার উদ্দেশ্যে চোখের জল বিসর্জন করার জন্য মহাশক্তি রমিজ বিভিন্নভাবে তাঁর উপদেশ ও বাণীতে সুস্পষ্টভাবে উলে- খ করেছেন।

এগুলোর কিয়দংশ নিম্নে উদৃত্ব করা হলো ঃ

০১। বাণী নং- ২৩ অলৌকিক সুধা ঃ *না পাই যদি তোমার দরশন .....* *.....* *(৪) বন্ধুরে রমিজ কয় দিন নাইরে বাকী,* *কখন জানি দেয় ফাঁকি, সেই কথা রাখিও স্মরণ।* *বন্ধুর প্রেমে যেইজন মরা, সদায় বহে যার নয়ন ধারা রে,* *একদিন হবে তাঁর সঙ্গে মিলন।*	*০২। বাণী নং- ২৮-অলৌকিক সুধা ঃ* *বন্ধু বিনে কে আছে আর বলরে সুবল .....* *.....* *(৫) সুবলরে, রমিজ কয় সে থাকেগো ধারে,* *চিনিয়া না চিন তাঁরে গো,* *বাঁধ তারে ভক্তির ডোরে রে সুবল,* *চরণে দিয়া চোক্ষের জল।*

০৩। বাণী নং- ৩৪ -অলৌকিক সুধা ঃ
আমি অপরাধী নিরবধিরে বন্ধু,.....
.....
(৩) বন্ধুরে আমি তোর পিরীতে মরা,
সদায় বহে নয়ন ধারা রে,
আর কেহ নাই তুমি ছাড়া রে বন্ধু,
কত মন্দ লোকে গায়।

০৪। বাণী নং- ৩৫- অলৌকিক সুধা ঃ
দয়াল বন্ধুরে তুই বলে দে আমারে .....
.....
(২) বন্ধুরে যাহা আছে সব দিয়াছি, দিতে পারবেনা ফিরে,
পাই না পাই আছি আশায়, বুক ভাসাব নীরে।

০৫। বাণী নং- ৪০- অলৌকিক সুধা ঃ
আমার প্রেম বাদী কাল ননদী বন্ধু .....
.....
(৪) বন্ধুরে রমিজ কয় তোর প্রেমে যারা, কলংক হার জগৎ জোড়া
সদায় নয়নের ধারা রে বন্ধু, আশায় তাঁর জীবন যায়।

০৬। বাণী নং- ৪১- অলৌকিক সুধা ঃ
ডাকি আমি বন্ধুরে .....
.....
(২) বন্ধুরে আমি কেঁদে কেঁদে হলেম সারা
প্রাণ বাঁচে কি তুমি ছাড়ারে,
একিরে পিরীতের ধারা পুড়ে হলেম আঙ্গেরা
মন প্রাণ করিলা হরণ।

০৭। বাণী নং- ৪৫- অলৌকিক সুধা ঃ
খুঁজি যারে এ সংসারে .....
.....
(৬) বন্ধুরে রমিজ কয় তাঁর নাই ঠিকানা,
দেখতে চাইলে দেখা দেয়না
বুঝেনা কেউ তাঁর বাহানা,
কাঁদাইয়া সে রঙ্গ চায়।

০৮। বাণী নং- ৪৬- অলৌকিক সুধা ঃ
খুজি যারে পাইনা তারে .....
.....
(২) বন্ধুরে যে জন তোরে ভালবাসে
তারে কাঁদাও দেশে দেশে রে,
দোষী আমি হলেম কিসে জানাও মোরে জানি না।

০৯। বাণী নং- ৪৭- অলৌকিক সুধা ঃ
যার জন্য মোর প্রাণ কাঁদে দিবা নিশি নিরালায় .....
.....
(০৫) বন্ধুরে তোর প্রেমেতে পরে যারা, তারে কর গৃহ ছাড়া রে,
তার দু'নয়নে বহে ধারা কাঁদিয়া তার দিন যায়।

১০। বাণী নং- ৪৮- অলৌকিক সুধা ঃ
আমি অপরাধী নিরবধি গো সখি .....
.....
(০১) সখিগো তাঁর সাথে প্রেম করা জীয়ন্তে সে হয় মরাগো,
সদায় বহে নয়ন ধারা গো সখি কত মন্দ লোকে গায়।

১১। বাণী নং-৪৯- অলৌকিক সুধা ঃ
যারে আমি তালাশ করি .....
.....

১৫। বাণী নং-৭৯- স্বর্গের সুধা ঃ
আর কারে জানাবি তোর বেদন সজনি-গো....
.....

(০৪) বন্ধুরে পাইনা পাই যাবনা ভুলে
তোমার নামের মালা দিয়েছি গলে রে,
চরণ ধুইব মোর নয়ন জলে,
যদি একদিন পাই তোমায়।

১২। বাণী নং- ৫০- অলৌকিক সুধা ঃ
আমি দোষী ভব মাঝে গো সখি .....
.....
(০১) সখিগো কলঙ্ক গায় ঘরে ঘরে, কোথায় গেলে পাব তারে গো
চিনিনা সে থাকে ধারে গো সখি, কাদাঁইয়া সে রঙ্গ চায়।

১৩। বাণী নং- ৫১- অলৌকিক সুধা ঃ
অতি সাধের ভালবাসা রে বন্ধু .....
(০৫) বন্ধুরে একিরে তোর ভালবাসা, না পুরাইলা মন আশা রে,
কাদাঁইয়া দেখ তামাসা রে বন্ধু কত মন্দ লোকে গায়।

১৪। বাণী নং-৭৩- স্বর্গের সুধা ঃ
হায়রে ব্যাথা জানাব কারে .....
(০৩) সখী গো, রমিজ কয় অন্তরের ব্যাথা, রাখিয়া অন্তরে ।
নয়নের জল করি সম্বল, জানাও শ্যাম বন্ধুরে।

(০৪) সখী গো, রমিজ কয় নয়নের জল গো,
এই মাত্র রাখিও সম্বল গো;
তাঁর চরণে দিও ঐ চক্ষের জল গো সখি,
একদিন পাবি দরশন।

১৬। বাণী নং-৮৫- স্বর্গের সুধা ঃ
আমার দুঃখ জানাও তারে সজনী গো .....
.....
(০৩) সখি গো, রমিজ কয় তার চরণ তলে গো,
জানাও দুঃখ কাতরে গো;
পাও না পাও ভুলনা তারে গো সখি,
বুক ভাসাও আখিঁ নীরে।

১৭। বাণী নং-১০০- স্বর্গের সুধা ঃ
কে আছে আর শ্যাম বন্ধুয়া বিনে, প্রাণ সখী গো
.....
(০৩) সখী গো, রমিজ কয় তার সকল জানা,
তারে ছাড়া নাই আপনা; মন ব্যাথা সে বিনে কে জানে।
যত ব্যাথা মনে আছে, জানাও শ্যাম বন্ধুয়ার কাছে;
নয়নের জল দিয়া তার চরণে।

১৮। বাণী নং-১৪৬- স্বর্গের সুধা ঃ
আমি না দেখিলে বাঁচিনা পরাণে বন্ধু রে
.....
(০৩) বন্ধুরে রমিজ কয় হৃদয়ে রাখি,
নয়ন জলে নাম লেখি অ বন্ধুরে;
যত দুঃখ জানাও তাঁর চরণে বন্ধুরে

১৯। বাণী নং-১৬৩- স্বর্গের সুধা ঃ
আমার সাথে কেন তার ছলনা বন্ধুরে
.....
(০৪) রমিজ কয় করবেনা ছল,
নয়নের জল কর সম্বল অ বন্ধুরে;
ধুইয়ে দিও চরণ দুইখানা বন্ধুরে।

২২। বাণী নং-১৮০- স্বর্গে আরোহণ ঃ
খুঁজিয়া কেন দেখা পাইলাম না- দ্বীন বন্ধুরে
.....
(০৩) রমিজ বলে যত ব্যাথা, অন্তরেতে রাখ গাথা রে;
সব কথা আছে তার জানা, মনে প্রাণে যে চায় তারে,
তারে কাঁদায় বারে বারে; গৃহ ছাড়া করে দেওয়ানা।

২৩। বাণী নং-২০২- স্বর্গে আরোহণ ঃ

২০। *বাণী নং-১৪০- স্বর্গে আরোহণ ঃ* *কইও যেন একবার আসে ফিরে রে-* *.....* *(০৩) রমিজ বলে আসলে ফিরে, চরণ ধুইও আঁখি নীরে রে;* *তারে জাগা দিও হৃদয় মাঝারে রে।* ২১। *বাণী নং-১৫৮- স্বর্গে আরোহন ঃ* *বল তারে পাব কোন খানে প্রাণ সখী গো-* *.....* *(০৩) রমিজ বলে মনে প্রাণে, বিকাও জীবন তার চরণে গো,* *চরণ ধুইও নয়ন জলে, দয়া হবে তার মনে।*	*কত জ্বালা তোমার প্রেমে রে, পারিনা বলিতে বন্ধুরে-* *.....* *(০৩) রমিজ বলে ভুলিওনা জীবন থাকিতে অ বন্ধুরে;* *নয়নের জল করি সম্বল রে, দিও চরণেতে বন্ধুরে।* ২৪। *বাণী নং-২২৯- স্বর্গে আরোহণ ঃ* *সামনে থাকো দেখব আমি রে, বাঁচি যতক্ষন বন্ধুরে-* *তোমার প্রেমে কেন কাঁদে মন।* *(০১) বুঝাইলে বুঝেনা মন, কেবল উচাটন অ বন্ধুরে,* *সদায় নয়নের ধারারে, আমার কে করবে বারণ*

উপরোক্ত বাণীগুলোর উদ্ধৃতাংশ হতে সুস্পষ্টভাবে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মহাগুর" রমিজের সাধনার প্রধান অনুপম হচ্ছে, আত্মার ভুল সংশোধন করার নিমিত্তে পাপ ও পাপাচার-হতে মুক্তিলাভ করার জন্য বিশ্ব স্রষ্টার কাছে আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে, হৃদয় নিংড়ানো অনুতাপজনিত কান্নার বহিঃপ্রকাশ করা।

স্রষ্ঠার নিকট সর্বপাপ মাফ চাওয়ার সর্বধর্ম, সর্বপথ ও সর্বস্তরের সর্বসম্মত সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে-সর্বশ্রেষ্ঠ পরম স্রষ্ঠার কাছে অনুতাপজনিত কান্নার-অশ্র" ঝরানো।

মহাগুর" রমিজ প্রণীত তিনটি বাণীর পুস্তকে মুদ্রিত বাণীগুলোর মধ্যে বিচ্ছেদ, বাউল, স্তুতি, শ্যামা, ধ্র"পদী, তত্ত্বমূলক ইত্যাদি বাণীগুলো মনোযোগ সহকারে পড়লে মনে হয় প্রত্যেকটি বাণীর প্রত্যেকটি বাক্যে প্রত্যেকটি শব্দে রমিজের অনুতাপ মিশ্রিত কান্নার বাস্তব কর"ণ সুর এখনো শোনা যায়। মনে হয়, তিনি যেন অনুতাপের কান্নাজনিত অশ্র"জলের মহাসাগরে ভাসমান অবস্থায় আছেন।

সকল ভক্তের সর্বপাপ গ্রহণ করতঃ তিনি নিজকে মহাপাপী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার অনেক বাণীতে তিনি যে মহাপাপী তা উলে- খ করেছেন এবং স্রষ্ঠার নিকট পাপ মুক্তির কান্নাজড়িত আবেদন করেছেন।

পাপ মোচন করার নিমিত্তে মহাগুরু রমিজ ভক্তদের সর্বপাপ গ্রহণ করতঃ মহাপাপী ভক্তরূপ ধারণ করে দয়াময়ী পরম স্রষ্টার নিকট স্তুতি বাণীর মাধ্যমে ক্ষমার আবেদন করতেন। এ আবেদনকে তিনি তাঁর দায়িত্ব ও কর্ম বলে মনে করতেন।

উক্ত স্তুতি বাণীগুলোর একটি হলো আমার ব্যাথা আর জানাবো কারে বন্ধুয়ারে তুমি বিনে কে আছে সংসারে।

১। বন্ধুরে, তুমিত অনন্তরূপী, আছ তুমি সর্ব্ব ব্যাপী;
জান তুমি যা আছে অন্তরে বন্ধুরে। আমি শত দোষের দোষী,
চরণ আশে আছি বসি রে, চরণ ছাড়া কইরনা আমারে।

২। বন্ধুরে, আমি মহাপাপী এ ভবে, কবে তোমার কৃপা হবে;
কবে আমি যাব তোমার ধারে বন্ধুরে। দয়া কর দ্বীন হীনে,
কেহ নাই আর তুমি বিনে রে; পারের কান্ডারী পার কর আমারে।

৩। বন্ধুরে, তুমিত আশ্রয় দাতা, আরও তুমি সৃষ্টির পিতা;
তোমার আরাধনা করে ঘরে ঘরে বন্ধুরে।
রমিজ বলে দোষ যত আর আমি জানাব কত,
তুমি ক্ষমা করি জানাইও দাসেরে।

বাণী-৬০ (স্বর্গের সুধা)

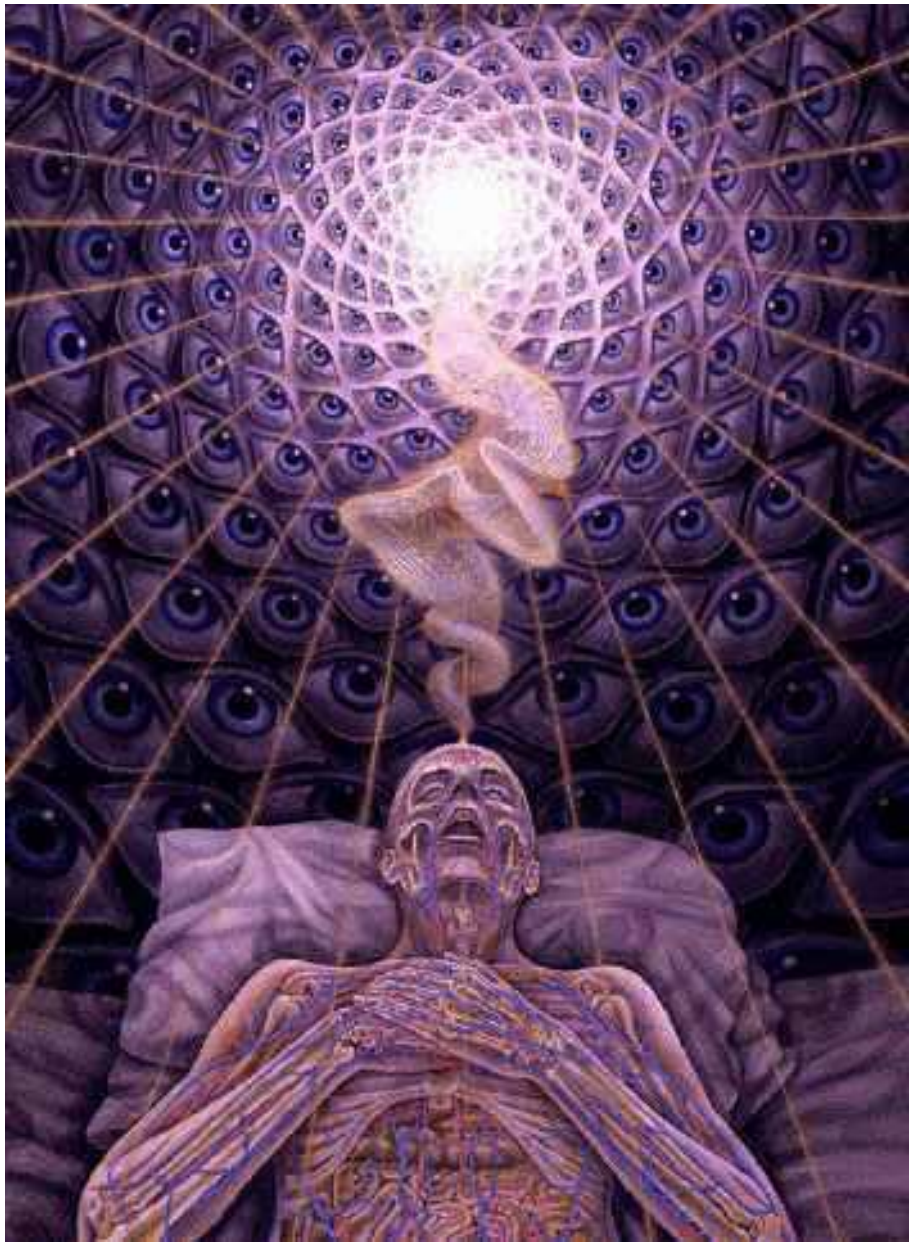

পুনর্জন্ম (Reincarnation)

ভূমিকা:
'পুনর্জন্ম' (আভিধানিক অর্থে-পুনরায় উৎপত্তি বা জন্ম বা দেহপ্রাপ্ত হওয়া বা মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মলাভ) তখনই ঘটে বলে বিশ্বাস করা হয়। যখন দৈহিক মৃত্যুর পর ''আত্মা (Soul)'' অন্য আরেকটি দেহপ্রাপ্ত হয়ে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসে। এই মতবাদটি অধিকাংশ ভারতীয় ধর্ম (যেমন- হিন্দু ও জৈন ধর্ম) সমূহের প্রথা বা ঐতিহ্যের একটি কেন্দ্রীয় নীতি হিসেবে পরিগণিত হয়।

পুনর্জন্মে বিশ্বাসের রয়েছে আদি ভিত্তি। প্রাচীন প্রমূখ গ্রীক দার্শনিকগণ এই মতবাদ পোষন করতেন। বহুসংখ্যক আধুনিক নিওপাগান (Neopagan- খ্রীষ্টান, ইহুদী, ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মের লোক), অধ্যাত্মবাদের অনুসারীগণ, নির্দিষ্ট কিছু আফ্রিকান ঐহিত্যের অনুশীলনকারী, অলৌকিক দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষাবিদ (যেমন-Kabbalah) এবং নস্টিক (Gnostic) ও গুপ্তকৃষ্টবাদী (Esoteric Christianity)-গণও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন। পুনর্জন্ম সংক্রান্ত বৌদ্ধ ধর্মীয় মতবাদ স্পষ্টতই হিন্দু প্রথা এবং অন্যান্য ঐতিহ্য হতে এজন্য পৃথক হয় যে, বৌদ্ধমতে পুনর্জাত হওয়ার মত কোন পরম বা অপরিবর্তনীয় আত্মা বলতে কিছু নেই।

সাম্প্রতিক দশকে পশ্চিমা বিশ্বে উলে-খযোগ্য সংখ্যক মানুষের মধ্যে পুনর্জন্মে বিশ্বাসের ধারণাটি বিকাশ লাভ করেছে। এমনকি চলচ্চিত্র ও অধুনা জনপ্রিয় অনেক সঙ্গীতেই পুনর্জন্মের কথা উলে-খিত আছে। বিংশ শতাব্দীর শুর" হতে সংগৃহীত কিছু প্রমাণের ভিত্তিতে মিডিয়া (Media) এর কিছু উৎস পুনর্জন্মকে একটি প্রমাণিত বাস্তবতা হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছে।

১. *প্রাচ্যের ধর্ম ও ঐতিহ্য:*

কিরূপে একটি নির্দিষ্ট প্রথায় বা গোত্রে পুনর্জন্মবাদকে দেহ ও তার সাথে পরম বা অপরিবর্তনীয় আত্মার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সংক্রান্ত প্রাচ্যের দার্শনিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের রয়েছে একটি সরাসরি সম্পর্ক।

ভারতে সম্ভবতঃ সর্ব প্রথম আর্যপূর্ব অবৈদিক কৃষ্টিতে পুনর্জন্মের মতবাদটি (কর্ম, মোক্ষ ইত্যাদিসহ) বিকাশ লাভ করে, যাদের আধ্যাত্মিক নীতি সমূহ পরবর্তীতে ভারত বর্ষের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণাকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম হলো এই প্রথারই ধারাবাহিকতা এবং এর দ্বারা প্রাচীন উপনিষদীয় আন্দোলন প্রভাবিত হয়েছে। এই ধর্মীয় সংস্কৃতি হতে পুনর্জন্মবাদ গোড়া ব্রাহ্মণদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে এবং প্রাচীন উপনিষদ সমূহে ব্রাহ্মণরা এসব ধারণা সম্বলিত রচনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

১.১ *বৌদ্ধ ধর্ম:*

ধর্ম পুস্তক অনুসারে সিদ্ধার্থ, গৌতম, পুনর্জন্ম সম্পর্কিত এমন একটি মতবাদ শিক্ষা দিয়েছেন যা সমসাময়িক খ্যাতিমান যে কোন ভারতীয় শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত মতবাদ অপেক্ষা ভিন্ন। এই মতবাদ ''বহুকাল যাবৎ বিস্তৃত পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত পর্যায়ক্রমিক জীবন ধারা আছে'' এমন সাধারণ বিশ্বাসের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু দুটি বৌদ্ধীয় মতবাদ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে যেমন ''অনাত্মা'' অর্থাৎ এই জীবন সমূহকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করে এমন কোন অপরিবর্তনীয় ''আত্মা'' বা ''সত্ত্বার'' অস্তিত্ব নাই এবং অনিক্কা অর্থাৎ যে কোন যৌগিক বস্তুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, ব্যক্তি মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং তার ব্যক্তিত্বও ইহার অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তির মৃত্যুতে আরেকজন নতুন জন্মগ্রহণ করে; যেমন করে নিভু নিভু মোমবাতি আরেকটি নতুন মোমবাতিকে প্রজ্জলিত করে।

যেহেতু বৌদ্ধ ধর্মমতে পরম ও অপরিবর্তনীয় কোন আত্মা বা সত্ত্বা নেই, সেহেতু মৃত্যুর পর আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তিরও কোন অবকাশ নেই। বৌদ্ধ ধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে, যার পুনর্জন্ম হয় তা কোন ব্যক্তি নয়, বরং সে-ই একটি মুহূর্ত আরেকটিকে জাগ্রত করে এবং এই অবস্থা চলমান থাকে, এমনকি মৃত্যুর পরেও। এটা প্রচলিত পুনর্জন্মবাদ অপেক্ষা একটু বেশী সূক্ষ্মতর মতবাদ। যা কি না বৌদ্ধীয় ''পরমত্ব বর্জিত ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি'' (Concept of Personality Existing), এমনকি কারো জীবদ্দশায়ও-এর ধারণাকে প্রতিফলিত করে। একটি নির্দিষ্ট সত্ত্বার পরিবর্তে যার পুনর্জন্ম হয় তা হলো একটি ''বিবর্তিত চেতনা'' অথবা চেতনার ধারা যার বৈশিষ্ট্য 'কর্ম' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

বৌদ্ধ ধর্ম এই ইঙ্গিত দেয় যে, Samsara (সামসারা) বা 'পুনর্জন্মের পদ্ধতি' পাঁচ বা ছয়টি অস্তিত্বের পরিধি অতিক্রমনের পর সংগঠিত হয়। বস্তুতঃ তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্মমতে কারো পক্ষে ঠিক পরবর্তী জীবনে মানুষ হয়ে জন্মলাভ করা অত্যন্ত বিরল। এটা নির্ভর করে তাদের প্রচ্ছন্ন কর্মশক্তির (Seed -বীজ, আদিকারণ) উপর যা তারা তাদের কর্ম দ্বারা সৃষ্টি করেছে এবং মৃত্যুকালীন তাদের মানসিক অবস্থার উপর। যদি আমরা প্রশান্ত মনে মৃত্যুবরণ করি তবে তা একটি পবিত্র ভ্রূন বা বীজ উৎপাদনে উৎসাহিত করে এবং আমরা একটি শুভ পুনর্জন্ম অনুভব করবো। কিন্তু যদি আমরা অশান্ত মন নিয়ে মৃত্যুবরণ করি (যেমন ক্রুদ্ধ অবস্থায়) তবে তা অশুভ ভ্রূন বা বীজের জন্ম দিবে এবং আমরা একটি অশুভ পুনর্জন্ম অনুভব করবো। এটা অনেকটা ঘুমিয়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে মন অশান্ত থাকলে যেমন দুঃস্বপ্ন দেখায় সে রকম। নাস্তিক বিজ্ঞানী কার্লসাগান দালাইলামাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, যদি তার ধর্মের প্রতি একটি মৌলিক মতবাদ (পুনর্জন্ম) বিজ্ঞান দ্বারা অপ্রমাণিত হয়, তবে তিনি কি করবেন ? দালাইলামা উত্তর দেন ''যদি বিজ্ঞান পুনর্জন্মবাদকে অপ্রমাণ করে তবে তিব্বতীয় বৌদ্ধরা পুনর্জন্মকে নিষিদ্ধ করবে। তবে পুনর্জন্মবাদকে অপ্রমাণিত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ হবে''।

১.২ *হিন্দু ধর্ম:*

হিন্দু ধর্মমতে আত্মা অমর। যদিও দেহ জন্ম ও মৃত্যুর অধীন। ভাগবতগীতায় উলে- খ আছে (জীর্ণ পোষাক দেহ দ্বারা পরিত্যাক্ত হয়, জীর্ণ দেহ দেহের অভ্যন্তরস্থ বাসিন্দা দ্বারা বিসর্জিত হয়। সেই বাসিন্দা নতুন দেহ পরিধান করে অনেকটা পোষাকের মত। (পঃশি ২ঃ২)।

যে কোন চেতনা সমৃদ্ধ জীবের পুনর্জন্মের ধারণাটি জটিলভাবে 'কর্মবাদের' সাথে সম্পর্কযুক্ত। যে মতবাদ প্রথমে উপনিষদে লিপিবদ্ধ আরেকটি নীতি। কর্ম (আভিধানিক অর্থ-কার্য) হলো কারো কার্যের সমষ্টি এবং সেই বল বা শক্তি যা তার পরবর্তী জন্মগ্রহণকে নির্ধারিত করে। কর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মৃত্যু ও পুনর্জন্মের এই চক্রকে বলা হয় সামসারা (Samsara)।

জ্ঞানী ব্যক্তি মৃত বা জীবিতের জন্য কখনো সুখ করেন না। এই রাজগণ, তুমি ও আমি-আমরা সকলেই পূর্বে ছিলাম, এখনো আছি, পরেও থাকিবো। (শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, অধ্যায়-২, শে- াক-১১-১২)।

হিন্দু ধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে, আত্মা জন্ম ও মৃত্যুর বাহ্যিক চক্রকে অনুস্মরণ করে ক্রমান্বয়ে এক দেহ হতে অন্য দেহে অতিক্রান্ত হয়। একজন ব্যক্তি পুনর্জন্ম গ্রহণ করে তার ইচ্ছার কারণে। পার্থিব সুখ ও আনন্দ উপভোগ করার জন্য একজন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করতে চায়, যা শুধুমাত্র শরীর বা দেহের মাধ্যমেই উপভোগ করা সম্ভব। ''সকল পার্থিব সুখই পাপ জর্জরিত''- হিন্দু ধর্মে এই শিক্ষা দেয় না। কিন্তু তারা কখনোই গভীর ও স্থায়ী আনন্দ ও শান্তি আনয়ন করতে পারে না-এই মত পোষন করে। হিন্দু-ঋষি আদি সংকরাচার্য্যের মতে পৃথিবী বলতে সাধারণভাবে আমরা যা বুঝি তা একটি স্বপ্নের মতো, ক্ষণস্থায়ী ও মায়াময়। সামসারা বা জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে জড়িয়ে যাওয়া হলো আমাদের ''অস্তিত্বের প্রকৃত রূপ'' বা ''আত্মতত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফল স্বরূপ''।

অনেক জন্ম অতিক্রমের পর সকল মানুষই পার্থিব আনন্দ দ্বারা আনিত সীমিত সুখ-স্বাচ্ছন্দের প্রতি অবশেষে অতৃপ্ত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি সুখের উচ্চতর অবয়বের সন্ধান করা শুর" করে, যা কি না একমাত্র আধ্যাত্মিক সাধনা দ্বারাই অর্জন করা যায়। যখন পর্যাপ্ত আধ্যাত্মিক সাধনার পর একজন মানুষ তার স্বীয় অনুপম বা পবিত্র প্রকৃতিকে অনুধাবন করে বা আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করে (অর্থাৎ যখন সে অনুধাবন করে যে, সেল্ফ বা নিজ হলো তার পরমাত্মা, তার দেহ বা অহম নয়) তখন পার্থিব আনন্দের সকল ইচ্ছাই দূর হয়ে যাবে, কেননা আধ্যাত্মিক আনন্দের তুলনায় সেগুলো নিরস বা নিষ্প্রভ মনে হবে। যখন সকল কামনা বা বাসনা দূর হয়ে যাবে তখন সেই ব্যক্তির আর পুনর্জন্ম হবে না।

যখন পুনর্জন্মের এই চক্রটি শেষ হয়ে যায় তখন বলা হয় যে, ব্যক্তিটি ''মোক্ষ'' অর্জন করেছে বা সামসারা হতে পরিত্রান লাভ করেছে। যদিও চিন্তাবিদরা ''মোক্ষ'' অর্জন বলতে পার্থিব আকাঙ্খা বা ইচ্ছা হতে এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র হতে মুক্তি অর্জন করা-এইমর্মে একমত হয়েছেন তবুও মুক্তির সঠিক সংজ্ঞা ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। উদাহরণ স্বরূপ অদ্যৈত ভেদান্ত বিদ্যাপীঠের ভক্তবৃন্দ বিশ্বাস করেন যে, তারা নিখাঁদ শান্তি ও সুখে গভীরভাবে অভিনিবিষ্ট হয়ে অনন্তকাল কাটাবেন-যা এই অনুধাবন হতে সৃষ্ট হয় যে, ''সকল অস্তিত্ব এক (ব্রহ্মা)'' এবং পরমাত্মা এই অস্তিত্বের অংশ। অপরপক্ষে, পূর্ণ বা আংশিক দ্বৈত বিদ্যাপীঠের ভক্তবৃন্দ, ঈশ্বরের পবিত্র সহচর্যে ''আধ্যাত্মিক রাজ্যে'' বা স্বর্গে অনন্তকাল যাপনের নিমিত্তে আরাধনা করে থাকেন (যথা বৈষ্ণবদের জন্য কৃষ্ণ বা বিষ্ণু এবং শৈববাদের দ্বৈত বিদ্যাপীঠের অনুসারীদের জন্য শিব)। আদি হিন্দু দেবতারা হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং তাদের স্ত্রী যথাক্রমে স্বরসতী, লক্ষ্মী এবং পার্বতী। ব্রহ্মা এবং স্বরসতী পূর্বজন্ম সংক্রান্ত কোন লিপি বিরল হলেও অন্যান্য দেব-দেবীরা বিভিন্ন গঠনে বা আকারে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পুনর্জাত হয়েছিলেন। দেবতা বিষ্ণু তার দশটি পুনর্জন্মের জন্য বিখ্যাত যার নাম 'দশাবতার'।

১.৩ *জৈন ধর্ম:*

জৈন ধর্মে কিভাবে দেবতারাও মৃত্যুর পরে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় তা বিশেষভাবে উলে-খিত হয়েছে। একজন জৈনবাদী ব্যক্তি যদি যথেষ্ঠ পরিমাণ ভাল কর্ম তার কর্মখাতায় জড়ো করেন, তবে তিনি দেবতা হতে পারেন, কিন্তু সাধারণতঃ এই ঘটনাকে অপ্রত্যাশিত হিসেবেই দেখা হয়, কেননা পরিশেষে দেবতারা মৃত্যুবরণ করে এবং পরবর্তীতে তাদের মধ্যে কেউ ক্ষুদ্রতর প্রাণীতে জন্ম নিতে পারে। যেমন হিন্দু ধর্মের আরো কয়েকটি পাঠশালায় এই মতবাদ বিদ্যমান আছে।

১.৪ *শিখ ধর্ম:*

শিখ ধর্মানুসারীরা বিশ্বাস করে যে, প্রতিটি প্রাণীর রয়েছে আত্মা, মৃত্যুতে এই আত্মা এক দেহ হতে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হয়, যতক্ষন পর্যন্ত তা মুক্তি লাভ না করে। আত্মার এই পরিভ্রমন জীবিত থাকাকালীন আমাদের কার্যাবলী বা কর্ম দ্বারা নির্ধারিত হয়। যদি আমরা ভাল কর্ম সাধন করি এবং স্রষ্টাকে স্মরণ করি তবে আমরা উত্তম জীবন লাভ করবো। অন্যদিকে আমরা যদি অসৎ ও পাপপূর্ণ কর্ম সম্পাদন করি, তবে নিম্নতর প্রাণীতে জন্মগ্রহণ করবো, যেমন-সর্প, সিংহ, জেব্রা, বানর, জলহস্তি ইত্যাদি।

নিশ্চিতভাবে একজন ব্যক্তির কর্মের ফলাফল থাকবেই। ভাল এবং খারাপ উভয়ই। পার্থিব কোন শক্তিই এর গতিবিধির পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু শিখ দর্শন অনুসারে, সর্ব শক্তিমান স্রষ্টা তাঁর কৃপাগুণে কোন ব্যক্তির ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিতে পারেন এবং তাকে দুঃখ-কষ্টের যন্ত্রনা হতে মুক্তিদান করতে পারেন। সোজা কথায়, পুনর্জন্ম হলো 'কারণ' ও 'ফলাফলের' নিয়ম বা রীতি স্বরূপ, পুনর্জন্ম মানুষের মধ্যে কোন পৃথক সামাজিক শ্রেণী বা জাতভেদ অথবা পার্থক্য সৃষ্টি করে না। অতীত ও বর্তমান জীবনের কর্মাবলী একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর প্রাধান্য বা সম্বন্ধ স্থাপন করে। পুনর্জন্ম কোনভাবেই একজনকে অন্যজন হতে শ্রেষ্ঠতর করে না।

১.৫ *তাওধর্ম মত (Taoism):*

হান রাজ বংশের সমসাময়িক তাওবাদী দলিলাদি দাবী করে যে, লাওযু তিন শাসনকর্তা এবং পাঁচ সম্রাট (Three Sovereings and Five Emperors) এর পৌরাণিক যুগের শুরুতে পৃথক ব্যক্তি হিসেবে বিভিন্ন পর্যায়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। চুয়াংজু (খ্রীঃপূঃ ৩য় দশক) বর্ণনা করেছেন ''জন্মলাভ কোন কিছুর সূচনা নয়, মৃত্যুবরণ সমাপ্তি নয়। সীমানা বিহীন অস্তিত্ব আছে; সূচনা-বিন্দু বিহীন নিরবিচ্ছিন্নতা বিদ্যমান। সীমাবদ্ধতা বিহীন অস্তিত্ব রয়েছে শূন্য স্থানের (Space)। সূচনা-বিন্দু বিহীন নিরবিচ্ছিন্নতা হলো সময় (Time)। জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, রয়েছে বহির্মূখী প্রবাহ, রয়েছে অন্তরমূখী প্রবেশন।

২. *পাশ্চাত্য ধর্ম ও ঐতিহ্য:*

প্রাচীন গ্রীক দর্শন: পাশ্চাত্য ঐতিহ্যে পুনর্জন্মের একটি আদি উদাহরণ পাওয়া যায়। ষষ্ঠ ও চতুর্থ খ্রীঃপূঃ এর অর্ফিক বা ডিওনিসাস গুপ্তধর্মমতে, যেখানে বলা হয়েছে, মানব দেহে বায়ূর মাধ্যমে আত্মা প্রবেশ করানো হয় এবং তার ধারক বা মানুষ 'দানবিক উত্তরাধিকার' (Titan Heritage) হতে প্রাপ্ত পাপ সমূহের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবে। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে সম্ভবতঃ সক্রেটিস, পিথাগোরাস এবং পে-টো পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করতেন বা শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিছু প্রাচীন সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, পিথাগোরাস দাবী করতেন তিনি তার অতীত জীবন স্মরণ করতে পারতেন। পিথাগোরীও দর্শন এবং পুনর্জন্মবাদের মধ্যে একটি সম্মিলন প্রাচীনকালের জনসমাজের মধ্যে সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছিল। পে-টোর ফাইদো (Plato's Phaedo) ডায়লগে বর্ণিত আছে যে, সক্রেটিস তার মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন, ''আমি নিশ্চিত যে, পুনরায় জন্মধারণ করার মত সত্যই কোন ব্যাপার রয়েছে, এবং মৃত হতেই জীবিত উদ্গাত হয়''। পে-টো তার প্রধান রচনাগুলোতে পুনর্জন্মের বিস্তরিত বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। মিথ অব আর (Myth of Er) সে রকমই একটি রচনা। সৃষ্টিতত্ত্বীয় এবং অধ্যাত্মবাদ সংক্রান্ত একটি গ্রীক-মিশরীয় ধারাবাহিক রচনা 'Hermetica' তে পুনর্জন্মবাদ হলো প্রধান এবং মূল বিষয়।

খ্রীষ্টবাদ:

সংখ্যাগুর ্ মূল ধারার খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায় পুনর্জন্মের ধারণা বা বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বাইবেলে উলে- খিত যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষার সহিত অসংগত বলে দাবী করেছেন।

যাই হোক, খ্রীষ্টিয় পটভূমি হতে বের হয়ে আসা অনেক ধর্মপ্রচারক এখন এসব দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করছেন। নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক গীর্জা পরোক্ষভাবে মৃত্যু সম্বন্ধে শিক্ষাদানকালে পুনর্জন্মবাদের বিষয়টি উত্থাপন করে থাকেন। কিছু বাইবেলীয় উদ্ধৃতি বা বর্ণনা বা যুক্তিযুক্ত বিশোধনের সম্মুখীন হয়ে টিকতে পেরেছে এবং খ্রীষ্টবাদের প্রাথমিক পর্যায়ে গীর্জায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচলিত ধর্মমতের বির ্দ্ধবাদী হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল-উহাদেরকে কেউ কেউ ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিশদ ব্যাখ্যার জন্য উম্মুক্ত বলে বিবেচনা করে থাকেন। পুনর্জন্মবাদ আদিতে খ্রীষ্টিয় গীর্জায় পঠিত হয়েছিল-এই ব্যাপারে কিছু সংখ্যক খ্রীষ্টান বিবাদ করে থাকেন, কিন্তু পক্ষপাতিত্ব ও ভুল অনুবাদের কারণে উক্ত পাঠ সমূহ হারিয়ে গেছে বা অজ্ঞাত রয়েছে। পুনর্জন্মের মতবাদের সাথে সংশি- ষ্ট অনেক দর্শন চিরমুক্তি বা নির্বাণ মুক্তি লাভের পূর্বে কোন একটা ধরণের উচ্চতর জ্ঞান বা বোধন অর্জন বা সততা বা উৎকর্ষতার কোন অবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্তে 'কর্মসাধন' বা পান্ডিত্যের উপর জোর দিয়েছে। প্রচলিত খ্রীষ্ট ধর্মে মৌলিক মতবাদ এই যে, ঈশ্বর যে রকম পূর্ণতা বা শ্রেষ্ঠত্ব চায় মানুষ কখনোই সে রকম অর্জন করতে পারে না এবং যীশুর ঈশ্বরের নিকট সর্বস্ব অর্পণের নিমিত্তে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মানবাত্মার সমস্ত পাপ গ্রহণ করে পরিপূর্ণ ক্ষমা (Forgiveness) অর্জন বা লাভই হলো একমাত্র নির্বাণ মুক্তি লাভ। যাই হোক, Sethians এবং Gnostic Church of Velentinus এর অনুসারীদের মতো কিছু সংখ্যক প্রারম্ভিক খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায় পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতেন এমন প্রমাণ আছে বলে মনে হয় এবং এ কারণে তারা রোমনদের হাতে নির্যাতিত এবং নিগৃহীত হয়েছিল।

বহুসংখ্যক মৌলবাদী খ্রীষ্টান পুনর্জন্মের সাথে ইঙ্গিতপূর্ণ যে কোন ঘটনাকে মূলতঃ শয়তানের প্রবঞ্চনা বা চাতুরী হিসেবে মনে করে থাকেন। যদিও বাইবেলে কখনোই পুনর্জন্ম (Reincarnation) শব্দটির উলে- খ নাই। তথাপি নিওটেস্টামেন্ট পুস্তকের বিভিন্ন অংশে এমন বক্তব্য রয়েছে যা পুনর্জন্ম বা স্বর্গ ও নরকে থাকা আত্মা বা Soul সমূহের পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যার্পণ বা পৃথিবীর কোন ধরণের যোগাযোগের সম্ভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করে (দ্রষ্টব্য ঃ হিব্র ্ ৯ঃ২৭)। আবার নিওটেস্টামেন্টে পরোক্ষভাবে পুনর্জন্মের কথা উলে- খিত হয়েছে। ম্যাথু'র ১১ঃ১০-১৪ এবং ১৭ঃ১০-১৩ জন এর ১ঃ২১-তে উলে- খ রয়েছে যে, ইহুদীরা ব্যাপ্টিস্ট (Baptist) জনকে জিজ্ঞেস করছেন যে, তিনি এলিজা (Elija) কি না এবং প্রত্যুত্তরে জন স্পষ্ট করে বলেছেন যে, তিনি তা নন, যা প্রকাশ করে যে, যীশুর নির্দেশনা ছিলো আলংকারিক (যা বেশীরভাগ খ্রীষ্টানেরা গ্রহণ করে থাকেন)। এ কথা উলে- খ্য যে, এলিজা বস্তুতঃ মৃত্যুবরণই করেননি, বরং দৈহিকভাবে তাকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। মেরীর জ্যেষ্ঠপুত্র যীশু ছিলেন মৃত অবস্থা হতে জীবিত হিসেবে উত্থান হওয়া প্রথম মানব, দৃশ্যতঃ এটা মৃত্যুর উপর তার নিয়ন্ত্রনকে প্রতিফলিত করে। একে একটি অস্বাভাবিক জন্মগ্রহণ হিসেবে নেওয়া যায়, পুনর্জন্ম নয়।

খ্রীষ্টবাদ এবং পুনর্জন্মকে পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত করার জন্য সমসাময়িককালে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। গেদ্দেস গ্রেগর একটি বই লিখেছিলেন যার নাম "Reincarnation in christianity: A new Vision of Rebirth" এবং প্রথম দিকের গীর্জায় পাদ্রিরা পুনর্জন্ম বিষয়ে শিক্ষা দিতেন-এমন অভিমত প্রকাশ করেছেন তিনি। র ্ডল্ফ (স্টইনার লিখেছিলেন- Christiaity as Mystical Fact এবং টমাসো পালামিদেসি লিখেছিলেন- "Memory of Past Lives and it's Technique" -যেখানে পূর্ব জন্মের স্মৃতি সমূহের পুনর ্দ্ধারে সম্ভাব্য সহায়তার জন্য রয়েছে নানা পদ্ধতির উলে- খ।

ইহুদীবাদ:

যেখানে পে- টোর মতো প্রাচীন গ্রীক্ দার্শণিকেরা দর্শণ শাস্ত্র ভিত্তিক প্রমাণের মাধ্যমে পুনর্জন্মের অস্তিত্বকে প্রমাণ করার চেষ্টায় ছিলেন, সেখানে পুনর্জন্মে বিশ্বাসী ইহুদী অধ্যাত্মবাদীরা এই মতবাদকে ঐশ্বরিক বা স্বর্গীয় বাস্তবতাকে গ্রহণ করেছিলেন।

যদিও ধর্মগ্রন্থ ট্যালমাড্ (Talmud) বা পূর্ববর্তী কোন রচনায় পুনর্জন্মের কোন উলে- খ নাই তদুপরি র‍্যাবি (Rabbi ইহুদী পন্ডিত) -দের মতে (যেমন- র‍্যাবি আব্রাহাম, আরিয়েহ, ট্রাগম্যান) পুনর্জন্মবাদ ইহুদী ঐহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে চিহ্নিত। ইহুদী অধ্যাত্মবাদের ক্ল্যাসিক রচনা যোহার (Zohar) যার মূল পটভূমি দুই হাজার বছর পুরোনো তা সকল ইহুদী শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বাধীনভাবে পঠিত বা উদ্ধৃত হয়েছে। জোহার কিতাবে পুনর্জন্মের পুনঃ পুনঃ উলে- খিত হয়েছে। র‍্যাবি ট্রাগম্যান বলেছেন যে, বিগত পাঁচ শতাব্দীতে পুনর্জন্মের মতবাদকে (যা কি না তখন পর্যন্ত ইহুদীবাদে গুপ্ততর মতবাদ হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল) অনাবৃত অবস্থা প্রদান করা হয়েছিল।

র‍্যাবি স্রাগা সিমনস্ মন্তব্য করেছিলেন যে, স্বয়ং বাইবেলই পুনর্জন্মের ধারণা অঙ্কিত ছিলো- যেমন ডিউট ২৫:৫-১০; ডিউট ৩৩:৬ এবং ঈসাইয়াহ্ ২২:১৪, ৬৫:৬। র‍্যাবি ইরমিইয়াহু উল্ম্যান লিখেছেন ''পুনর্জন্মবাদ হলো ইহুদীবাদের একটি প্রাচীন ও মূলধারার বিশ্বাস'। র‍্যাবি সিমন্ বার ইয়োচাই কর্তৃক লিখিত দুই হাজার বছর পুরোনো কিতাব যোহারে বারংবার ও বিস্তারিতভাবে পুনর্জন্মের কথা বলা হয়েছে। ''রিউবেন (Reuben) -কে বাঁচতে দাও, মরতে নয় ...'' (ডিউটারেনমি ৩৩:৬) -এই পংক্তিটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অংকেল্স (Onkeles) একজন ধর্ম পরায়ণ ব্যক্তি বলেছেন যে, রিউবেন সরাসরি পৃথিবীতে আসার জন্য যোগ্য এবং তাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করার জন্য আবারো মরতে হবে না। বিখ্যাত Torah স্কলার নাচমানিদেস (রামবান্ ১১৯৫-১২৭০), যব (Job) এর ভোগান্তিকে তার পুনর্জন্মের কারণ স্বরূপ চিহ্নিত করে যব এর-ই ভাষায় বলেছেন, ''ঈশ্বর এমন কাজ কোন ব্যক্তির সাথে দুই থেকে তিনবার করে থাকেন তার আত্মাকে নরকের অতল স্পর্শেই গহ্বর থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য ... জীবিতদের আলোকময় জীবনে।'' জব ৩৩:২৯, ৩০।

গিলগুল নামে পরিচিত পুনর্জন্মবাদ গ্রাম্য সমাজে জনপ্রিয় হয়েছিল এবং এ্যাসকেনাজি ইহুদীদের মধ্যে ইদ্দিস সাহিত্যে বেশী দেখা দিয়েছিলো। কিছু সংখ্যক কাব্যালিস্ট (Kabbalist) -দের মধ্যে এ কথা প্রচলিত ছিলো যে, *কোন কোন মানবাত্মা অমানবীয় দেহে পুনর্জাত হতে পারে।* এসব ধারণাগুলো দ্বাদশ শতাব্দীর কিছু কাব্যালিস্ট রচনায় এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর কিছু অতীন্দ্রিয়বাদী রচনায় পরিলক্ষিত হয়েছিলো। মার্টিন বুবারের 'বালসাম টভ' -এর জীবণী সংক্রান্ত গল্প সমগ্রে মানুষের আনুক্রমিক জীবনে পুনর্জাত -এর কথা উলে- খিত আছে।

বর্তমানের অধিকাংশ ইহুদীগণ পুনর্জন্মে বিশ্বাস না করলেও এই মতবাদটি মৌলবাদী ইহুদীদের মধ্যে অপ্রচলিত নয়। গোঁড়া ইহুদীবাদীদের বেশীরভাগ প্রার্থনা কিতাবে এমন একটি উপাসনা রয়েছে যেখানে কোন একজনের পূর্নজন্মের কৃত সম্ভাব্য পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়।

ইসলাম ধর্ম:

‘দাওরিআহ’ (Cycle-চক্র) মতবাদটির পুনর্জন্মবাদের সাথে সমানুতা মূলক বহুদিক রয়েছে; দাবী করা হয় যে, ইসলামের মূল ধর্মগ্রন্থ কোরআনে এই মতবাদের উলে-খ রয়েছে ঃ ‘‘কেমন করে তোমরা আল-াহ্‌র ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছো ? অথচ তোমরা ছিলে নিস্প্রাণ। অতঃপর তোমাদেরকে প্রাণদান করেছেন। আবারো মৃত্যুদান করবেন। পুনরায় তোমাদেরকে জীবনদান করবেন। অতঃপর তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে’’ (আল-কোরআন ২ঃ২৮)।

কিছু সংখ্যক সূফীবাদী দল মত প্রকাশ করেছেন যে, ইসলামী ঐতিহ্যে কবি ও অধ্যাত্মবাদীরা এই মতবাদের চর্চা করেছেনঃ

‘‘আমি মরেছি খনিজ হিসেবে; এবং জন্মেছি বৃক্ষে,
বৃক্ষ হয়ে মরেছিলাম এবং উত্থিত হয়েছি প্রাণীতে,
আমি প্রাণী হয়ে মরেছি এবং মানবেতে জন্মেছি।
কি কারণে ভয় পাবো?
কখন আমি মৃত্যুর দ্বারা ক্ষুদ্রতর হয়েছিলাম ?’’

-(রুমি পারস্য কবি)।

আধুনিক সূফীদের মধ্যে যারা পুনর্জন্মবাদকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম বাওয়া মুহাইদ্দিন (দ্রঃ তাঁর রচিত: (To Die Before Death : The Sufi Way of Life) তবে হযরত ইনায়েত খান পুনর্জন্মবাদের ধারণা আধ্যাত্মিক সাধকদের খোদার সান্নিধ্য লাভের অনুসন্ধানকে বাধাগ্রস্থ করে বলে তার সমালোচনা করেছেন। কারণ এটা আধ্যাত্মিক উচ্চস্তর প্রার্থীদের মনোযোগ বর্তমান মুহূর্তে উৎকর্ষ লাভের পরিবর্তে তার অতীত এবং ভবিষ্যতের দিকে বেশী নজর দেওয়ায়।

কোরআনের আরো একটি বাণী যা সম্ভবতঃ পুনর্জন্মবাদের ধারণাকে সমর্থন করে, তাহলো ঃ ‘‘তুমি রাতকে দিনের ভিতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তুমি জীবিতকে মৃতের ভিতর থেকে বের করে আনো এবং মৃতকে জীবিতের ভিতর থেকে বের করো। আর তুমি যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করো।’’ (কোরআন-৩ঃ২৭)

জোরোয়াস্ট্রার ধর্মমত (Zoroastrianism):

জোরোয়াস্ট্রার শিষ্যরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে না। এই ধর্মের বিশ্বাসীরা মানে যে, মৃত্যুর তিন দিন পরে আত্মার চূড়ান্ত বিচার হয়ে থাকে। তারা ফ্রাসোকেরেটি (Frashokereti) -তে বিশ্বাস করে যেই মতবাদ অনুযায়ী, *পৃথিবীর পরিসমাপ্তি হবে এবং মাটি চিরে পাহাড়ের গহ্‌বর হতে ধাতু ও খনিজ পদার্থ উদ্গাত হবে। স্বর্গে বসবাসকারী উত্তম কর্মসাধনকারী আত্মার নিকট তা গরম দুধের মতো মনে হবে এবং নরকে বসবাসরত নিকৃষ্ট কর্মসাধনকারী আত্মার নিকট তা ধারালো পাথরের মতো মনে হবে।*

রোমুভা (Romuva):

লিথুয়ানিয়ার রোমুভা গোত্রের অন্তর্ভুক্তরা পুনর্জন্মকে মৃত্যুর পর অস্তিত্বের সবচেয়ে সম্ভাব্য গঠন হিসেবে গ্রহণ করেন।

৩. <u>সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গি:</u>

প্রকৃতিবাদী পুনর্জন্ম দর্শন:

নব্বইয়ের দশকে যুক্ত রাষ্ট্রের দার্শনিক এবং ''Center for naturalism'' এর প্রতিষ্ঠাতা টমাস ডবি- উ ক্লার্ক ''মৃত্যু শূন্যতা এবং অধ্যাত্মবাদ" (Death nothingness and subjectivity) শিরোনামে একটি রচনা প্রকাশ করেন যেখানে তিনি প্রকৃতিবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি রূপ ব্যাখ্যা করেন। এই মতবাদ প্রথাগত পুনর্জন্মবাদ হতে পৃথক। যেখানে ''অতি প্রাকৃতিক আত্মা" (Supernatural Soul)-এর অস্তিত্ব নির্দেশিত হয়েছে। ক্লার্ক এই মতবাদকে "জাতিগত আত্মিক ধারাবহিকতা" (Generic subjective continuity) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। রচনাটির প্রথমে Humanist ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। পুনঃ প্রকাশিত হয় "The Experience of philosophy" ম্যাগাজিনে এবং অন-লাইনে www.naturalism.org/death.html এই ঠিকানায়।

আধুনিক চিন্তাবিদ:

রেনেসাঁ'র সময়ে পুনর্জন্মবাদ জনগণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইতালীর প্রধান দার্শনিক ও কবি গিওরদানো ব্রুনো, যাকে *পুনর্জন্ম সম্বন্ধে শিক্ষাদানের অভিযোগে রোমান আদালতে পুড়িয়ে মারার শাস্তি দান করা হয়।* জার্মান সাহিত্যের ক্লাসিক্যাল যুগে পুনর্জন্মবাদ অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলো। প্রমূখ উলে- খযোগ্য সাহিত্যবিদরা হলেন গোয়েথে, লেসিং, চার্লস্ বনেট, হার্দার।

আইরিশ কবি ও নোবেল লরেট উইলিয়াম বাটলার ও ইয়াটস্ তাঁর রচিত গুপ্ত প্রবন্ধ **'A Vision'** এ পুনর্জন্মের একটি অসাধারণ তত্ত্ব প্রস্তাব করেন। ইয়াটস্ এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পুনর্জন্ম সময়ের কোন সরল রৈখিক কাঠামোতে ঘটে থাকে না।

১৯৪৬ সালে নোবেল বিজয়ী হার্মান হেশে পুনর্জন্মকে অবিরত ধারায় পরিবর্তনের মধ্যবর্তী *''স্থিরত্বের দশা"* হিসেবে উলে- খ করেছেন।

আনথ্রপোসোফি (Anthroposophy):

পুনর্জন্ম রুডলফ স্টেইনার কর্তৃক আবিস্কৃত Anthroposophy নামক একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলনের মতবাদ সমূহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্টেইনার বর্ণনা করেছেন যে, মানব আত্মা প্রতিটি যুগে এবং বিভিন্ন বর্ণ বা জাতিতে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে। পরম ব্যক্তিত্ব কেবল দেহের জেনেটিক ঐতিহ্যের প্রতিফলনই নয় (তার দুর্বলতা ও সামর্থ্য সমূহ সহকারে)। তাঁর মতে একজন ব্যক্তির চরিত্র তার পূর্ববর্তী জন্ম সমূহের দ্বারাই নির্দিষ্ট হয়ে থাকে।

আনথ্রোপোসোফি মতবাদ অনুযায়ী বর্তমান (Present) কাল গঠিত হয় অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যবর্তী একটি পীড়ন (tension) হতে। উভয়ই আমাদের বর্তমান নিয়তিকে প্রভাবিত করে; এমন ঘটনা আছে যা আমাদের অতীত কর্মকান্ডের কারণে গঠিত হয়, কিন্তু এমন ঘটনাও আছে যা আমাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুত করতে ঘটে থাকে। এই দু'য়ের মাঝে মানুষের "স্বাধীন ইচ্ছা" (Free will) এর জন্য স্থান রয়েছে; আমরা নিজেরা আমাদের নিয়তিকে সৃষ্টি করি।

আনথ্রোপোসোফি পুনর্জীবন সমূহ এবং মানুষের গভীর স্বভাব বা প্রকৃতিকে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের আধ্যাত্মিক অনুশীলন আবিস্কার করেছে।

ব্রহ্মজ্ঞান (Theosophy):

ভারত বর্ষ হতে বেশীরভাগ অনুপ্রেরণাপ্রাপ্ত ব্রহ্মবাদী ধর্মীয় সম্প্রদায় ছিলো পশ্চিমা বিশ্বে। পুনর্জন্মের মতবাদ বহুদূর ব্যাপিয়া ছড়ানোর জন্য দায়ী আধুনিক সময়ের প্রথম প্রতিষ্ঠান। কর্মবাদ ও আধ্যাত্মিক বিবর্তনবাদ এর মত পুনর্জন্মকেও তারা তাদের একটি মৌলিক মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সাম্প্রতিক কালের একজন ব্রহ্মবাদী লেখকের মতানুযায়ী এটাই হলো আধুনিক সমস্যাবলীর মিমাংসা করার সাধারণ সূত্র -যেমন, বংশগতি (Heredity) । ব্রহ্মবাদী দৃষ্টিতে মানুষের মধ্যে নিহিত আত্মা হলো বস্তুতঃ বিশুদ্ধ বা নিখাঁদ, কিন্তু এতে রয়েছে আত্মচেতনা (আত্মতত্ত্বজ্ঞান) এর অভাব এবং তার ক্ষমতা থাকে প্রচ্ছন্ন। পুনর্জন্ম হলো সেই সুবিস্তৃত ছন্দময় পদ্বতি যার দ্বারা মানুষের মধ্যে নিহিত আত্মা বাস্তব পৃথিবীতে তার আধ্যাত্মিক ক্ষমতার উৎঘাটন করে এবং নিজকে নিজে চিনার জন্য প্রেরণা লাভ করে।

প্রথমতঃ আত্মা তার মহান, মুক্ত আধ্যাত্মিক জগত থেকে একটি শিশুর দৈহিক গঠন ধারণ করে পৃথিবীতে অবতরন করে। মানব দেহের আকৃতিতে জীবন যাপন কালে এই আত্মা পার্থিব জগতে নিজেকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার জন্য অভিজ্ঞতা জড়ো করতে থাকে। জীবনকালের সমাপ্তির পরে রয়েছে বাহ্যিক পৃথিবীকে প্রত্যাহার করে অস্তিত্বের উচ্চতর স্তরে পৌছানো, মৃত্যুর মাধ্যমে। পূর্ব জীবনের অভিজ্ঞতা হতে প্রাপ্ত জ্ঞান বা বোধনের বিশোধন এবং আত্মিকরণ এই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। অবশেষে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সকল ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান বা ছাড়িয়া দেওয়ার পরে, এটা পুনরায় তার আধ্যাত্মিক এবং আকার বিহীন প্রকৃতিকে ধারণ করে। এই প্রক্রিয়া শেষ হলে পরে আত্মাটি তার পরবর্তী ছন্দময় অভিব্যক্তি শুর" করতে প্রস্তুত হয় এবং তার আধ্যাত্মিক প্রকৃতির উন্মোচন ও তার পবিত্র সত্ত্বার আত্মজ্ঞান অর্জন করার নিমিত্তে নতুন প্রচেষ্টায় বস্তু জগতে আবির্ভুত হয়।

এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশাল সময়কাল যার অন্তর্ভুক্ত, প্রচলিত জীবনকাল (Lifetime) -এর সীমা হলো প্রকৃত আধ্যাত্মিক মানব সত্ত্বার জীবনকালের একদিনের সমান। এই আধ্যাত্মিক সত্তা একটি বিশাল যাত্রায় বের হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়, প্রতিটি জীবনকাল আত্মতত্ত্বজ্ঞান এবং স্বীয় অনুভূতির অভিব্যক্তিতে সম্পূর্ণ করার জন্য এই আত্মার নিকট আনয়ন করে। অতএব, দিব্যজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান অনুযায়ী যা পুনর্জাত হয় তা মানুষের একটি অংশ যা আকারবিহীন, অপার্থিব এবং অসীম কোন বিশ্বের অন্তর্গত। যার পুনর্জন্ম হবে তার বাহ্যিক দেহ এবং তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যাবলী নয়, ব্যক্তিগত পছন্দ ও অপছন্দ সহকারে তার আবেগময় স্বভাবও নয়, জমাকৃত জ্ঞান ও চিন্তা করার রীতি সহকারে তার মানসিক অবস্থাও নয়। তারই পুনর্জন্ম হয় যার উপরোক্ত বিষয়াবলীর উর্দ্ধে তেমন কিছু। যাই হোক, যখন একটি মানুষের আকারবিহীন অস্তিত্ব পুনর্জন্মের প্রক্রিয়া শুর" করে তখন তা নতুন সত্ত্বা বা ব্যক্তিত্বকে গঠনের জন্য পূর্ববর্তী মানসিক, ভাবোদ্দীপক এবং উদ্যোমশীল কর্মীর দৃষ্টান্ত সমূহকে আকর্ষণ করে। এভাবে আত্মাটি পূর্ববর্তী জীবন সমূহের সময়কালে এবং মৃত্যু পরবর্তী আত্মিকরণ বা উপলব্দি করণ পদ্বতির সহায়তায় প্রাপ্ত ক্ষমতা সহকারে পূর্ববর্তী জীবনকালের প্রতিবন্ধকতা বা বাধা সমূহের সম্মুখীন হয়।

-উৎস: http://en.wikipedia.org/wiki/reincarnation

রমিজের মতবাদ

মহাগুরু রমিজের মতে কর্মবাদের সাথে পুনঃজন্মবাদের একটি নিগুঢ় সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের কর্মের সাথে কর্মফলের যেমন সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি কর্মফলের সাথে পুনঃজন্মের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এই কর্মফলের সাথে পুনঃজন্মের সম্পর্কের বিষয়ে গুরু রমিজ তাঁর "অলৌকিক সুধা ও সত্যের অনুসন্ধান" নামক গ্রন্থের এক নং বাণীতে দৃষ্টান্ত সহকারে উলে-খ করেছেন। এই বাণীতে তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন যে, পৃথিবীতে কেউ কানা, কেউ লেংড়া, কেউ খেতে পায়না আবার কেউ করে আমীরানা। মানব সৃষ্টির মাঝে একের সাথে আরেকের এত প্রভেদ বা পার্থক্য হবে কেন ইহাই তাঁর প্রশ্ন।

অধিকন্তু বাণী ছাড়াও তিনি মৌখিক ভাবে যুক্তি দেখাতেন যে, এক-ই পরিবারের এক-ই পিতা-মাতার ঔরসজাত হয়েও সন্তানদের মধ্যে প্রভেদ বা পার্থক্য পওয়া যায়। এমনকি একে অপরের বিপরীতও হয়ে থাকে। সন্তানদের মধ্যে এমন পার্থক্যও পওয়া যায় যে, কারো সাথে কারো কোন দিক থেকে-ই মিল থাকে না। এখানেও তাঁর প্রশ্ন হলো, কেন এমটি হবে?

এ বিষয়টি আলোচনা-পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কারো মতে বিধাতা ইচ্ছা করে এরকম করেছেন। আবার কারো মতে বিধাতার নিকট হতে এরকমটি চেয়ে আনা হয়েছে। কোন কোন লোক এ জাতীয় সমাধান দিয়ে থাকেন। তবে, উভয় সমাধানের পক্ষে-ই কোন যুক্তি দাঁড় করানো যায় না। অর্থাৎ যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়না।

গুরু রমিজ বলছেন, জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী হলে যুক্তি দ্বারা দেখানো যায় যে, পুর্বজন্মের কৃত কর্মের ফলেই বর্তমান জন্মে মানবদেহের আকার, বর্ণ, আচরণ, শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা, আর্থিক-অনার্থিক ইত্যাদি অর্জন করে থাকে। এই বিষয়গুলোর জন্যে স্রষ্টা বা পিতা-মাতা অথবা অন্য কোন সত্ত্বাকে দায়ী করা সঠিক নয়।

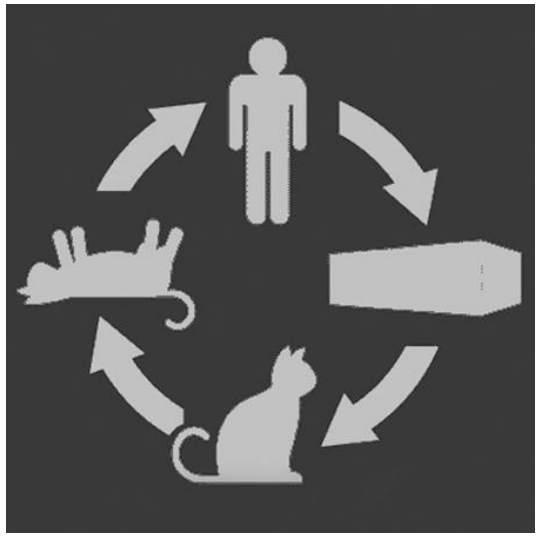

"কোন মানুষ সর্বদা যে আচরণ করতে অভ্যস্থ তাঁর আত্মার স্বভাবও সে আচরণ অনুযায়ী গঠিত হয়। কর্মের আচরণ পাশবিক বা পশুসুলভ হলে আত্মার স্বভাবও সংশি-ষ্ট পশুর স্বভাবে পরিণত হয়। পুনর্জন্মে এই আত্মা তার পূর্বগঠিত পশু-স্বভাব অনুযায়ী মানবদেহের পরিবর্তে পশুদেহ ধারণ করতঃ দেহান্তর হবে।"

এইভাবে কর্ম অনুযায়ী সকল আত্মা দেহ ধারণ করে পুনঃজন্মবাদ নীতি অনুযায়ী জন্মলাভ করে থাকে।

উলে-খ্য যে, সদ্‌গুরুর মাধ্যমে উত্তম কর্ম করে নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন করতঃ আত্মশুদ্ধি ক্রমে আত্মার ভুল সংশোধন করে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করলে আত্মার মুক্তি এবং নির্বাণ বা মোক্ষ লাভ করা যায়। ইহাতে জন্মরোধ হয় অর্থাৎ, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা হলে ইহা জন্মচক্র হতে মুক্তি লাভ করে এবং তাকে আর জন্ম নিতে হয় না।

মহাগুরু ও মহাসূফী হযরত খন্দকার রমিজ উদ্দিনের মতাদর্শ

কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ:

মহাগুরু রমিজ অধ্যাত্মবাদ (আত্মা বা পরমাত্মাই সকল কিছুর মূল- এই দার্শনিক মত), কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

রমিজ প্রণীত তিনটি পুস্তক পর্যালোচনা করলে প্রথম পুস্তক (অলৌকিক সুধা ও সত্যের অনুসন্ধান) এর বাণী নং-১ হতে ১৮ পর্যন্ত মোট আঠারোটি বাণীতে তিনি সুস্পষ্টভাবে মানবের কর্ম ও কর্মফল এবং কর্মফল ও পুনর্জন্ম নিয়ে চমৎকার যুক্তিসঙ্গত কথা, তথ্য ও ভাব উপস্থাপন করেছেন। তাছাড়াও তিনি "আত্মা বা পরমাত্মাই সকল কিছুর মূল" এই দার্শনিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তার প্রতিফলনও উক্ত বাণীগুলোতে প্রতীয়মান হয়। এ আঠারোটি বাণীর মর্মার্থই মহাগুরু রমিজের অধ্যাত্ম মতবাদ ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রারম্ভিক শুভ সূচনা করেছে। এগুলোকে মূল ভিত্তি করেই তিনি তাঁর ভক্তদের জন্য জীবন-বিধান রচনা করেন।

মহামূল্যবান এ বিধান রচনা করতে গিয়ে তিনি আজীবন আত্মা, পরমাত্মা, কর্ম-কর্মফল, জন্ম-পূনর্জন্ম, জন্ম-জন্মান্তর, কর্ম-কর্মরোধ, কর্ম-জন্মরোধ, বেহেশ্‌ত-দোযখ, স্বর্গ ও স্বর্গে আরোহণ সম্পর্কে বহু উপদেশ ও বাণী রচনা করেছেন। তাছাড়াও তিনি আত্মতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, স্বপ্নতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, ধ্যানতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি এবং মারফত বা মরমী সাধনা অর্থাৎ স্রষ্টাকে সম্যকভাবে জানার যে সাধনা তার সম্পর্কে বহুবিধ আদেশ, উপদেশ, সিদ্ধবাক্য বা আপ্তবাক্য ও বাণী রচনা করেছেন। মহাগুরু রমিজের আদেশ, নিষেধ, নির্দেশ ও সার্বজনীন সত্য (universaltruth) কথাগুলোই তার বিধান হিসাবে পরিগণিত হয়। যার বিস্তারিত বিবরণ এ পুস্তকে প্রথমেই লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এখানে রমিজ বিধানের মূল ভিত্তি আঠারোটি বাণী ও ইহাদের মর্মার্থ নিম্নে বর্ণিত হলো,-

বাণী নং-০১ *"মন দেখে শুনে কেন আছ ভুলে*
আসা যাওয়া তোর হলনা বন্ধ
খেটে মরবি ভবের জেলে"।

১। আসা যাওয়া জীবের কর্মগতি, কারে তুমি জানাও স্তুতি
কেহ নয় কারো সাথী, ভাল মন্দ সব কর্মফলে।
২। কেউ কানা, কেউ দেওয়ানা, কেউ লেংড়া, কেউ খেতে পায়না,
কেউ করে আমীরানা, বিচার কর নিজের দিলে দিলে।
৩। তুমি বল আন্‌ছি ইচ্ছা করে, যা চেয়েছি দিয়েছে মোরে,
আমি বলি তা হয় কি করে, পিতায় কি কখন ফেলে জলে।
৪। যদি বল এইসব বিধির ইচ্ছা, তবে সাধন ভজন সবই মিছা,
সমান হবে রাজা প্রজা, বিচার হবে না কোন কালে।
৫। রমিজ কয় এইসব শোনা কথা, এ কথার নাই আগা মাথা,
ঠিক করে নেও কর্ম খাতা মুক্তি পাবি ধরাতলে।

বাণীর মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা: এই বাণীর মূল বিষয়বস্তু হলো- মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী বা জীবের জন্ম ও পৃথিবীতে আসা এবং মৃত্যুর পর চলে যাওয়া নিয়ে। এ বিষয়টি আমরা দৈনন্দিন দেখ্‌ছি।

আত্মার ভুলের জন্যই তার জন্ম নিয়ে পুনরায় ভবগুরূপ জেলখানায় আসতে হয়। এখানে পৃথিবীকে কর্মফল ভোগ করার জেলখানা হিসেবে অ্যাখ্যায়িত করা হয়েছে। এ বিষয়টি দেখে শুনেও কেন ভুল করছে তা-ই বিবেক দ্বারা মনকে জিজ্ঞাসিত করা হয়েছে।

মহাগুরু রমিজের মতবাদ অনুযায়ী উক্ত বিষয়টি হচ্ছে, জীবনচক্র নামক (৮৪ লক্ষ যোনী চক্রাকারে ভ্রমন করা) পুনঃপুনঃ পৃথিবীতে আসা যাওয়ার একটি বিশেষ কর্মগতি বা কর্মফল ভোগ করার

একটি প্রক্রিয়া বিশেষ। অর্থাৎ, কর্ম ফেরে বা কর্মের ভালমন্দ বিবেচনায় পৃথিবীতে মানুষ পুনঃপুনঃ কর্মফল ভোগ করার নিমিত্তে জন্ম নিয়ে আসতে হয়। ইহার যুক্তি হিসেবে তিনি তাঁর বিবেককে জিজ্ঞাসা করছেন যে, এ পৃথিবীতে কেউ কানা, কেউ দেওয়ানা, কেউ লেংড়া, কেউ খেতে পায়না আবার কেউ আমীর হয়ে জন্ম নিয়ে সুখে আছেন, তার কারণ কি ?

যদি বলা হয় যে, তাঁহারা স্রষ্টার নিকট হতে যার যার অবস্থা চেয়ে এনেছেন। যদি তা-ই হয় তবে, বিষয়টি হলো এমন যে, স্রষ্টাতো সবাইর পিতা। পিতা হয়ে যেমন তাঁর সন্তানকে জলে ফেলতে পারেন না বা ফেলে দিবেন না, তদ্রূপ কোন লোক কানা, লেংড়া বয়রা ইত্যাদি ইচ্ছাকৃতভাবে হতে চাইলেও বিধি বা সৃষ্টির পিতা স্রষ্টা তা দিতে পারেন না। কারণ, স্রষ্টা বিশ্বপিতা হয়ে তাঁর সন্তানের অশুভ কামনা করতে পারেন না।

আবার যদি বলা হয় যে, ঐগুলো সবই বিধির ইচ্ছা তাও হতে পারেনা। কারণ, সৃষ্টির স্রষ্টা বা বিশ্বপিতা যদি যা ইচ্ছা তা করেন এবং মানবকে সৃষ্টির বলে ঘোষণা দিয়ে **(আশরাফুল মাখলুকাত)** সেই মানুষকেই ইচ্ছামত (স্রষ্টার ইচ্ছায়) কানা, বোবা, লেংড়া ইত্যাদি আজাবে নিপতিত করেন, তবেতো রাজা প্রজার কোন ভেদাভেদ থাকবে না। সাধন ভজনেরও কোন দরকার হবে না। কারণ, স্রষ্টার ইচ্ছায়ই যদি সব হয় তবেতো তিনি স্বেচ্ছাচারী হয়ে গেলেন এবং যা ইচ্ছা তাই করবেন। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে স্রষ্টাকে ডাকার কোন প্রয়োজন থাকছে না। তিনি নিজ ইচ্ছায়ই যদি সব করেন তবে তার সাধন ভজন প্রশংসা ইত্যাদি নিস্প্রয়োজন।

সর্বশেষে রমিজের বিবেক বলছেন "উপরোক্ত উক্তি সমূহ সবই শোনা কথা। ইহাদের কোন যুক্তি নেই"। রমিজের বিবেক আরও বলছেন***"কর্ম অনুযায়ী ফল"। "কর্ম-ফল ভোগতেই হবে"।*** মানবের কর্মের জন্য মানব-ই দায়ী, স্রষ্টা দায়ী নন। স্রষ্টা যার যার কর্ম অনুযায়ী কর্ম-ফল দিবেন। তিনি সূক্ষ্ম বিচারক যে যেমন কর্ম করবে ঠিক তেমনি কর্ম অনুযায়ী তার দেহ গঠন হবে।

নিজ স্বার্থের জন্য যদি কারো স্বভাব এমন হয় যেন, কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়/বস্তু চোঁখে দেখেও বলে যে "আমি দেখি নাই" এবং এ মিথ্যা সাক্ষী দেয়ার জন্য ইহা যদি অন্য কারোর বিশেষ ক্ষতির কারণ হয়, তাহলে সে চোখের অপব্যবহার করলো। বিচারে সে কানা হওয়া উচিৎ। সে পরজন্মে কানা হয়ে জন্ম নিলে তা যুক্তিসঙ্গত হবে।

এমনভাবে কেহ যদি অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে হাত, পা, মুখ ইত্যাদির অপব্যবহার করতঃ অন্যের বিশেষ ক্ষতিসাধন করে, তাহলে সে ঐ অঙ্গগুলো বিকৃত অবস্থায় নিয়েই পুনঃজন্ম নিবে। অসৎ কর্মের কারণেই পুনঃজন্ম হয়।

তাহলে যার যার শারিরীক ও মানসিক অবস্থা গঠনের জন্য নিজেই দায়ী। স্রষ্টা নিরপেক্ষ বিচারক। তিনি সৃষ্টির পিতা।

কেহ ইচ্ছা করে বিকৃতি দেহ নিয়ে জন্ম নিবে- ইহা যেমন হতে পারেনা তেমনি সৃষ্টির পিতা ইচ্ছা করে তাঁর সন্তানকে বিকৃত দেহধারী করে সৃষ্টি করতে পারেন না। যার যার জন্ম এবং দেহের গঠন তার তার নিজ কর্মফলে হয়। অর্থাৎ, সবই আত্মকর্মের ফল।

উলে- খিত বাণীটির শেষ পর্যায়ে গুরু রমিজ বলেন ***"ঠিক করে নেও কর্মখাতা, মুক্তি পাবি ধরা তলে"।*** এই মুক্তি হচ্ছে আত্মার স্বভাব মুক্তি। মুক্তি পেতে হলে মহাগুরু রমিজের বিধান মতে আত্মাকে কলুষমুক্ত করতে হবে। তার মানে নিস্কলুষ চরিত্র গঠন করতে হবে।

ধরাতে আসা যাওয়া বন্ধ করতে হলে অথবা জন্ম-মৃত্যু রোধ করতে হলে অর্থাৎ জন্মচক্র হতে মুক্তি পেতে হলে মুক্তি লাভের সঠিক কর্ম তালাশ করতঃ উক্ত কর্মের মাধ্যমে আত্মার ভুল সংশোধন করতে হবে। আর তাহলেই জন্মরোধ হবে এবং মুক্তি পাওয়া যাবে।

উক্ত কর্মখাতা বলতে একজন মানুষ জন্মের পর হতে বর্তমান পর্যন্ত যত কর্ম করেছে তার ভাল-মন্দের হিসাব নিকাশ বা হিসাব নিকাশের কর্ম তালিকাকে বুঝায়। যেহেতু রমিজ একজন আধ্যাত্মিক মহাগুরু, সেহেতু তার রচিত সকল বাণীর মূল বিষয়বস্তু হবে অধ্যাত্ম বিষয়ক। উক্ত কর্মখাতা অথবা কর্মের খতিয়নের সকল কর্মই

জন্ম, জীবন, মৃত্যু, সৃষ্টি ও স্রষ্টা বিষয়ের অন্তরভুক্ত হবে। কর্মখাতা ঠিক করার মানে হলো মহাগুর"র প্রদর্শিত বিধান ও আদেশ মোতাবেক বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল কর্ম সমাধা করা।

বাণী নং-০২ *"আসা যাওয়া জীবে সর্বদায়,*
কর্ম ফেরে এই সংসারে
ঠেকিয়াছ বিষম দায়"।

১। চৌরাশি করিও লক্ষ্য, কর্ম সত্য দেখবে স্পষ্ট,
জীবের জীবন মহা কষ্ট, বন্দী সবে জেলখানায়।

২। সর্বজীবে বিরাজমান, দেখে নেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ,
শোনা কথায় না দিও কান, দেখ যার যে কর্ম খাতায়।

৩। কর্ম জীবের আসল তত্ত্ব, কর্ম বলে জীবন মুক্ত,
সত্য যাহা হবে ব্যক্ত, বিশ্বাস হবে না কার কথায়।

৪। রমিজ কয় কর কর্ম তালাশ, আসা যাওয়ার পাবি খালাস
জন্ম-মৃত্যু করবিরে পাশ, ভয় পাবিনা চিনা রাস্তায়।

বাণীর মর্মার্থ ও ব্যাখ্যাঃ

এখানে বাণীর প্রথমেই মহাগুর" রমিজ আত্মাসমূহকে র"হের দেশ আলমে আরওয়া হতে পৃথিবীতে আসা এবং মৃত্যুর পর পৃথিবী হতে র"হের দেশে চলে যাওয়া প্রসঙ্গে বলছেন।

তিনি বলেন, কর্ম ফেরে বা কর্মের ভাল মন্দের বিবেচনায় মন্দ কর্মের কর্মফল অনুযায়ী আত্মা সমূহ পৃথিবীতে পুনঃজন্ম নিতে হচ্ছে। অসৎ কর্মের জন্যই মানব-আত্মা, পশু, পাখি ও বিভিন্ন প্রাণীরূপে (৮৪ লক্ষ প্রকার যোনীতে) চক্রাকারে ক্রমান্বয়ে পুনঃ পুনঃ জন্ম নিতে হয়। ৮৪ লক্ষ যোনিতে ক্রমান্বয়ে ভ্রমন বা ৮৪ লক্ষ প্রকার জীবে ক্রমান্বয়ে জন্মধারণ করা হচ্ছে সর্বজীবের জেলখানা। এ জেলখানা হচ্ছে অতীব কষ্টের বন্দীখানা।

প্রত্যেক মানব আত্মাই পরম আত্মার জাত। কর্মফলে মানব আত্মা সমূহ সর্বজীব রূপে বিরাজিত। তাহলে সর্বজীবের আত্মা সমূহও পরম আত্মার জাত। আবার পরম আত্মাই স্রষ্টা। তাই, স্রষ্টা সর্বজীবে বিরাজমান।

অতঃপর বলা হচ্ছে *"কর্মই জীবের আসল তত্ত্ব"*। তার মানে জীবের জীবন ও মুক্তির মূল মতবাদ বা দর্শন হচ্ছে কর্ম ও কর্মফল। কর্ম ও কর্মফলের কারণে-ই আত্মা বার বার জন্ম নিতে হয়, অথবা ৮৪ লক্ষ প্রকার জীবের জন্ম-চক্র হতে মুক্তি লাভ করে থাকে। *"সৎ কর্ম বা ভাল কর্মের ভাল ফল ও মন্দ কর্মের মন্দ ফল" ইহাই কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ নীতি*।

কর্মের সাথে জন্ম, অজন্ম, জন্মরোধ, পুনঃজন্ম ইত্যাদি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

কর্মবাদ মতে নিস্কলুষ চরিত্র গঠন পূর্বক মানবতাবাদের মানব-ধর্ম তথা, সকল মানবগোষ্ঠীকে, সর্বজীবকে ও সর্ব সৃষ্টিকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে এবং ভালবাসা ও প্রেমের মাধ্যমে সর্ব সৃষ্টিতে বা বিশ্ব প্রকৃতির সাথে লয় হতে পারলেই আত্মার মুক্তি লাভ করা সম্ভব।

তাই, গুর" রমিজের বিবেক তাঁর পন্থীদেরকে সৎকর্ম তালাশ করার উপদেশ দিচ্ছেন। একজন সদ্‌গুর"ই সৎকর্মের সন্ধান দিতে পারেন এবং সৎকর্ম সম্পাদন করার আদেশ দিতে পারেন। সৎকর্মের মাধ্যমেই পৃথিবীতে আসা যাওয়া বা জন্ম মৃত্যু রোধ করা যায়। এই কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ নীতি যিনি বুঝতে পেরেছেন এবং হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তাঁর জন্য এই পথ নির্দেশ অত্যন্ত সহজ এবং পরিচিত বা চিনা রাস্তা। কারণ, যিনি নিজকে নিজে চিন্‌তে পেরেছেন তিনিই সর্ব কর্ম, কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে হৃদয়ঙ্গম করেছেন এবং সর্ব কর্ম করার সুযোগ ও ক্ষমতা অর্জন করেছেন। আর এ ক্ষমতা যিনি অর্জন করেছেন তাঁর কর্ম বিষয়ে কোন ভয় ভীতি থাকার মূলতই কোন কারণ থাকতে পারেনা।

বাণী-০৩

"কেন লোকে দোষে মোরে
তুমি পিতা কি মাতা জানি না বিধাতা
কি বলে ডাকিব তোরে"।

১। তুমি করাও আমি করি, সকল দোষ কেবল আমারই
দেখ তুমি চিন্তা করি, কেবা দোষী এই সংসারে।

২। তুমি আমি মাখা মাখি, দুইজনে এক ঘরে থাকি,
কাজে কাজে দিয়া ফাঁকি, সকল দোষ দেও আমার ঘাড়ে।

৩। রমিজের ঘরে দিয়া ঠাঁই, কাজের সময় খুঁজে না পাই
কেবল বল আমার দোষ নাই, কি করি পারিনা জোরে।

বাণী মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা: এ বাণীতে দেহস্থিত মন ও জ্ঞানের কর্ম ও ক্রিয়া-বিক্রিয়া বর্ণনা দিতে মহাগুরু রমিজ তাঁর আধ্যাত্মিক দর্শন সম্মত অনুভূতির মাধ্যমে মন ও জ্ঞান সত্তা উভয়ের মধ্যে আত্মকর্মের বিষয়ে সংলাপ বা কথোপকথন তুলে ধরেছেন।

আবার স্রষ্টাকে বিধান কর্তা সম্বোধন করে তাঁকেই প্রশ্ন করা হচ্ছে যে, তিনি পিতা কি মাতা তা কিছুই জানা নেই এবং তাকে কি বলে ডাকতে হবে তাও জিজ্ঞাসিত করা হয়েছে।

তবে বাণীতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, স্রষ্টা পিতাই হোক আর মাতাই হোক, তিনি যে বিশ্ব প্রকৃতির বিধাতা বা বিধান দাতা অথবা বিধানকর্তা এর মধ্যে কোন ভুল নেই এবং কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই।

এ বাণীতে মহাগুরু রমিজ ইহাও বলছেন যে, মানুষের কর্মে যা কিছু ঘটছে তার জন্য সকলেই আমিত্ব (জ্ঞান) বা কর্মকারককে দায়ী করে থাকে।

আবার জ্ঞান (আমিত্ব) বা কর্মকারক মনকে বলছে যে, মনের পরিচালনায় মানবের সকল কর্ম সম্পাদিত হয়। কিন্তু কর্ম দোষের জন্য কর্মকারক বা আমিত্ব (জ্ঞান) কে-ই দায়ী করে থাকে।

ইন্দ্রিয় ও রিপু দ্বারা তাড়িত হয়ে মন সর্ব কর্ম সম্পাদন করে থাকে। তাই জ্ঞান (কর্মকারক) মনকে বলছে "তুমি করাও আমি করি, সকল দোষ কেবল আমারই"। এখানে চিন্তা করে দোষী সনাক্ত করার জন্য সদ্‌জ্ঞান মানবের মনকে আহ্বান করছে। চিন্তা বা ধ্যান ছাড়া ভাল-মন্দ সনাক্ত করার কোন উপায় নেই। আবার চিন্তা বা ধ্যান করতে হলে বিবেক নামক দেহস্থ আরেকটি সত্তার প্রসঙ্গ এসে যায়। মন, জ্ঞান ও বিবেক সকলই দেহের আত্মাস্থিত পাশাপাশি অবস্থিত। কিন্তু মন রিপু ও ইন্দ্রিয় দ্বারা বিকৃত হয়ে সকল অপকর্মের কর্মী হয়ে আমিত্ব (জ্ঞান) বা কর্মকারককে দায়ী করে থাকে।

সবশেষে উলি- খিত গুরু রমিজের বিবেক (বিচারক) বলছেন, *"আমার আমিত্বের ঘরে বা আমার দেহে মন ও জ্ঞান উভয়কেই স্থান দেয়া হলো, তার পরও আমার (বিবেকের) বিপদ সময়ে তাঁরা (মন ও জ্ঞান) উপযুক্ত বিধান সম্মত কর্মবান হয় না, তাঁরা তাদের ত্রুটি বা দোষ স্বীকার করে না।"*

এখানে দেহের ইন্দ্রিয় ও রিপু সমূহ মন দ্বারা পরিচালিত হয়ে জ্ঞান ও বিবেকের উপর প্রবল হয়ে উঠে। এ অবস্থায় জ্ঞান মনের উপর আর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এ জন্যেই রমিজ বলছেন "কি করি পারি না জোরে"। তাই সৎগুরুর সঙ্গ করতঃ মহাজ্ঞানী হতে পরম জ্ঞান (সৎজ্ঞান) অর্জন করে সৎগুরুর বিধানে চর্চা পূর্বক বিধান সম্মত কর্ম ও সাধন ভজন করতে হবে। তা হলেই মন, রিপু ও ইন্দ্রিয়াদি জ্ঞান বা আমিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

বাণী নং-০৪ ***"আমি বুঝিনা বুঝাব কিসে***
মন্দ করলে হয়রে মন্দ
ফল ভোগে তার অবশেষে"।

১। কেউ বলে শয়তানে করে, আমি করি কেন দোষে তারে
বুঝিনা বুঝাও মোরে দেখেনা যারে কেন দোষে।

২। কেউ বলে শয়তানে করায়, কেউ বলে কর স্বভাব দ্বারায়,
স্বভাব শয়তান দেখছ কোথায়, চোখ থুইয়া হারাইলা দিশে।

৩। না দেখিয়া মিথ্যা প্রমাণ, হাশরে কাটা যাবে জবান
পূর্ব কর্মের নাই পরিত্রাণ, পুনঃজন্ম অন্য বেশে।

৪। রমিজ কয় কর্মফল এইমাত্র আছে সম্বল
শয়তানে কি দোষী বল, পথ হারালি অবিশ্বাসে।

বিঃদ্রঃ এ বাণীতে মহাগুর ্ রমিজ কর্মবাদ নীতির কথাই স্মরণ করছেন। ইহার মূল কথাই হচ্ছে "কর্ম অনুযায়ী ফল"। তিনি (রমিজ) যুক্তির মাধ্যমে কর্মফল সত্য, কর্মফল অবশ্যম্ভাবী, ভাল কর্মের ভাল ফল, মন্দ কর্মের মন্দ ফল এবং অদৃশ্য ও কাল্পনিক শয়তান বলতে কিছুই নেই। কাল্পনিক শয়তানের বিষয়টি হচ্ছে সম্পূর্ণ কু-সংস্কার (Superstion)।

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যাঃ একজন মহানজ্ঞানী ব্যক্তি কখনো নিজেকে জ্ঞানী বলেন না। তাই, রমিজ বাণীটির আরম্ভই করেছেন "আমি বুঝিনা বুঝাব কিসে"। তিনি যে অগাত জ্ঞানের ভান্ডার ছিলেন এ কথা তারই পরিচয় বহন করে।

মানুষ মন্দ কর্মের মন্দ ফল ভোগতে হবে, এ বিষয়টি অবশ্য সত্য বলে তিনি যে অনুভব করেছেন তা তাঁর ভাষাতেই প্রতীয়মান হয়। তবে মানুষ কেন এ সহজ বিষয়টি বুঝেন না বা উপলব্ধি করেন না, তা তিনি বুঝতে গিয়ে অবাক হয়েছেন।

মানুষ মন্দ কর্ম করলে ইহার জন্য অনেকে শয়তান নামক এক অশরিরী কাল্পনিক সত্তাকে দায়ী করে। কেউ বলে উক্ত মন্দ কর্ম শয়তানে করে, আবার কেউ বলে শয়তানে করায়। এমনিভাবে কেউ বলে করে স্বভাব দ্বারায়।

কিন্তু লিখক (গুর ্ রমিজ) বলেছেন শয়তান ধরা ছোয়ার বাইরে ইহাকে দেখা যায় না বা তার অস্তিত্ব নাই, শয়তানে যারা বিশ্বাসী তারা কুসংস্কারে নিমজ্জিত।

আবার কেউ বলে মন্দ কর্ম শয়তানে করায়, কেউ বলে মানুষের স্বভাবই ইহার জন্য দায়ী। কিন্তু স্বভাব শয়তানও একটি কাল্পনিক কাহিনী মাত্র। তবে, মন্দ কর্মের বিষয় দেখতে হলে বা বুঝতে হলে অন্তরচক্ষু বা দিব্যচক্ষু যাদের আছে তারাই উপলব্ধি করতে পারবেন। কেহ না দেখে কাল্পনিক শয়তানকে মন্দ কর্মের জন্য দোষী সাব্যস্ত করলে ইসলামী বিধান মতে হাশরের বিচারের দিন তাঁর জবান কাটা যাবে।

গুর ্ রমিজের মতে পূর্ব জন্মের কর্ম ফেরেই মানুষ অসৎ কর্ম বা মন্দ কর্ম করে। আর জন্মান্তর বাদের নীতি অনুসারে অশুভ বা অসৎ কর্ম করার নিমিত্তেই মানুষ পর জন্মে পশুতে জন্ম নিয়ে থাকে। সুতরাং, গুর ্ রমিজ বলছেন কেবলমাত্র নিজ নিজ কর্মফলই মৃত্যুর পর মানব আত্মার সাথে র ্হের দেশে যাবে। কর্মফল অনুযায়ী তার ফল ভোগ করবে। অনাহুত শয়তানকে দোষী করা ঠিক নয়।

বাণী-০৫ ***"বুঝালে বুঝনা কেনে***
চিন্তা কর চিন্তামনি
আগের কথা কর মনে"।

১। কোথায় ছিলে কোথায় এলে, কোথায় যাবে দিন ফুরালে,
আসা যাওয়া তোর কর্মফলে, শান্তি নাই তোর কোন খানে।

২। শোনা কথা করি বিশ্বাস, নিজের গলে নিজে দিতেছ ফাঁস,
চিন্তা কর সব হবে প্রকাশ, বিশ্বাস হয়না কেন দেখে শুনে।

৩। বেহেশ্‌ত দোযখ নিরাকারে, না দেখলে কে বিশ্বাস করে
রাজা মন্ত্রী আমীর এই সংসারে, সুখী তারা কি কারণে।

৪। বোবা লেংড়া ভিক্ষুক কানা, বল তারা কেন খেতে পায় না,
রমিজ কয় চেয়ে দেখনা, বেহেশ্‌ত দোযক এই ভূবনে।

বিঃদ্রঃ *এ বাণীতে মহাগুরু রমিজ অধ্যাত্ম বা আত্মা, পরমাত্মা এবং স্রষ্টা বিষয়ে যারা গবেষণামূলক চিন্তা করেন (চিন্তামনি) তাদেরকে আত্মার পূর্বজন্মের কথা বা আগের কথা স্বরণ করিয়ে দিচ্ছেন। পূর্বজন্মের কি কর্মের ফলে মানবাত্মা অন্যরূপ (পশুরূপ) ধারণ করে পুনঃজন্ম লাভ করতঃ বিভিন্ন পরিবেশে বিচরণ করছে ইহাই এখানে মূল বিষয়বস্তু, আর বেহেস্ত দোযক সম্বন্ধেও এখানে কিছুটা আভাস দেয়া হয়েছে।*

ব্যাখ্যাঃ এ বাণীতে মানবদেহে বিরাজিত মন, জ্ঞান ও বিবেকের কথোপকথন আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ব জন্মের কি কর্মের বলে এবার মানব জন্ম ধারণ করে পৃথিবীতে এসেছে তাই জ্ঞান দ্বারা মনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। মানবাত্মার জ্ঞান দেহস্থিত বর্তমান মানবাত্মা কোথায় ছিল, কোথায় এসেছে, মৃত্যুর পর আবার কোথায় ফিরে যাবে, ইহাই রহস্যপূর্ণ প্রশ্ন। কর্মফল অনুযায়ী পুনঃজন্ম নিয়ে চৌরাশি লক্ষ প্রকার প্রাণীতে জন্মচক্রে আসতে হয় এবং উক্ত চক্রের কোন স্তরেই কারো শান্তি নেই।

মানুষ সাধারণতঃ ধর্ম কর্মের ক্ষেত্রে সমাজের মৌলভী-মাওলানা, ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, প্রভু পদ-পাদ্রী ইত্যাদি লোকগণ যা বলেন তা বিচার বিবেচনা না করে হুজুকের উপর বা অন্ধ বিশ্বাসের উপর ধর্ম কর্ম করে অভ্যস্ত। কিন্তু লেখক (গুরু রমিজ) এভাবে শুনা কথায় এবং অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে ধর্ম-কর্ম করাকে আত্মঘাতী এবং নিজের গলে নিজে ফাঁসী দেয়ার সামিল বলে বিবেচনা করছেন। নিজের গলে নিজে চুপি চুপি ফাঁস দিলে যেমন কেহ দেখেনা এবং বাচাতে পারে না তেমনি উক্ত শুনা কথায় অন্ধ বিশ্বাস করতঃ ভুল করলে এ ভুলের আর কোন সমাধান থাকেনা। সকল কর্ম ও কর্মফল চিন্তা করলে ভাল মন্দের সত্য প্রকাশ অর্থাৎ কোন্‌টি সত্য কোন্‌টি মিথ্যা তা অবশ্যই প্রতীয়মান হবে।

এ বাণীতে আরো বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে রাজা মন্ত্রী আমির, সবাই সুখ ভোগ করছেন।

আবার এ পৃথিবীতে অনেক মানুষ বোবা, লেংড়া, ভিক্ষুক, কানা, খেতে পায় না, বহু কষ্টে দিনাতিপাত করছে, তাদের দুঃখের সীমা নেই। তবে, মানুষে মানুষে কেন এত ভেদাভেদ, কেন এত ব্যবধান। প্রত্যেকেই মানুষ এবং স্রষ্টার সৃষ্টি।

মহাগুরু রমিজ মানুষকে দিব্যচক্ষু এবং দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখা ও পর্যবেক্ষন করার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন। দিব্যদৃষ্টিতে দেখলে ইহাই দেখতে পাবে যে, উক্ত দুই দলের মানুষের প্রথম দল এ পৃথিবীতেই বেহেস্তবাসী আর এক দল দোযকবাসী অর্থাৎ পৃথিবীতেই বেহেস্ত এবং দোযক রয়ে গেছে।

পূর্ব কর্মের কর্মফল অনুযায়ী যার যা প্রাপ্য তিনি তাই পাচ্ছেন। নিজের কর্মফলের ভাল মন্দের ফলাফল নিজেই ভোগ করছেন। এ নীতি কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ নীতির অন্তর্ভুক্ত।

বাণী নং-০৬ ***"ঠেকলি মন তুই ভবে এসে***
কেউ বলে সাকার কেউ বলে নিরাকার
বুঝিনা হারাইলাম দিশে।"

১। মুখ থাকিলে আছে জবান, সর্বজীবে দেখ প্রমাণ,
মুছার সঙ্গে হল কালাম, আকার নাই কেন বল মিছে।

২। জবান থাকলে আছে আকার, আকার থাকলে করে আহার,
অন্ধ লোকে কয় নিরাকার, চক্ষু নাই যার দেখবে কিসে।

৩। আকার নাই তাঁর আছে প্রাণ, আরো নাই তার পুত্র সন্তান,
বিশ্বাস করলে হবি বেঈমান, না খাইলে কেমনে বাঁচে।

৪। রমিজ কয় তাঁর আকার সত্য, তালাশ কর মিলবে তত্ত্ব,
পাবিরে তুই জীবন মুক্ত, আসা যাওয়া নিজের খোঁশে।

বিঃদ্রঃ এই বাণীতে স্রষ্টার আকার, সাকার, নিরাকার ও মানবের জীবন মুক্তি এবং স্রষ্টা সর্বত্র আকারময় অবস্থায় বিরাজ করছেন তাই বিবৃত হয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ এ পৃথিবীতে অনাদি অনন্তকাল হতেই স্রষ্টার আকার এবং নিরাকার নিয়ে বহু ধর্ম, বহু মত ও বহু পথ সৃষ্টি হয়েছে। কারো মতে স্রষ্টা সাকারে বিদ্যমান, কারো মতে তিনি নিরাকারে বিরাজিত এবং এ বিষয় নিয়ে বহু মানুষের বহুরূপ ধারণা।

তাই, স্রষ্টার বিদ্যমান তাঁর নানারূপ স্বরূপ নিয়ে মানবাত্মার জ্ঞান তাঁর মনকে তাঁর দিশেহারা ও ঠেকা অবস্থার কথা বলে প্রবোধ দিচ্ছেন। যাদের মুখ আছে তাদেরই জবান আছে। অর্থাৎ যাদের মুখ আছে তারাই কথা বলতে পারেন। কথা বলার জন্য মুখ থাকা একটি পূর্ব শর্ত। কথিত আছে যে, মুছা (আঃ) নবীর সাথে আল-াহ্‌র দৈনন্দিন কথোপকথন হয়েছে। তাই যুক্তিমতে (Logically) আল-াহ্‌র মুখ ও জবান আছে। অনুরূপ যুক্তিমতে তাঁর (আল-াহ্‌র) জবান থাকলে এবং তিনি কথা বলতে পারলে নিশ্চিতভাবে তাঁর আকার আছে এবং সর্বজীবের ন্যায় তিনি আহারও করে থাকেন। তাহলে, মিছা মিছি আল-াহর আকার নেই তা বলা অনুচিত। তাহলে, যারা অন্ধ যাদের অন্তরচক্ষু (দিব্যচক্ষু) নেই তারাই কেবল "আল-া" নিরাকার একথা বলে থাকে। যেহেতু তাদের চক্ষু নেই তারা তো আল-াহ্‌কে দেখার কোন প্রশ্নই আসেনা।

আবার যেহেতু আল-াহ্‌র বা স্রষ্টার প্রাণ আছে তাই তাঁর খানা দানাও আছে। সুতরাং যারা একথা বলে যে, আল-াহ্ প্রাণ আছে কিন্তু আকার নেই, পুত্র সন্তান নেই এবং আহার করেন না যুক্তি মতে তাঁরা বেঈমান।

উপরোক্ত সকল যুক্তির প্রেক্ষিতে রমিজ বলছেন তাঁর (স্রষ্টার) আকার সত্য আধ্যাত্মিকভাবে তালাশ করলে তিনি যে সাকারে আছেন তার তত্ত্ব পাওয়া যাবে। আর তাঁর (স্রষ্টার) তত্ত্ব জানতে পারলে তাঁকে সহজেই চিনা যাবে এবং তার পরিচয় ও সন্ধ্যান লাভ করতঃ তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করে সৎগুরুর মাধ্যমে সাধনা করে জীবন মুক্তি পাওয়া যাবে। তবেই জন্মরোধ হবে এবং এ ধরাতে পুনঃজন্ম নিয়ে আর আসতে হবে না। পৃথিবীতে আসা যাওয়া নিজ ইচ্ছা শক্তির উপর নির্ভর করবে। অর্থাৎ মুক্ত আত্মা ইচ্ছা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হবেন।

বাণী নং-০৭ *"তুমি কর্মে বাঁধা জগৎ জোড়া*
তুমি আমি এক সুতে বাঁধা
জায়গা নাই তোর আমি ছাড়া"।

১। যার যে কর্মে আসে পুনঃ, কর্ম মতে হয় গঠন,
কর্মফল হয় না কর্তন, এই হল বিধানের ধারা।

২। তুমি বল জগৎ চলে ধর্মে, আমি বলি সব চলে কর্মে,
পাপপূণ্য যার যে কর্মে, কিছু নাই আর কর্ম ছাড়া।

৩। যদি বল তুমি আমি একা, আমি বলি তুমি নিতান্ত বোকা,
আমি বিনে তোর কোথায় জায়গা, বিশ্বাস করবে সব অন্ধ যারা।

৪। রমিজ কয় চাও যদি কর্মের মুক্তি, সর্বজীবে জানাও স্তুতি,
আত্মজ্ঞানে জালাও বাতি, দেখবে তুমি জিতে মরা।

বিঃদ্রঃ *এই বাণীতে রমিজ কর্মবাদ, কর্মফল, ধর্ম-কর্ম ও মুক্ত বা মোক্ষ লাভ করা সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। তুমি বলতে "ভক্তকে বুঝিয়েছেন এবং আমি বলতে গুরু (সাঁঈ) বা স্রষ্টাকে বুঝিয়েছেন"।*

ব্যাখ্যাঃ সকল ভক্তই সারা বিশ্বব্যাপী কর্মে বাঁধা, তার মানে যে যা করছে, যে যা হচ্ছে, বা যে যেই অবস্থায়ই আছে সব-ই নিজ নিজ পূর্ব কর্মের ফল। গুরু (সাঁঈ) বা স্রষ্টা এবং ভক্ত প্রত্যেকে পূর্ব কর্মের (পূর্ব জন্মের) প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ ভূমন্ডলে ভক্তের জীবন মুক্তি, মোক্ষ লাভ, আত্মার মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করার নিমিত্তে জন্মধারণ করে এসেছেন। সদ্‌গুরু ভক্তকে মুক্তির কর্ম ও পথ দেখাবেন এবং ভক্ত গুরুর আদেশ অনুযায়ী কর্ম করবেন। অতঃপর বলা হয়েছে, আত্মা সমূহ কর্ম অনুযায়ী এবং পাপ পূণ্যের ফলাফল অনুযায়ী জন্মান্তরবাদ মতে দেহ লাভ করে বা দেহ গঠিত হয়ে পুনঃজন্ম লাভ করতঃ প্রাণী দেহে বিচরণ করছে। এখানে কর্ম অনুযায়ী ফল লাভ করবে বা করছে ইহাই ধ্রুব সত্য। ইহার কোন ব্যতিক্রম বা ব্যত্যয় ঘটবে না।

তারপর বলা হয়েছে যেহেতু স্রষ্টা সর্বজীবে, সর্বভূতে, সর্ব সৃষ্টিতে সর্বক্ষণ বিরাজমান। তাই, জীব বা প্রাণী ছাড়া স্রষ্টার অন্য কোন স্থান নেই। সর্বজীবের অন্তরেই সাঁঈ বা স্রষ্টা বিরাজমান। মানবের কাল্‌বে বা হৃদয়ে স্রষ্টা বাস করেন। মানবের হৃদয়ে থেকেই তিনি অনাদি অনন্ত পর্যন্ত সকল মানুষের মুক্তি, নির্বাণ বা মোক্ষ লাভ করার বিধান দিয়ে আসছেন।

সর্বশেষে উক্ত বাণীতে মহাগুরু রমিজ মানবাত্মার মুক্তি লাভের জন্য ভক্তরূপে বা ভক্ত হয়ে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান অর্জন করতঃ সর্বজীবকে ভালোবেসে তাঁর স্তুতি বা আরাধনা করার উপদেশ দিচ্ছেন। সর্বজীবের অন্তরে স্রষ্টার বাসস্থান আছে তা অনুভব করেই স্রষ্টাকে চিনে স্রষ্টার স্তুতি বা আরাধনা করে আত্মজ্ঞানের বাতি বা দিব্যচক্ষু, দিব্য জ্ঞান অর্জন করতঃ জিন্দায় মরা হয়ে মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করার উপদেশ দিচ্ছেন। যার সব কিছু থেকেও কিছুই নেই তিনিই বিষয় বস্তু, আমিত্ব এবং স্বর্বস্ব অকাতরে বা অকুণ্ঠ চিত্তে সদ্‌গুরুর নিকট বিসর্জন দিয়েছেন তিনিই জিতে মরা হয়েছেন এবং মুক্ত বা মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করেছেন।

বাণী নং-০৮ ***"মন কার জন্য তোর এই চাকুরী***
যাবার কালে সব যাবে ফেলে
খাটবেনা তোর বাহাদুরী"।

১। স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদ, পেয়ে খুশি অবিরত,
নিত্য তুমি কর বধ, দেখনা কেন বিচার করি।

২। কর্মফলে এই ভূমন্ডলে, ঘুরে বেড়াও নিজের ভুলে,
বেলা নাই দেখ নয়ন খুলে, ডুবে যায় তোর সাধের তরী।

৩। আসলি কর্মের পাইতে খালাস, ইচ্ছায় কেন নিতেছ ফাঁস,
বধ করলে বধ হবে বিশ্বাস, জ্ঞানের চক্ষে দেখ চিন্তা করি।

৪। রমিজ কয় প্রাণ সবের সমান, ধর্মের নামে জীব দেও কোরবান,
কার গেল প্রাণ কে পূণ্যাবান, দেখ কেমন ছল চাতুরী।

বিঃদ্রঃ *মানুষ স্ত্রী-পুত্র, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে নিয়ে ঘর-সংসার, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী কৃষি কাজ ইত্যাদি সহকারে সারা জীবন কাটিয়ে দেন। কিন্তু মৃত্যুর সময় অত্যন্ত করুণ ও অসহায়ভাবে উক্ত সব কিছুই তুচ্ছজ্ঞান করে অত্যন্ত করুণভাবে বীরত্ব বা সাহসী জীবনের অবসান ঘটে থাকে। যাদের জন্য আজীবন ত্যাগ, তিতিক্ষা, ভাল-মন্দ যা কিছু করা হয়েছে মৃত্যুর সময় তাঁরা শুধু নীরব-নির্বাক দর্শকের ভূমিকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। যাদের হিতার্থে বা মঙ্গলের জন্য আজীবন অনেক কিছু করা হয়েছে ঐ সকল কর্মকান্ডকেই মহাগুরু রমিজ পরিবার পরিজনের জন্য চাকরের ন্যায় চাকুরী আখ্যায়িত করেছেন। এ বাণীতে কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধেও আলোকপাত করা হয়েছে।*

ব্যাখ্যাঃ মানুষ স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদ, বাড়ি, গাড়ী, নারী ইত্যাদির মালিক হয়ে দুনিয়াদারীর কাজে ব্যস্ত হয়ে আনন্দ চিত্তে দিন কাটায়। তারা খাদ্য লালসার নিমিত্তে অহরহ জীব হত্যা করতঃ উহার মাংস ভক্ষনে লিপ্ত থাকে। ভুলে যায় তারা আত্মার সমঅধিকারের কথা। ভুলে যায় তারা আত্মার সুমহান মুক্তি এবং নির্বাণের কথা। সর্বদা পরিবার পরিজন নিয়ে আনন্দে দিন কাটাচ্ছে। অথচ উক্ত হত্যা কর্মের কোন বিচার বিবেচনার ধার ধারে না। হত্যা কর্মের এই ভুলের জন্য মানুষ পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন আকারের পশুতে জন্ম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গুরু রমিজ বলছেন পৃথিবীতে মানুষ তাঁর পূর্ব ভুল কর্মের (পূর্ব জন্মের) কর্মফলকে খন্ডন করে তাঁর খালাস পাবার বা পরিত্রাণ পাবার জন্য পৃথিবীতে মানব জনম নিয়ে এসেছে। কিন্তু মানুষ তা না করে আবারও হত্যা কর্ম করে মানব হত্যার ন্যায় বিচারে ফাঁস নিতেছে। বধের পরিবর্তে পুনরায় পশু জন্মধারণ করে বধ হতে হবে, ইহাই জ্ঞান এবং বিবেক সম্মত বিচার। এ বিচার জ্ঞানের চক্ষু (দিব্যচক্ষু) দ্বারা দেখা যায়। জ্ঞানের চক্ষু দ্বারা বিচার করে দেখার জন্য গুরু রমিজ উপদেশ দিয়েছেন।

মহাগুরু রমিজ বলেছেন, মানব এবং অন্যান্য প্রাণী, সকলের প্রাণ বা আত্মা একই জিনিস, একই সমান। প্রত্যেকের প্রাণ বা আত্মা একই পরমআত্মার জাত।

মানুষ ধর্মের নামে পশু বা প্রাণী হত্যা করতঃ পূণ্যবান হতে চায়। রমিজ বলছেন ***"কার গেল প্রাণ, কে পূণ্যবান, দেখ কেমন ছল চাতুরী"***। অর্থাৎ এক জনের প্রাণ বধ করে অন্য একজন পূণ্যবান হবে- ইহা স্রষ্টার সাথে ছল চাতুরী ছাড়া আর কিছুই নয়।

কোরবানের নামে জীব বা অন্য প্রাণী হত্যা না করে আল-াহ্‌র উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণ বিসর্জন কেহই দিতে পারে না। তাই, অন্য নিরীহ প্রাণীকে কোরবানীর নাম করে হত্যা করা নিজের বিবেকের সাথে এবং নিজ পরম আত্মার সাথে তথা স্রষ্টার সাথে ছল চাতুরী করারই শামিল মাত্র।

বাণী-০৯ *"বেশ ভূষাতে হয় না ঋষি*
আত্মজ্ঞানে নিজকে চিনে
জাতে জাতে মিশামিশি"।

১। লম্বা চুল মাথে জটা, পুরুষে দিলে মেয়ের ঘোমটা,
পায়না তারে নাচলে খেমটা, ঘটে ঘটে দেখ আছে বসি।

২। লাল হলুদ বেশ পরিলে, আরও যদি দেয় তস্‌বি গলে,
পায়না তারে ভূমন্ডলে তালাশ করিলে দিবানিশি।

৩। জীবের গলায় দিয়া ছুরি, কর তুমি বাহাদুরী
দেখ তুমি চিন্তা করি, তোমার কর্মে কেবা দোষী।

৪। রমিজ কয় জাননা মর্ম, নিত্য তোমার হত্যা কর্ম,
প্রাণী বধে হয় না ধর্ম, ইচ্ছা করে নিলা ফাঁসী।

বিঃদ্রঃ *ঋষি শব্দটির বাংলা আভিধানিক অর্থ হচ্ছে শাস্ত্রজ্ঞতপস্বী, শাস্ত্র প্রণেতা, বেদ মন্ত্রের সংকলয়িতা যোগী, বাকসিদ্ধ পুরুষ, বিদ্যা তপশ্রুতি (বেদ) ও সত্য যার আয়ত্তে তিনিই ঋষি। মহাগুরু রমিজ বলেন, কেবল বেশভূষা ধারণ করলেই ঋষি হয় না। আত্মজ্ঞান দ্বারা যিনি নিজকে নিজে চিনতে পেরেছেন তিনিই স্রষ্টার জাতের সঙ্গে লয় বা বিলীন হয়ে গেছেন। তিনি দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন এবং তিনিই প্রকৃত ঋষি।*

ব্যাখ্যাঃ উক্ত বেশভূষা সম্বন্ধে গুরু রমিজ বলেন, মাথায় জটা, লম্বাচুল ধারণ করে পুরুষে মেয়ের ন্যায় ঘুমটা দিয়ে খেমটা তালে আল-াহু বলে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে নাচলে স্রষ্টার সান্নিধ্য পাওয়া যাবে না।

আমাদের লোকালয়ে লোক দেখানো ও লোক ঠকানোর উদ্দেশ্যে কোন কোন লোককে দেখা যায় যে, তারা লাল হলুদ জামা পরিধান করে, গলে তসবী ঝুলায়ে, মাথায় জটা রেখে, ফকিরীর ভান ধরে, মানুষকে আকৃষ্ট করে টাকা পয়সা হাতিয়ে নেয়। এ জাতীয় ভন্ড লোকেরা দিবারাত্রে স্রষ্টাকে ডাকাডাকি ও তালাশ করলেও তাঁর সান্নিধ্য পাবে না।

এ বাণীতে আরো বলা হয়েছে যে, জীবের গলে ছুরি চালিয়ে বীরত্ব বা বাহাদুরী দেখিয়ে জীব হত্যা করে পেট ভরে উহার মাংস ভোজ করলে- ইহা অতীব দোষনীয়। নির্বিচারে নিরীহ প্রাণী হত্যা করা মানব হত্যার ন্যায় একই অপরাধে অপরাধী। হত্যার এ বিষয়টি চিন্তা করার জন্য গুরু রমিজ তাঁর ভক্তগণকে আহ্বান করছেন। উলে-খ্য যে, জন্মান্তরবাদের নীতি অনুযায়ী মানব হত্যা করলে বিচারে যেমন ফাঁসী হয় তেমনি প্রাণী ও জীব হত্যা করলেও মানবের ন্যায় ইচ্ছাকৃত হত্যার অপরাধে পুনঃজন্মে উক্ত প্রাণীতে জন্ম নিয়ে অন্যের হাতে হত্যা (ফাঁস) হতে হবে। তাই, গুরু রমিজ বলেন যে, প্রাণী বধে কোন ধর্ম কর্ম হয় না।

বাণী নং-১০ ***"তোরে আর কত বুঝাব বলিয়া***
অন্ধের সামনে ধরিলে দর্পণ
কি ফল হবে দেখ ভাবিয়া"।

১। সদা সর্বদা সঙ্গে থাকি, কারে কর তুমি ডাকাডাকি,
তোর সাথে মোর মাখামাখি, অন্ধ হলে কেন চক্ষু থুইয়া।

২। তুমি বল সে আছে নিরাকার, না দেখি কিভাবে করিলা প্রচার,
আমি বলি তাঁর অনন্ত আকার, বিশ্বব্যাপী আছে দেখ চাইয়া।

৩। যার যে কর্মফল আছে সে ভুগিতে, নররূপে কিংবা যাইয়া পশুতে,
না হলে আত্মজ্ঞান- নাহি পরিত্রাণ, প্রতি ঘটে বেড়ায় ঘুরিয়া।

৪। রমিজ বলে কর কর্মের সন্ধান, কি কর্মে তুই পাবি পরিত্রাণ,
হলে আত্মজ্ঞান দেখবি প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ব্যক্ত হবে সত্য দেখিয়া।

বিঃদ্রঃ *এ বাণীতে মহাগুরু রমিজ তাঁর মূল তত্ত্ব কর্ম, কর্মফল, কর্মবাদ, আত্মজ্ঞান ও পরিত্রাণ বা মুক্তি বা মোক্ষ লাভ সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। আরো তিনি মানুষের মন, জ্ঞান ও বিবেকের ভাব ও কথোপকথোন উপস্থাপন করেছেন।*

ব্যাখ্যা: মানুষের জ্ঞান ও বিবেক তাঁর মনকে এখানে অন্ধ হিসেবে অ্যাখ্যায়িত করেছেন। কারণ, মন যদি সর্বদা ভাল মন্দ বিচার বিবেচনা করে কর্মকান্ড করতে সক্ষম হতো, তাহলে মানুষ কখনো ভুল কাজ করতো না।

মানব মন সাধারণতঃ মন্দ কাজের দিকেই ধাবিত হয়, কারণ মন হলো মানবের সকল ইন্দ্রিয়ের পরিচালক। মন সর্বদা ইন্দ্রিয়কে কুপথে ধাবিত করে বেশী। তাই মন সর্বদা অন্ধ অবস্থায় থাকে।

তাই উক্ত বাণীর প্রথমেই মহাগুরু রমিজ একটি উপমা দিচ্ছেন যে, একজন অন্ধ লোকের সামনে একটি দর্পণ বা আয়না যেভাবেই ধরা হোক না কেন, অন্ধ লোকটি কোন মতেই তাঁর স্বীয় চেহারা আয়নার ভিতর দেখতে পাবে না। কারণ অন্ধের দর্শনেন্দ্রিয় বিকল অবস্থায় আছে। এ জন্যেই রমিজের বিবেক এবং জ্ঞান তাঁর মনকে বলছে ***"স্রষ্টা পরমাত্মা হিসেবে নিজ দেহেই (মানব দেহে ও মানবরূপে) সর্বদা বিরাজমান আছে। মন দ্বারা সংগঠিত সকল কর্মের মধ্যেই পরমআত্মা অর্থাৎ স্রষ্টার উপস্থিতি আছে। মনের সকল ভুল বিসর্জন করতঃ দিব্যচক্ষু অর্জন করলেই ইন্দ্রিয়াতীত অতীন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পরম স্রষ্টার উপস্থিতি ও মাখামাখি অনুভব করা যায় ও দেখা যায়"।*** সুতরাং, স্রষ্টাকে দূরে ভেবে ডাকাডাকি করা নিষ্প্রয়োজন।

কারো মতে স্রষ্টা নিরাকার। তাদের উদ্দেশ্যে উক্ত বাণীতে মহাগুরু রমিজ বলছেন যার আকার নেই (নিরাকার) তাকেতো দেখা যায় না। না দেখে স্রষ্টা নিরাকার একথা কিভাবে প্রচার করা হলো। এদিকে রমিজের সিদ্ধ আত্মা ও বিবেক বলেছেন ***"স্রষ্টা অনন্ত আকারে বিরাজিত, তিনি (স্রষ্টা) সর্বভূতে, সর্বত্র, সর্বসময়, সর্বভূমে, সর্বব্যাপী বিরাজমান এমনকি যেখানে কিছুই নাই সেখানেও তিনিই আছেন"।*** আর সে জন্যেই গুরু রমিজ বলছেন ***"বিশ্বব্যাপী আছে দেখ চাইয়া"।*** যার অন্তরচক্ষু বা দিব্যচক্ষু খোলা আছে তিনিই তাঁকে (স্রষ্টাকে) দেখতে পাবেন।

কর্মফল সম্বন্ধে রমিজ বলেছেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মফল মানবরূপে কিংবা জন্মান্তরবাদ অনুযায়ী কর্ম মতে নিম্নস্তরে পশুতে জন্ম নিয়ে কর্মফল ভোগতে হবে। আরো বলা হয়েছে যে, যারা আত্মজ্ঞান অর্জন করেছেন তাঁরাই পরিত্রাণ, মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করবেন। যারা আত্মজ্ঞান অর্জন করতে না পারবেন তাঁরা প্রতি ঘটে ঘুরিয়া বেড়াবে অর্থাৎ জীবনচক্রে (৮৪ লক্ষ প্রকার) সর্বজীবে পুনঃ পুনঃ জন্ম নিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে হবে। সর্বশেষে গুরু রমিজ যে কর্ম সম্পাদন করলে পুনঃ জন্ম হতে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে, তাহা সঠিকভাবে সন্ধান করার জন্য তাঁর ভক্তগণকে আহ্বান করছেন।

আরও বলছেন, আত্মজ্ঞান অর্জন করতে পারলে দিব্যচক্ষু দ্বারা সবকিছুর পরিচয় পাওয়া যাবে এবং সত্য কর্মের সন্ধান করতঃ সৎকর্ম করে জন্মচক্র হতে পরিত্রাণ লাভ করে জীবন মুক্তি, নির্বাণ বা মোক্ষ লাভ করতে সক্ষম হবে।

বাণী নং-১১ *"কারে কর তুমি ডাকডাকি*
কোথায় ছিলে কোথায় এলে
কোথায় যাবে পথ ভোলা পাখি।"

১। ডাকলে কিন্তু দেয় না সাড়া, ডেকে ডেকে আত্মহারা
শোনে না সে কর্ম ছাড়া, বিচার কর কি আছে বাকী।

২। যার নামে জীব কর দান, সকলে তারই সন্তান,
না বুঝিয়া বধিলে প্রাণ, শেষকালে তোমার উপায় কি ?

৩। পরকে করি বলিদান, তুমি বল আমি পূণ্যবান,
তা না করি নিজে দেও প্রাণ, দেখি কেমন আত্মত্যাগী।

৪। নিজের কর্ম হইলে বিশ্বাস, রমিজ বলে মিলবেরে পাশ,
হবে না কার অবিশ্বাস, সর্বজীবে দিবে সাক্ষী।

ব্যাখ্যা:

স্থায়ী- এ বাণীতে মহাগুরু রমিজ আত্মাসমূহ কোথায় ছিল, কোথায় এসেছে, মৃত্যুর পর আবার কোথায় যাবে এ প্রশ্নগুলো উপস্থাপন করেছেন। মানুষ অবিরত কাকে ডাকছে বা কার উপাসনা করছে তাও প্রসঙ্গক্রমে পরবর্তী বাক্যগুলোতে আলোকপাত করা হয়েছে।

উপরোক্ত প্রশ্নগুলো শুধু এখনকার জন্যই নয়। এগুলো মানবজাতির অতি সনাতন জিজ্ঞাসা। যুগে যুগে মহামানবগণ বিভিন্নভাবে বহুধাবিভক্ত মানব জাতিকে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে মানব মনের উক্ত জিজ্ঞাসা (প্রশ্ন) সমূহের সমাধান দেবার যথেষ্ট চেষ্টা করে আসছেন। উপরন্তু মানব মনের অধ্যাত্ম বিষয় ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারণের বহুবিধ উপায় ও উপাসনা পদ্ধতি অবলম্বন করে আসছেন।

মহাগুরু রমিজও তাই করছেন। তাঁর মতবাদ মতে মানব মনের উক্ত বিষয়গুলোর সমাধানকল্পে তিনি অত্র বাণীর মাধ্যমে কর্ম ও কর্মফল বা কর্মবাদ অনুযায়ীই যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।

বিভিন্ন ধর্মমত ও পথের মানুষ স্রষ্টার আরাধনা করার নিমিত্তে বহুরূপীভাবে তাকে ডাকছেন। গুরু রমিজ এ বাণীতে প্রথমেই বলেছেন ''কারে কর তুমি ডাকাডাকি"। ইহাতে এ কথাই সুস্পষ্ট যে, যার আরাধনা করা হচ্ছে এবং যাকে ডাকাডাকি করা হচ্ছে-

- *তাঁর পরিচয় কি ?*
- *তিনি কে ?*
- *তাঁকে চেনা হয়েছে কি ?*

পাখি যেমন পথ ভুলে গেলে আর তার নীড় বা বাসস্থান বা বাসা খুঁজে পায়না, তদ্রূপ মানুষ কোথা হতে এসেছে, কোথায় এসেছে, মৃত্যুর পর কোথায় যাবে ও কার আরাধনা করছে তা না জেনে অর্থাৎ কার আরাধনা করছে তাঁর ঠিকানা বা পরিচয় না জেনে, না চিনে তাঁকে (স্রষ্টাকে) আরাধনা করলে উপরোক্ত পথভুলা পাখির মত মানুষেরও একই অবস্থা দাড়াবে। নীড় হারা পাখির মত মানুষ পথভুলা হয়ে চক্রাকারে ৮৪ লক্ষ প্রকার প্রাণীতে ভ্রমণ করতে থাকবে ***(রমিজ মতবাদ মতে বা পুনর্জন্মবাদ মতে)***। এখানে উলে- খ্য যে, স্রষ্টা প্রেরিত মহামানব ও মহাশক্তি দ্বারা প্রচারিত বিধানই মানবের পরিত্রাণ লাভের একমাত্র পথ। ইহা মানুষকে জীবনচক্র হতে পরিত্রাণ দিতে পারে। এ বিধান মতে কর্ম করলে, সদ্গুরু অনুগত হয়ে আত্মবোধ সৃষ্টি করতঃ মানুষ মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হবে।

অন্তরা-১ ঃ মানুষ নাম জপ, ধ্যান, জিকির ইত্যাদি বহুবিধ পদ্ধতিতে স্রষ্টাকে ডাকতে ডাকতে আত্মহারা হয়ে যান। অর্থাৎ নিজেকে নিজে ভুলে যান। তথাপি স্রষ্টা কোন সাড়া দেন না।

গুরু রমিজের মতে আত্মকর্ম ব্যতীত শুধু স্রষ্টাকে ডাকাডাকিতে তিনি শোনবেন না। স্রষ্টা মানবের অনুতপ্ত হৃদয় দ্বারা কৃতকর্মের দিকে চেয়ে আছেন। কারণ ***কর্মই সকল ধর্ম মতের মূল সূত্র***। আরো সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় ***'কর্মই ধর্ম'***। যা হলো কর্মবাদের মূল তত্ত্ব।

অন্তরা-২ ঃ অতঃপর গুরু রমিজ বলেনঃ স্রষ্টার নামে বা স্রষ্টার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জীবকে কোরবান অথবা বলিদানের নামে হত্যা বা বধ করা হলে স্রষ্টা সন্তুষ্ট হতে পারেন না। কারণ মানবসহ সকল জীবই স্রষ্টার সন্তান। পিতার সামনে এক সন্তানকে অপর সন্তানে বধ করলে পিতা যেমন সন্তুষ্ট হতে পারেন না, তদ্রূপ মানুষও স্রষ্টার নামে অপর প্রাণীকে হত্যা বা বধ করলে স্রষ্টা সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

অন্তরা-৩ ঃ গুরু রমিজ আরো বলেছেন, মানুষ অন্য প্রাণীকে হত্যা করে নিজকে পূণ্যবান বলে দাবী করছেন। তা না করে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে এমন কে আছে ? স্রষ্টাকে খুশী করার জন্য প্রাণী হত্যার পরিবর্তে নিজের প্রাণ বিসর্জন যিনি দিতে পারেন তিনিই প্রকৃত আত্মত্যাগী। *মূলতঃ স্রষ্টার উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেবার মত লোক বা পাত্র একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না।*

অন্তরা-৪ (আভোগ) ঃ সর্বশেষে মহাগুরু রমিজ বলেন *"নিজের কর্ম হলে বিশ্বাস, রমিজ বলে মিলবে রে পাশ, হবে না কার অবিশ্বাস, সর্বজীবে দিবে সাক্ষী"।*

যিনি নিজকে নিজে চেতন গুরু বা সদ্‌গুরুর মাধ্যমে স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করতে পেরেছেন তিনিই স্রষ্টাকে চিনেছেন এবং অতীন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ও দিব্যচক্ষু দ্বারা (অন্তরচক্ষু) স্রষ্টাকে দেখে তাঁর স্বরূপ অনুভব করবেন। এ অবস্থায় আত্মসমর্পনকারীর সকল কর্মের প্রতি তার নিজের আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হবে। তাঁর এ সৎকর্মের জন্য সর্বজীবে বিরাজমান স্রষ্টা অতীন্দ্রিয়ের দৈববাণী বা এলহাম যোগে প্রমাণ দিবেন। তা হলেই তিনি জন্মচক্র পাস করবেন এবং জীবন মুক্তি, নির্বাণ বা মোক্ষ লাভ করবেন। অর্থাৎ, তাকে আর পৃথিবীতে জন্ম নিতে হবে না। জন্ম মৃত্যুকে তিনি জয় করলেন, পাশ করলেন বা অতিক্রম করলেন।

বাণী নং-১২ ***"কাজ কি আমার তাঁরে ডেকে,***
সেতো হৃদয়ের ধন খোদ মহাজন
ঘরের মালিক ঘরে থাকে"।

১। যখন যাহা করি মনে, আমার অন্তর্যামী সকল জানে,
ডাকলে উত্তর দিবে কেনে, আমার কর্ম সে চেয়ে থাকে।

২। শুনছি তাঁর নাই আহার বিহার, আরো শুনছি সে নিরাকার,
আকার নাই যার দরকার কি তার, খোঁজলে তাঁরে পায়না লোকে।

৩। কোনরূপে তাঁরে করিব ভজন, প্রতি ঘটে খোদ মহাজন,
নররূপে কর স্মরণ, রমিজ বলে পাবি তাঁকে।

ব্যাখ্যাঃ

(স্থায়ী) ঃ মানবদেহ স্রষ্টার গড়া ঘর। এ ঘরের ভিতর হৃদয়ে (কাল্‌বে) তিনি অবস্থান করেন। তিনি হৃদয়ের একমাত্র সম্বল (ধন) এবং তিনিই স্বয়ং বা খোদ ইহার মালিক আর তিনিই সর্বদা ইহা দেখেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

১। গুরু রমিজ এখানে বলেছেন স্রষ্টা অন্তর্যামী, তিনি সবই জানেন এবং দেখেন। সুতরাং তাকে শুধু শুধুই ডাকলে তিনি উত্তর দিবেন না। তিনি কেবল মানুষের কর্মকান্ডগুলোই পর্যবেক্ষণ করেন। মানবের কর্ম অনুযায়ী তিনি কর্মফল দিবেন। তাই, তিনি সকলের কর্মের দিকে চেয়ে আছেন।

২। মহাগুরু রমিজ স্রষ্টা সম্বন্ধে বলেছেন "শোনা যায় তিনি (স্রষ্টা) আহার বা খাদ্য গ্রহণ করেন না। কোন স্থানে বিহার বা বিচরণও করেন না। তিনি নিরাকার। তাকে খোঁজলে লোকে কোথাও পায় না"। তাহলে যার আকার নাই, খোঁজলে পাওয়া যায় না তাঁর দরকারইবা কি ?

৩। তবে স্রষ্টাকে কোন্ রূপে আরাধনা করতে হবে এ বিষয়ে মহাগুরু রমিজ বলেন "স্রষ্টা প্রত্যেকটি মানবের কাল্‌বে বা হৃদয়ে বাস করেন"। তাই, যেহেতু মানবদেহ স্রষ্টার ঘর, মানব হৃদয়ে স্রষ্টার বাসস্থান সেহেতু মানবরূপ বা নররূপেই তাঁকে স্মরণ করতে হবে। পৃথিবীতে যত অবতার ও নবী-রাসূল আবির্ভূত হয়েছেন সবাই

মানবরূপে। দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্টিলগ্ন হতেই স্রষ্টা মানব আকারকে বেশী পছন্দ করে আসছেন। সুতরাং নবী-রাসূল, অবতার, মহামানব সকলের আত্মাই স্রষ্টা বা পরমেশ্বরের জাত। তাঁদের সকলের অসীম পরম আত্মা স্রষ্টার অসীম পরম আত্মার সহিত লয় হয়ে আছে।

সুতরাং মানবরূপেই (নর-রূপে) স্রষ্টার আরাধনা করা শ্রেয়।

এ সম্বন্ধে মহাগুরু রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন "মানবকে ভালোবাস হৃদয়ে রাখি ভক্তি মানবেতে আছেন প্রভু তাঁরে জানাও স্তুতি" উপদেশ-৯ (অলৌকিক সুধা)

এ উপদেশ বা সিদ্ধবাক্যে ইহাই বুঝানো হচ্ছে যে, স্রষ্টা মানবের কাল্‌বে বা হৃদয়ে অবস্থান করছেন। তাঁই মানবকে বা মাবনজাতিকে ভালবাসলেই স্রষ্টাকে ভালবাসা হয়।

দারেমী শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে গাউসে পাক বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) তাঁর "সিররুল আসরার নামক কিতাবের ১২১ পৃষ্ঠায় হযরত রাসূল (সঃ) এর একখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা হলো হযরত রাসূল (সঃ) বলেন- ***[রা আইতু রাব্বি আলা সুরাতি শব্বিন আমরদ]***

অর্থ ঃ ***"আমি আমার প্রভুকে দাঁড়ি গোফ বিহীন যুবকের আকৃতি বিশিষ্ট দেখেছি"।***

[সিররুল আসরার মূলঃ বড়পীর সাহেব (রহ)।]

অনুবাদ আবদুল জলিল, পরিবেশনায় ফয়জিয়া কুতুবখানা, ১৫ আদর্শ পুস্তক বিপনী বিতান, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-১০০০। প্রথম মুদ্রণ ১৯৮৬ ইং।

আল-ামা বদরুদ্দীন আকবরাবাদী কর্তৃক প্রণীত ১৩২১ হিজরী জিলকদ, ১৯০৪ সনের ফেব্রুয়ারী দিল-ী থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত কিতাব দেওয়ান ই হাফিজ-এর "শরাহ বদরু শরুহ্" এর ২০৪ পৃষ্ঠায় অনুরূপ আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

মহান আল-াহতায়ালা বিবি মরিয়মের কাছে যে মানব আকৃতিতে আত্ম প্রকাশ করেছিলেন এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে-

[ফা আরসালনা ইলাইহা রুহানা ফাতামাস্‌সালা লাহা বাশারান সাওইয়্যান]

অর্থ ঃ ***"আমি তাঁর (মরিয়মের) নিকট আমার রুহ প্রেরণ করলাম সে তার নিকট পূর্ণ মানব আকৃতিতে আত্ম প্রকাশ করল" (সূরা-মরিয়ম, আয়াত-১৭)।***

মহান আল-াহ্‌তায়ালা যে নিজের রূপে আদমকে সৃষ্টি করেছেন, এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূল ফরমান-
[ইন্নাল-াহা খালাকা আদামা আলা ছুরাতিহী]
অর্থঃ "নিশ্চয়ই আল-াহ্ আদমকে তাঁর নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন" (মেশকাত শরীফ ১ম খন্ড)।

প্রিয় পাঠকবৃদ্ধ, মহাগুরু রমিজ, পবিত্র কোরআন, হাদীস শরীফ ও মহা মানবগণের বাণী মোবারক থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, স্রষ্টা (আল-াহ্) মানবরূপ ধারণ করেই তাঁর প্রিয় আশেকান বা পরম ভক্তকে দর্শন দিয়ে থাকেন।

উপরোলি-খিত স্রষ্টার মানবাকার ধারণ করার যুক্তিগুলো থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, পরম আত্মার মানব আকার হলো "স্রষ্টারই প্রতিচ্ছবি"। আর স্রষ্টা মানবরূপেই মহামানবের কাছে ধরা দিয়ে থাকেন।

বাণী নং-১৩ *"মন দেখে যা তুই এ সংসারে*
বলি তোরে তোর কর্ম ফেরে
আসা যাওয়া বারে বারে"।

১। যার হয়েছে আত্মবোধ, তার হইল কর্মরোধ
হইল সে খোদে খোদ, যখন যা তার ইচ্ছায় করে।

২। আত্মজ্ঞানে হয় নির্বাণ, এই হইল বিধির বিধান
কর্মরোধ তার হবে প্রমাণ, নিত্য সংবাদ দিবে যারে।

৩। কর্ম ছাড়া নাহি ধর্ম, কর্ম দিয়া রোধ কর কর্ম
ডাকা ডাকিতে হয় না ধর্ম, না দেখিয়া ডাক কারে।

৪। রমিজ কয় তার সকল ফাঁকি, ঠিকানা নাই কারে ডাকি
সর্বজীবে দেখ সাক্ষী, অনন্তরূপে বিরাজ করে।

ব্যাখ্যা ঃ এ বাণীতে মহাগুরু রমিজ কর্মফল, কর্মরোধ, জন্মান্তরবাদ, আত্মজ্ঞান, আত্মবোধ ও স্রষ্টা অনন্তরূপী এ বিষয়গুলো তাঁর ভক্তদের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

১। যিনি নিজের ভাল মন্দ সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করে, সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে ধ্যান যোগে সাধনার মাধ্যমে আত্মজ্ঞান অর্জন করেছেন অথবা যিনি আত্মচেতনা (নিজ চেতনা) দ্বারা চৈতন্যময় হয়েছেন তিনি নিজকে নিজে বোধ (চিনতে পেরেছেন) করতে সক্ষম হয়েছেন। আর তিনিই আত্মবোধ অর্জন করেছেন। আর যিনি এ আত্মবোধ লাভ করেছেন তিনি দিব্যজ্ঞান ও দিব্যচক্ষু দ্বারা সব বুঝেন, সব দেখেন ও সব শোনেন। তাই তাঁর সকল কর্মফল জানা আছে। তিনি কর্ম দ্বারা কর্মবোধ করতে সক্ষম। আর তিনি খোদার জাতের সঙ্গে লয় হয়ে খোদে খোদ হয়েছেন।

২। পরবর্তী পর্যায়ে গুরু রমিজ বলেন "আত্মজ্ঞানে হয় নির্বাণ, এই হইল বিধির বিধান, কর্ম রোধ তার হবে প্রমাণ, নিত্য সংবাদ দিবে যারে"।

এখানে মহাগুরু রমিজ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলছেন- আত্মজ্ঞান বা আত্মচেতনার অধিকারী যিনি তিনি- চৈতন্যময় হয়েছেন। তিনিই স্রষ্টার বিধানমতে নির্বাণ বা জন্মচক্র হতে পরিত্রাণ লাভ করেছেন। মহাগুরু রমিজের জন্মান্তরবাদ- এর জন্ম-মৃত্যু রোধ করেছেন। তাকে জন্ম নিয়ে আর ধরায় আসতে হবে না।

আর যিনি কর্মরোধ প্রাপ্ত হয়েছেন তার প্রমাণ হিসেবে তিনি স্রষ্টার তরফ হতে নিত্য দৈববাণী এলহাম ওহী ইত্যাদি সংবাদ পাবেন।

৩। এরপর গুরু রমিজ বাণীতে ৩নং অন্তরায় যা লিখেছেন তাঁর ব্যাখ্যা বিবরণ হলো- কর্ম ছাড়া কোন ধর্ম হতে পারে না। অর্থাৎ ধর্ম বলতেই অনেক কর্মের আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ দেয়া থাকে। আদেশ এবং উপদেশে উলে-খিত কর্ম সম্পাদন করতঃ অথবা উলি-খিত আদেশ উপদেশের কর্মগুলো (সৎ কর্মগুলো) সম্পাদন করতঃ অসৎ কর্মকে রোধ করা যায়।

কর্ম সাধন করা ছাড়া কেবলমাত্র স্রষ্টাকে না চিনে, না দেখে, ডাকাডাকি করলেই ধর্ম পালন করা হলো না। আগে স্রষ্টাকে চিনতে হবে, তাঁর স্বরূপ দেখতে হবে, অতঃপর ধর্ম কর্ম করতে হবে।

৪। সর্বশেষে রমিজ বলেন- স্রষ্টার পরিচয় ও ঠিকানা না পেয়ে অচেনা, অজানা নিরাকার (যার অর্থ কিছুই নাই) হিসেবে অন্ধের মত আন্দাজ করে তাঁকে ডাকলে কোন লাভ হবে না।

তবে গুরু রমিজের মতবাদ মতে- স্রষ্টা সর্বজীবে, সর্বভূতে, সর্বত্র অনন্তরূপে অবিরাম বিরাজ করছে। সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টার অস্তিত্ব বিদ্যমান। সৃষ্টিকে ভালবাসলেই স্রষ্টাকে ভালবাসা হলো। সর্বজীবই স্রষ্টার বিদ্যমানবতার সাক্ষী। যথা সৃষ্টি তথা স্রষ্টা। তাই সর্বজীবের আরাধনা করলেই স্রষ্টার আরাধনা করা হলো।

আর আরাধনা করতে হলে আরাধনার আইন বা বিধান জানতে হবে। এ বিধান জানতে হলে- আরেকজন মহামান্য আরাধ্য ব্যক্তির কাছে যেতে হবে। তাঁর আদেশ অনুযায়ী কর্ম ও তাঁর সঙ্গ করতে হবে। তাঁকে অনুস্মরণ ও অনুকরণ করতে হবে। তাঁর নিকট আমিত্বকে বিসর্জন করতে হবে। রমিজের ভাষায় সেই আরাধ্য মহান ব্যক্তিই হচ্ছেন "সদ্‌গুরু"।

সদ্‌গুরুই ক্রমে ক্রমে তাঁর পরম ভক্তকে, আত্মতত্ত্ব জ্ঞান, স্রষ্টা ও সৃষ্টি বিষয়ক বা অধ্যাত্ম বিষয়ক জ্ঞান, অপার্থিব বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ঐশ্বিরিক জ্ঞান, অতীন্দ্রিয়ের জ্ঞান ইত্যাদি বিতরণ পূর্বক দিব্যজ্ঞান ও দিব্যচক্ষু ফুটিয়ে তুলতে পারেন।

উক্ত দিব্যজ্ঞান ও দিব্যচক্ষু দ্বারা স্রষ্টার ঠিকানা, পরিচয়, অনন্তরূপ, অনন্ত শক্তি, এছাড়াও পৃথিবীসহ মহাবিশ্বের অন্যান্য ভূমের খবরও বলতে পারবেন।

উলে-খ্য যে, মহাগুরু রমিজ বলেছেন পৃথিবী ছাড়া আরো অনেক সৌরমন্ডল আছে যেখানে অনেক ভূম (গ্রহ) রয়েছে এবং ঐগুলোতে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী ও তাদের পরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে।

বাণী নং-১৪ *"কারে কর তুমি প্রবঞ্চনা*
সর্বজীবে বিরাজমান
দেখে হইলনা বিবেচনা"।

১। পথের তোমার নাইরে সন্ধান, অন্ধ আর তুমি সমান,
হত্যা কর জীবেরই প্রাণ, নিজের প্রাণের ভয় করনা।

২। জীব মাত্র ভগবান, যদি কর বলিদান
রইল তার প্রতিদান, তোর কাঁদন আর কেউ শোনবেনা ।

৩। পিতার পুত্র সবে সমান, মূর্খ কুপুত্র বিদ্ধান,
জেনে শুনে বধিলে প্রাণ, সেই দোষের ক্ষমা পাবিনা।

৪। জীবে দয়া আত্মদান, তুষ্ট থাকে ভগবান,
রমিজ কয় শাস্ত্রে প্রমাণ, জীব ছাড়া কোথায় পাবিনা।

ব্যাখ্যাঃ

(স্থায়ী)ঃ স্রষ্টা সর্বজীবে বিরাজমান। তাহলে, যে কোন প্রাণী জীবকে আঘাত বা হত্যা করা হলে সে আঘাত বা হত্যা স্রষ্টাকেই করার সামিল হলো। ইহা জেনেও যদি কোন ব্যক্তি উক্ত অশুভ কর্ম করে, তবে উহা স্রষ্টার সহিত প্রবঞ্চনা করা হলো- ইহাই প্রতীয়মান হয়।

১। মহাগুরু রমিজ বলেছেন- স্রষ্টার সন্ধান তোমাদের জানা নেই। তাঁর পরিচয় তোমরা জান না। তাই তোমরা স্রষ্টার বিধান বা পথ সম্বন্ধে অজ্ঞ। স্রষ্টার বিধান বা তাঁকে আপন করে পাবার যে পথ এ সম্বন্ধে যারা জানে না তাদেরকে গুরু রমিজ অপার্থিব জগতের অন্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অনবরত জীবের বা প্রাণীদের প্রাণ নাশ করতেছে। অথচ হত্যাকারীরা নিজের প্রাণের ভয় করেনা। অর্থাৎ যারা প্রাণীর প্রাণ নিধন করছেন তাদের প্রাণ যদি কেহ নিধন করতেন সে ভয়ঙ্কর দৃশ্যের এবং যাতনার ভয় কাহারো নেই। ইহা যেন অতি সাধারণ এবং নিত্যদিনের আনন্দ ও খাদ্য লালসার একটি চমকপ্রদ বিষয়।

২। হত্যাকারীর প্রাণ এবং হত্যাকৃত জীবের প্রাণ একই সমতুল্য প্রাণ। কোন প্রাণই অন্যের প্রাণ হতে কোন দিক থেকেই কম বা বেশী নয়। মানব হত্যার বিচার হলো ফাঁসী। তাই জীব হত্যার বিচারেও হত্যাকারী মানুষ পুনঃজন্মে হত্যাকৃত অনুরূপ জীবে জন্ম নিয়ে স্রষ্টার বিধান মতে অন্যের দ্বারা হত্যা হতে হবে। যেহেতু জীবমাত্র ভগবান তাই জীব হত্যা মানেই ভগবান বা স্রষ্টাকে হত্যা করার সামিল। ইহার প্রতিদান বা প্রতিশোধ পেতেই হবে। তার জন্য কোন কান্নাকাটি বা হা'হুতাশ করলে কোন কাজ হবে না।

৩। পিতার যত পুত্রই থাকুক না কেন, মূর্খ, কুপুত্র, বিদ্বান সকলই পিতার নিকট সমান। তদ্রূপ, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী বা জীব সকলই স্রষ্টার সন্তান। সবাই একই প্রাণ বিশিষ্ট প্রাণী। সুতরাং, প্রত্যেক প্রাণী বা জীবই স্রষ্টার নিকট (পিতার নিকট) সমমর্যাদা প্রাপ্য। অতএব, জেনে শুনে প্রাণী হত্যা করলে এই হত্যা দোষের কোন ক্ষমা স্রষ্টা (পরম বিচারক) করবেন না।

৪। সব শেষে মহাগুরু রমিজ বলেন- "জীবে দয়া আত্মদান তুষ্ট থাকে ভগবান"। অর্থাৎ সর্বজীবের উপকারার্থে যিনি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে পারেন তাঁর প্রতি স্রষ্টা সন্তুষ্ট থাকেন।

এখানে সর্বজীবের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করা মানে স্রষ্টার জন্যই প্রাণ উৎসর্গ করা। কারণ, সর্বজীবে স্রষ্টা বিরাজমান। তাই, উক্ত মতে প্রাণ উৎসর্গকারীর প্রতি স্রষ্টা অবশ্য সন্তুষ্ট ও খুশি থাকারই কথা। গুরু রমিজ ইহাও বলতেছেন যে, জীব ছাড়া স্রষ্টাকে কোথাও পাওয়া যায় না। ইহাই সর্ব শাস্ত্রসম্মত মতবাদ। তাই সর্বজীবে দয়া প্রদর্শন করা মানুষের একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত।

বাণী নং-১৫ *"দেখলিনা মন চিন্তা করি*
তোর যেমনি কর্ম তেমনি জন্ম
ঘটে ঘটে ঘুরাফিরি"।

১। আসলি কর্মের পাইতে মুক্তি, প্রাণী হত্যা তোর নিত্যি নিত্যি
দেখেশুনে কর ডাকাতি, আর কত কর বাহাদুরী।

২। চৌরাশি করিয়া ভ্রমণ, পেয়েছে এবার মানব জনম
জন্ম মৃত্যু কিসে বারণ, তালাশ কর তাড়াতাড়ি।

৩। কর্ম দিয়া কর্ম মুক্ত, দৈববাণীতে হবে ব্যক্ত,
তোমার মধ্যে যে সেই সত্য, আর কিছু নাই সব ছল চাতুরী।

৪। রমিজ কয় এবার মান প্রবোধ, কর্ম দিয়া জন্ম রোধ,
দেখবে নিজে খোদে খোদ, দখল হবে জমের কাচারী।

ব্যাখ্যা :

(স্থায়ী) ঃ এ বাণীতে মহাগুরু রমিজ কর্ম অনুযায়ী ফল, কর্মফল, কর্মবাদ, জন্ম ও জন্মরোধ, মুক্তি বা মোক্ষ লাভের উপায় ইত্যাদি ব্যক্ত করেছেন।

রমিজ বলেন ***"তোর যেমনি কর্ম তেমনি জন্ম, ঘটে ঘটে ঘুরাফিরি"।***

অর্থাৎ মানুষ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় জেনে বা না জেনে পৃথিবীতে বহুবিধ অপকর্মে জড়িত হয়ে থাকে। দেখা যায় যে, মানুষ হয়ে অনেকে পশুসুলভ আচরণ ও কর্ম সম্পাদন করে। মহাগুরু রমিজের মতবাদ মতে যে মানুষ অন্য মানুষ বা প্রাণীর সাথে কুকুরের ন্যায় আচরণ ও কর্ম করে তাঁর আত্মার স্বভাব ও চেহারা ক্রমশ কুকুর রূপ ধারণ করছে। অনুরূপভাবে যে শুকরের ন্যায় আচরণ ও কর্ম করবে তাঁর আত্মা ক্রমশ শুকরের স্বভাব ধারণ করছে। জন্ম ও জন্মান্তরবাদ মতে উক্ত মানবাত্মা দু'টি কর্মফলে পরবর্তী জনমে যথাক্রমে কুকুর ও শুকরের দেহ ধারণ করতঃ জন্ম নিবে। এভাবে মানব আত্মাসমূহ যদি সৎকর্ম করে তবে তাদের আত্মাগুলো পরম মানবরূপে এমনকি মহামানবরূপেও জন্মধারণ করতে পারে। জন্মান্তরবাদ মতে যারা বিশ্বাসী তাদের মতবাদ হলো- যে যেই পশুতে বা যেই আকারে পরবর্তী জন্ম নিবে, মানবরূপে থাকাকালীন সে আগেই উক্ত পশুসুলভ আচার, আচরণ, কর্ম ইত্যাদি এমনভাবে করতে থাকে যে, তাঁর আত্মা সংশি-ষ্ট পশুর স্বভাব ধারণ করতে থাকে। পর জন্মে সে উক্ত পশুতে জন্মধারণ করে। ক্রমে-ক্রমে পুনঃজন্মক্রমে অন্য পশুতে দেহান্তর হয়।

অন্তরা-১ ঃ এ বাক্যগুলোতে গুরু রমিজ বলছেনঃ অসৎ কর্ম হতে মুক্তি পেয়ে কর্ম মুক্তির জন্যই মানুষ কেবলমাত্র পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে এসেছে। কিন্তু তা না করে অবিরত পশু হত্যা করতঃ বীরত্ব ও অহমিকা প্রকাশ করে মানুষ দিন কাটাচ্ছে। ডাকাত যেমন বীরত্ব দেখিয়ে জোর পূর্বক মানুষের সর্বস্ব ও জীবন পর্যন্ত কেড়ে নেয়, তেমনি মানুষ হয়ে নির্বাক পশুগুলোকে উদরপূর্ণ করার নিমিত্তে সর্বদা পশু হত্যা করছে। রমিজ বলেছেন এ হত্যাকর্ম দেখে শুনে ডাকাতি করার সামিল।

অন্তরা-২ ঃ গুরু রমিজ তাঁর বাণীর দ্বিতীয় অন্তরার বাক্যগুলোতে মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেছেনঃ চৌরাশি লক্ষ প্রকার জীবের জীবনচক্র কাটিয়ে এবার মানব জন্ম লাভ করা হয়েছে। তাই, তিনি জীবনচক্র হতে পরিত্রাণ লাভ করার উপায় তালাশ করার জন্য মানব জাতিকে আহ্বান করছেন।

অন্তরা-৩ ঃ অতঃপর তিনি বলছেনঃ কর্ম দিয়েই মানুষ কর্মরোধ বা কর্ম মুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ সৎকর্ম দিয়ে অসৎ কর্মরোধ করা যায়। মানব তার আত্মবোধের মাধ্যমে পরম আত্মার সন্ধান লাভ করতে পারে। সদ্‌গুরু সঙ্গ করতঃ *আত্মজ্ঞান ও আত্মতত্ত্ব জ্ঞান অর্জিত হলেই আত্মরোধ সৃষ্টি হয়* এবং পরম সত্যের সন্ধ্যান পাওয়া যায়। আর সে সত্য দৈববাণী, এলহাম, অহী, স্বপ্ন ইত্যাদি যোগে অনুভব করা যায় এবং অন্তরচক্ষু দ্বারা দেখাও যায়। আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভে দিব্যজ্ঞান লাভ হয় এবং দিব্যজ্ঞান দ্বারা দিব্যচক্ষু (অন্তরচক্ষু) খুলে যায়। আর দিব্য চক্ষু বা অন্তর চক্ষু দ্বারা সকল সত্যকেই দেখা যায়। তখনই মানুষের নির্বাণ বা মোক্ষ লাভ হয়। এ অবস্থায় মানুষকে আর জন্ম চক্রের আওতায় যেতে হয় না। মানব আত্মা এ অবস্থায় জন্মচক্র হতে পরিত্রাণ লাভ করেছে বলা হয়।

অন্তরা-৪ ঃ এখানে বাক্যগুলোতে মহাগুরু রমিজ উক্ত অবস্থামতে বলছেন- সত্যকে উপলব্ধি করতঃ দিব্য জ্ঞানের মাধ্যমে কর্ম দিয়া কর্ম রোধ করা যায়। সদ্‌গুরুর আদেশ অনুযায়ী সকল সৎকর্ম সম্পাদন করতঃ অসৎ কর্ম রোধ করা যায়।

মহাগুরু রমিজ তাঁর পন্থীদেরকে প্রবোধ বা শান্তনা দিচ্ছেন যে, কর্ম দিয়া জন্মরোধ করা যায়। আর আত্মবোধ, দিব্য জ্ঞান, দিব্য চক্ষু ও আধ্যাত্মিক দর্শন অর্জন করতঃ নিজের মধ্যে খোদেখোদকে অর্থাৎ নিজের মধ্যেই স্রষ্টাকে অতীন্দ্রিয় (দিব্য চক্ষু) দ্বারা দেখা যায়।

আর সসীম মানবের পরম আত্মা তখন অসীম স্রষ্টার পরম আত্মার সাথে একাকার হয়ে বিলীন বা লয় হয়ে যায়। এ পরম মানবাত্মা আর ধরায় জন্ম নিতে হবে না। অর্থাৎ তাঁর জন্ম মৃত্যু রোধ বা রহিত (বন্ধ বা নিবৃত্ত) হয়ে গেল। তাই যেহেতু তাঁর (পরমাত্মার) আর জন্ম মৃত্যু নেই, সেহেতু তাঁর কাছে আর মৃত্যু দূত বা যম আসার প্রয়োজন নেই। এ যম-দূতের কাচারী বা কার্যালয়ও তাঁর পরমাত্মার জয় করা হয়ে গেল।

বাণী নং-১৬ ***"মিছে কেন ডাকাডাকি***
কে দেখল তাঁরে নিরাকারে
দেখলে তুমি আন সাক্ষী"।

১। মনরে যার যে কর্মে হল আকার, পশু পাখি নর যত প্রকার,
প্রাণী ছাড়া কোথায় জাগা তাঁর, বিচার কর খুলি জ্ঞানের আঁখি।

২। মনরে তুমি বল সে আছে নিরাকার, যদি থাকে কিন্তু প্রাণ আছে তাঁর
প্রাণ থাকিলে আছে তাঁর আকার, নিরাকারে অর্থ কিছু নাই ফাঁকি।

৩। মনরে প্রাণী ছাড়া যদি থাকত অন্যস্থানে, পেয়েছে বলি শুনতাম কানে,
সব শাস্ত্রে কয় সে সর্ব স্থানে, তাঁরে ছাড়া কিছু নাইরে বাকী।

৪। মনরে রমিজ কয় আমি দেখছি নিরাকার, আমার মত নাই একই প্রকার
যেমনি কর্ম তেমনি আকার, ফল ভোগে তার জীবে থাকি।

(স্থায়ী)ঃ

ব্যাখ্যা ঃ এখানে মহাগুরু রমিজ স্রষ্টার আকার এবং নিরাকার নিয়ে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। কর্মবাদ এবং কর্ম অনুযায়ী আত্মার আকার প্রাপ্তি সম্বন্ধেও তিনি বাস্তবধর্মী উদাহরণ দিয়েছেন। গুরু রমিজ প্রথমেই বলেছেন স্রষ্টাকে যিনি নিরাকার অবস্থায় দেখেছেন তিনি যেন তা বাস্তবে প্রামণ করে দেখিয়ে দেন এবং তার সাক্ষী দ্বারাও যেন প্রমাণ করা হয়। তিনি আরো বলছেন যে, স্রষ্টাকে নিরাকার অবস্থায় না দেখে মিছামিছি ভাবে ডাকাডাকি অর্থহীন।

১। অন্তরা ঃ এ বাক্যগুলোতে মহাগুরু রমিজ বলছেন যে, জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা বিচার করলে দেখা যায় প্রাণী ছাড়া স্রষ্টার অবস্থান করার আর কোন স্থান নেই। যারা আত্মতত্ত্ব জানেন তাঁদের অন্তরচক্ষু (দিব্যচক্ষু) খোলা থাকে। সেই চক্ষু দ্বারা বিচার বিশে- ষণ করলে দেখা যাবে যে, পশু-পাখি, প্রাণী, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, যতজীব বা সর্বজীব প্রত্যেকটিই জন্মান্তরবাদ অনুসারে পূর্ব জন্মে মানবাকারে ছিল। যে যেই আকারই থাকুক না কেন সকল জীব বা প্রাণীর মূল আত্মা হলো "মানবআত্মা"। মানবাকার ধারণ করে নিজ নিজ পূর্ব কর্ম দ্বারা পশু ও প্রাণীর স্বভাব অর্জন করতঃ পরবর্তী জন্মে যার যার অর্জিত স্বভাব অনুযায়ী বিভিন্ন প্রাণী বা জীবের আকার প্রাপ্ত হয়েছে এবং এর মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষও রয়েছে। যেমন-কানা, খোরা, লেংড়া, বধির ইত্যাদি। সকলেই (সর্বজীব) এক মানব জাতি হতে পূর্ব কর্মফলে বিভিন্ন জাতিতে, বিভিন্ন শ্রেণীতে, বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন পশু ও প্রাণীতে জন্ম নিয়ে এসেছে। সকলের (সর্বজীবের) মধ্যেই স্রষ্টা বিরাজমান।

২। অন্তরা ঃ এ অনুচ্ছেদে গুরু রমিজ বলছেন স্রষ্টা নিরাকার অবস্থায় আছেন এমন কথা যদি কেহ বলেন, আর যদি তাঁর (স্রষ্টার) সত্বার অবস্থান থাকে তবে তাঁর অবশ্যই প্রাণ আছে। আবার প্রাণ থাকলে তাঁর (স্রষ্টার) আহার বিহার সবই আছে এবং তাহলে তাঁর আকারও আছে। সুতরাং নিরাকার অর্থ কিছুই নাই এবং ইহা একটি ফাঁকি বা ধাপ্পা (Eye wash) মাত্র।

৩। অন্তরা ঃ এ বাক্যগুলোতে গুরু রমিজ বলেছেন যে, প্রাণী ছাড়া স্রষ্টা অন্য কোন স্থানে বাস করলে অবশ্যই কোন না কোন লোক তাঁর দেখা পেতেন এবং তা শুনাশুনি ও জানাজানি হয়ে যেত। ইহা মানব সমাজে বা লোকালয়ে প্রচারিত হয়ে যেত। তবে পৃথিবীর সকল শাস্ত্র স্রষ্টার একটি বিষয়ে একমত এবং সর্বশাস্ত্র সম্মত সত্য যে, তিনি (স্রষ্টা) সর্বত্র ব্যপ্ত ও বিরাজামন। এমন কোন স্থান বাকী নেই যে, সেখানে স্রষ্টার ব্যপ্তি নেই।

৪। অন্তরা ঃ এখানে তিনি একথাই বুঝাচ্ছেন যে, তাঁকে (গুরু রমিজ) ছাড়া এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় অপর আর একজন লোকও নেই যার চেহারা, বর্ণ, কণ্ঠস্বর, দৈহিক ও মানসিক গঠন ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে অঙ্গাঙ্গীভাবে তাঁর সাথে হুবহু মিল রয়েছে। অর্থাৎ তাঁর মত এরকম হুবহু সর্ব বিষয়ে সর্বতোভাবে মিল আছে এমন আর একজন রমিজ এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর নেই। তাঁর উদাহরণ কেবল তিনি নিজেই। তিনি বেমিছাল। তদ্রূপ প্রত্যেকটি প্রাণী ও জীব বেমিছালভাবে এ মহাবিশ্বব্রহ্মান্ডে বিচরণ করছে। *এ দৃষ্টান্ত বিহীন বেমিছাল রূপই হচ্ছে নিরাকার।*

একটির আকারের ন্যায় আরেকটি হুবহু আকার বিশিষ্ট প্রাণী বা জীব আর কোথাও পাওয়া যায় না। তার দৃষ্টান্ত (প্রাণী বা জীব) সে নিজেই।

সুতরাং, এ অবস্থায় এবং স্রষ্টার এ ব্যবস্থাপনায় তিনি বেমিছালভাবে সর্বজীবে আকার হয়েও নিরাকার রূপে সর্বত্র, সর্বভূতে, সর্বভূমে, সর্বক্ষণ বিরাজিত।

মানুষ যার যার পূর্ব কর্মফল অনুযায়ী আকার ধারণ করতঃ সর্বজীবে জন্মান্তরিত হয়ে কর্মফল ভূগতেছে।

বাণী নং-১৭ *"সন্ধ্যা হলে ঠেকবি যাইয়া গুদারায়*
দিন থাকিতে চল পথে
দেখনা বেলা ডুবে যায়"।

১। মনরে গুদারা ঘাটের মাঝি, স্বভাব তাঁর বড় পাঁজি,
কার কথায় হয় না রাজি, চালায় তরী তাঁর ইচ্ছায়,
ডাকলে তাঁরে চায় না ফিরে, স্বভাব বুঝা মহাদায়।

২। মনরে যারে মাঝি দয়া করে, পয়সা ছাড়া পার করে,
আর কত জনায় পরে ফেরে, শোনেনা ধরিলে পায়,
ইচ্ছা হলে নিয়ে যায় কুলে, যারা চলে তাঁর ইচ্ছায়।

৩। মনরে মন মাঝির কথা ধর, তাঁর ইচ্ছা কি চিন্তা কর,
বিবেক দিয়া কর্ম সার, যেমনে বাধ্য করা যায়,
হইলে বাধ্য নাই কার সাধ্য, পার করিতে পয়সা চায়।

৪। মনরে রমিজ কয় তারে বাধ্য করা, হইতে পারলে জিতে মরা
আর হইলে সর্বহারা, যার কিছু নাই সব বিকি পায়,
তাহলে তারে নিবে পারে, পাওনা দেনা সমান প্রায়।

ব্যাখ্যা ঃ (স্থায়ী) একটি দিনের মূল্যবান সময়কে চারটি ভাগে বিভাজন করা যায়।

যেমন-
১। সকাল
২। দুপুর
৩। বিকাল
৪। সন্ধ্যা।

তদ্রূপ, একটি মানব জীবনের জীবন কালকেও নিম্নলিখিত চারটি ভাগে বিভাজন করা যায়। যেমন-
১। শিশু বা শৈশবকাল
২। বাল্যকাল
৩। যৌবনকাল
৪। বৃদ্ধকাল।

উলে-খ্য যে, রমিজের মতবাদে মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কে আধ্যাত্মিকভাবে মাত্র একদিন হিসেবে পরিগণিত হয়। মানুষের স্বাভাবিক চলার পথে সন্ধ্যা নেমে আসলে খালি চোখে কিছুই দেখা যায় না। যারা চেতন লোক তাঁরা সন্ধ্যা নেমে আসার পূর্বে দিনের আলো থাকতেই যাবতীয় দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। তাতে সন্ধ্যা নেমে আসলেও দৈনন্দিন কাজের কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না। মানব জীবনেও বৃদ্ধকাল (সন্ধ্যা কালের ন্যায়) ঘনিয়ে আসলে তার মৃত্যুর ঘণ্টা বেজে যায়। শৈশব থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত সারা জীবনের কর্মকান্ডের হিসাব নিকাশ করলে মনে হয় এই সেই দিন পৃথিবীতে এসেছি, আজ বৃদ্ধ হয়েছি। জীবন কি এতই অল্প সময়ের ! আহা, কিছুইতো করা হলো না। মনে একটা হাহাকার চলে আসে, সন্ধ্যার অন্ধকারের মতো জীবন সন্ধ্যা নেমে আসে, সৃষ্টি হয় নৈরাশ্য ও বিফলতা (Frustration)।

এ অবস্থায় হৃদয় মনে হাহাকার, শোক বা আর্তনাত বিজড়িত ব্যাপক প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। এ অন্তীম বয়সে স্রষ্টার সৃষ্টি বিষয়ক বা আধ্যাত্মিক কোন কর্ম করার উপযুক্ত সময় আর হাতে থাকে না। জীবনে ভাল-মন্দ অনেক কর্ম করা হয়ে থাকে। সৎ কর্ম দ্বারা মন্দ কর্মের কর্ম-রোধ করার সুযোগ বৃদ্ধকালে আর থাকে না। কারণ, এ বয়সে মানুষের কোন প্রকার কর্মস্পৃহা থাকে না এবং কর্ম করার কোন ইচ্ছা শক্তিও থাকে না।

তাহলে, মন্দ কর্ম হতে পরিত্রাণ লাভ করার যথাযথ সময় হলো- বাল্যকাল হতে বৃদ্ধকালের পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ বাল্যকাল হতে যৌবন ও বার্ধক্যের মাঝামাঝি অবস্থা (প্রৌঢ়) পর্যন্ত। আধ্যাত্মিকভাবে এ সময়টা হলো মানব জীবনের মহা মূল্যবান সময় (golden time of life)।

মহাগুরু রমিজ তাই ভক্তদের বলেছেন- *"সন্ধ্যা হলে ঠেকবি যাইয়া গুদারায়*

দিন থাকিতে চল পথে
দেখনা বেলা ডুবে যায়"।

এখানে মহাগুরু রমিজ পন্থীদেরকে/ভক্তদেরকে হুশিয়ার করে বলছেন-

"তোমাদের জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে প্রায়। নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন পূর্বক আত্মবোধ অর্জন করতঃ জীবত্ববোধ নাশ করে আত্মার পরমত্ববোধ সৃষ্টি করার এখনই (বাল্যকাল হতে প্রৌঢ় কাল পর্যন্ত) প্রকৃষ্ট সময়। ***সময় থাকতে তোমরা সদ্‌গুরুর চরণে অনুগত হয়ে তাঁর আদেশে সৎকর্ম কর। তবেই মুক্তি বা পরিত্রাণ পাবে"।***

সন্ধ্যায় যেমন মাঝি লোক নিয়ে অপর পাড়ে চলে যায় এবং চলে গেলে তখন হাজার ডাকলেও কাজে আসবেনা। তদ্রূপ সময় থাকতে সদ্‌গুরুর (মাঝির) সন্ধ্যান করে তাঁর মাধ্যমে আত্মকর্ম না করলে জীবনের শেষ লগ্নে এসে (রমিজ বর্ণিত সন্ধ্যাকালে) সদ্‌গুরুর সন্ধান লাভ, তাঁর আশীর্বাদ পাওয়া ও আত্মকর্ম সম্পাদন করা কোন মতেই সম্ভব নয়। যেহেতু সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না, সেহেতু মহাগুরু রমিজ দিন থাকতে বা যথেষ্ট সময় থাকতে সদ্‌গুরু নির্দেশিত সৎ পথে, সৎ বিধানে, সৎ কর্ম করার আহ্বান জানাচ্ছেন।

অন্তরা ১ ঃ এখানে গুদারা ঘাটের মাঝি বলতে সদ্‌গুরুকে বুঝায়। সদ্‌গুরু হচ্ছে- ইচ্ছা শক্তিধর একসত্তা যিনি মানব জীবনে মানুষকে পার্থিব জগতের ভবনদী পারাপার করে পার্থিব জগত হতে পরিত্রাণ (মুক্তি) দিতে পারেন।

আর এ পরিত্রাণ হলো জীবন মুক্তি বা মোক্ষ লাভ বা নির্বাণ লাভ করা। ভবনদীতে জীবন নিয়ে মানবকুল বিচিত্র কর্মকান্ডে জড়িত থাকে। ভবনদীর মাঝি হচ্ছেন "সদ্‌গুরু"। গুদারা ঘাট হচ্ছে সদ্‌গুরুর আস্তানা অথবা বারামখানা। গুদারা মানে খেয়া নৌকা। তাহলে মহাগুরু রমিজ বর্ণিত গুদারা বলতে ইচ্ছা শক্তিময় সদ্‌গুরু ও তার বিধান সম্পৃক্ত শক্তিকে বুঝায়, যা মানবকে সৎকর্মের মাধ্যমে পার্থিব জগত হতে পার করে বা উত্তরণ (জীবন মুক্ত) করে পৃথিবীতে আসা যাওয়া বন্ধ করতঃ মানব আত্মার পরিত্রাণ দিতে পারে।

পরিত্রাণকৃত এ মানবাত্মা আর জন্ম-চক্রের আওতাভুক্ত থাকে না।

মহাগুরু রমিজ মতে উক্ত তরীর যাত্রী হলোওসদ্‌গুরুর বিধানে আত্মসমর্পনকারী ভক্তবৃন্দ। সদ্‌গুরু আন্তর্যামী। তিনি সকলের অন্তরের বা হৃদয়ের কথা জানেন। কে কী কর্ম করেন তিনি তা তাঁর দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখেন।

তাই তিনি কর্ম ছাড়া কারো কথা শুনেন না। তাঁর ইচ্ছা শক্তির মাধ্যমে তিনি তাঁর যাত্রী বা বিধানের ভক্ত পরিচালনা করে থাকেন। তিনি বিধান বহির্ভুত কারো কথা শুনেন না। তিনি কেবল একমাত্র বিধানের বা আইনের কথার মধ্যে পূর্বাপর স্থির থাকেন। তার আদেশের কোন পরিবর্তন বা বিচ্যুতি হয় না। তাই তাঁকে (গুদারা ঘাটের মাঝিকে) পাঁজি বা ঠেটা আখ্যায়িত করা হয়েছে।

তাঁর বিধান মতে কর্ম ছাড়া শুধু ডাকাডাকি করলে তিনি কারো দিকেই ফিরে চাবেন না ইহাই তাঁর স্বভাব।

যারা আত্মতত্ত্ব না বুঝে তাঁকে ডাকাডাকি করে, সে অর্থহীন ডাকের কোন উত্তর বা সাড়া তিনি (মাঝি রূপ সদ্‌গুরু) দেননা। তাই তারা "তাঁর (মাঝির) স্বভাবের ধারা বুঝেনা ও জানেনা বলে তাঁর স্বভাব বুঝা মহাদায়" এ কথাটি উলে- খ করেছেন।

মাঝির বিধান মানে তাঁর মতবাদ বা আত্মতত্ত্বের কর্মপথ। এ তত্ত্বের কর্ম পথ অনুস্মরণ করে চলাই তাঁর স্বভাব। যারা এ তত্ত্ব বুঝেনা তাদের জন্য মাঝির স্বভাব বুঝা বড়ই কঠিন বিষয়।

অন্তরা ২ ঃ এ বাক্যগুলোর প্রথমেই মহাগুরুর রমিজ বলেন-

"যারে মাঝি দয়া করে,
পয়সা ছাড়া পার করে"

তার মানে, যারা দয়া পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তাদেরকে কোন বিনিময় ছাড়াই ভবনদী পার করা (মুক্তি দেয়া) হয়। ভবনদী পার করা হচ্ছে- মানবকে জন্মচক্রের (৮৪ লক্ষ প্রকার জীবের) বন্ধী দশা হতে পরিত্রাণ লাভের উপায় করে দেয়া। কখন উক্ত দয়া পাবার যোগ্যতা অর্জন করা হয়েছে তা মাঝি বা সৎগুর"ই জানেন। তবে, যোগ্যতা অর্জিত ভক্তগণও অতীন্দ্রিয় সাধনার মাধ্যমে এ বিষয়টি জানতে পারেন। আর যারা পূর্ব কমের্র ফেরে অর্থাৎ পূর্ব জন্মের কর্মের ভাল-মন্দ বিবেচনায় অযোগ্য হয়েছেন তারা বহু ডাকাডাকি এবং আকুতি মিনতি করলেও তাদেরকে পারাপারের নৌকায় নেয়া হবে না। অর্থাৎ সদ্গুর" তাদেরকে গ্রহণ করবেন না এবং জন্মচক্রের বন্দী দশা হতে তারা পরিত্রাণ বা মুক্তি লাভের পথ পাবেন না।

তবে যারা সদ্গুর"র (মাঝির) ইচ্ছায় ইচ্ছিত হয়ে আরম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত অবিরাম কর্ম করেছেন তাদেরকে নিজ ইচ্ছায় পার করে দেয়া হয়। অর্থাৎ যিনি গুর"র ইচ্ছায় চলবেন তাঁকে গুর" নিজ ইচ্ছায় পার করবেন।

অন্তরা ৩ ঃ যিনি মাঝির (সদ্গুর") মনের ইচ্ছাধীন চলে সে মাঝিকে মন-মাঝি বলা হয়।

মহাগুর" রমিজ বলেছেন- ***"মন মাঝির কথা ধর, তাঁর ইচ্ছা কি চিন্তা কর***
বিবেক দিয়া কর্ম সার, যেমনে বাধ্য করা যায়,
হইলে বাধ্য নাই কার সাধ্য, পার করিতে পঁয়সা চায়"।

এখানে মন মাঝির কথা ধরতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ মন মাঝির (সদ্গুর"র) আদেশ অনুযায়ী কর্ম করার আদেশ দেয়া হয়েছে। অত্র বাক্যগুলোতে বলা হয়েছে যে, কর্ম করার নিমিত্তে তাঁর (মন মাঝির বা সদ্গুর"র) কি ইচ্ছা আছে তা চিন্তা করতঃ বিবেক দ্বারা সঠিক কর্ম নির্ণয় করে তা সম্পাদন করতে হবে।

মহাগুর" রমিজ ভক্তদের আরো উপদেশ দিচ্ছেন যে, যে কর্ম করলে সদ্গুর"কে বাধ্য করা যায় জ্ঞানের বিচারক বিবেক দ্বারা সে কর্ম নির্ণয় পূর্বক তাই সম্পাদন করতে হবে। সদ্গুর"কে বাধ্য করতঃ তাঁর ইচ্ছায় কর্ম করলে পার করার (পরিত্রাণের/মুক্তির জন্য) আর কোন বিনিময় চাওয়ার কেহই থাকবে না।

অন্তরা ৪ ঃ এ বাক্যগুলোতে মহাগুর" রমিজ বলেন- ***"রমিজ কয় তারে বাধ্য করা, হইতে পারলে জিতে মরা,***
আরো হইলে সর্বহারা, যার কিছু নাই সব বিকি পায়"

এ বাক্যগুলির মাধ্যমে মহাগুর" রমিজ তাঁর পরম ভক্তদের পরিত্রাণ ও মুক্তি বা মোক্ষ লাভের জন্য কয়েকটি অত্যন্ত জর"রী এবং বিশেষ উপদেশ দিয়েছেন। আর তা হলো- মন মাঝিকে (সদ্গুর"কে) বাধ্য করা যার একমাত্র পথ বা উপায় হলো তাঁর কাছে, তাঁর পদে বা বিধানে সর্বস্ব অর্পণ বা আমিত্বকে বিসর্জন দেয়া ও জিতে মরা হওয়া। অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তি যেমন কোন কিছুর প্রতিবাদ করতে পারে না, কিছু দেখে না, কিছু বলে না, তদ্র"প জীবিত থেকেও কোন কিছুর প্রতিবাদ, আপত্তি ইত্যাদি করতে পারবে না। দেখেও দেখছে বলে বলতে পারবে না। আরো গভীরে আলোচনা করলে বুঝা যায় যে, ইহার জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সুনিয়ন্ত্রণ করতে হবে। রিপু ও ইন্দ্রিয়াদির কর্মকান্ড বন্ধ করতে হবে। অর্থাৎ ইহাদের প্রতি অনাসক্তি সৃষ্টি করতে হবে। আর তা হলেই সদ্গুর" ভক্তের বাধ্যগত হয়ে তাঁকে (পরমভক্তকে) পার বা পরিত্রাণ করবে। উলে- খ্য যে, ভক্ত যত কর্মই কর"ক না কেন গুর"র পাওনা ও ভক্তের দেনা অর্থাৎ উভয়ের কর্ম ও কর্মফলের দেনা পাওনা পরিপূর্ণভাবে সর্বতোভাবে সমান হয় না। ভক্ত কর্ম সম্পাদন করবে বিনিময়ে গুর" তার কর্মফল প্রদান করবে। এ পর্যায়ে গুর" রমিজ বলেন পাওনা দেনা সমান প্রায়। সদ্গুর"র প্রাপ্য ও পরম ভক্তের দেনা প্রায় সমান সমান হবে, কিন্তু পুরোপুরি সমান হবে না। ভক্তের কর্মের সামান্য কিছু অপুরণীয় থাকলেও সদ্গুর" বিশেষ বিবেচনায় ভক্তের আজীবন ভক্তি ও বিশ্বাসের নিমিত্তে তাকে কৃপা করতঃ তাঁর কর্মের ফলাফল সমান সমান করতঃ তাকে মুক্তি বা পরিত্রাণ করে দেন।

বাণী নং-১৮ *"চিন্তা কর চিন্তামণি সে কোথায়*
আরশ কুরছি লহু মাফুজে
লেখতে আছে সর্বদায়"।

১. *মনরে বসিয়া আরশ কুরছিতে, রহমতের কলম নিয়া হাতে,*
লেখতে আছে আপন জাতে, যখন যা তাঁর ইচ্ছা হয়,
যদি লেখে ভুলে হারা হয় মূলে, সাধের ভরা ডুবে যায়।

২. *মনরে কলমের কালির কি কৌশল, শত রঙ্গের হয় ফল,*
তাতে আছে আজব কল, বন্ধ হয়না লেখছে প্রায়,
লেখে জীবে কেউ না বুঝে, লেখতে লেখতে আয়ু ক্ষয়।

৩. *মনরে যে হয়েছে কলমদার, তাঁর কাছে সর্বভার,*
সে করে কলমের কারবার, লেখতে আছে সর্বদায়,
আসল বাকী সে করে লেখালেখি, ষোল আনা তার মিল সদায়।

৪. *মনরে রমিজার ঐ ষোলআনা, যোগ দিলে যোগে মিলেনা,*
সদায় আমার এই ভাবনা, আসল বাকীর কি উপায়,
যদি হয় বিবেচনা, মিলাবে ষোলআনা,
আমার সব বিকি দিয়াছি পায়।

স্থায়ী ঃ

ব্যাখ্যাঃ যিনি গভীর চিন্তা, ধ্যান বা মোরাকাবার মাধ্যমে স্রষ্টার দূর্বোধ্য গুপ্ততথ্য (রহস্য) উদ্‌ঘাটন করতে পারেন তিনিই একজন চিন্তামণি। সৃষ্টির বিষয়াদি নিয়ে যে পবিত্র স্থানে ও আত্মিক উচ্চতম স্তরে (আরশ) অবস্থান করতঃ স্রষ্টা তাঁর আসনে (কুরছি) বসে সর্ব সৃষ্টির তদারক করেন তা হচ্ছে আরশ কুরছি (আলমে আরওয়ায় অবস্থিত)।

উক্ত বাণীর অংশে মহাগুরু রমিজ স্রষ্টার অবস্থান সম্পর্কে (মোরাকাবা) করতঃ আধ্যাত্মিক তথ্য নিরূপণ করার জন্য আধ্যাত্মিক বিষয় সংশি-ষ্ট মহান ব্যক্তিগণকে আহ্বান করছেন। একই সাথে সেখানে (আলমে আরওয়ায়) বা আত্মার রাজ্যে সর্বজীবের সকল কর্মকান্ড ও সর্ব সৃষ্টির তথ্য সর্বদা লিখে রেখে রেকর্ড করতঃ সংরক্ষণাগারে (লহু মাফুজে) রাখার ঘটনার কথাও বলা হয়েছে। এ বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করার জন্য গুরু রমিজ বাণীর প্রথম অংশেই তাঁর চিন্তামণি ভক্তদের আহ্বান করছেন।

অন্তরা ১ ঃ ব্যাখ্যা ঃ এখানে মহাগুরু রমিজ ইহাই বুঝাতে চাচ্ছেন যে, মানব দেহের অত্যন্ত উচ্চতম স্তর হচ্ছে নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী স্রষ্টার উপর নির্ভরশীল ও আত্মসমর্পণকারী মানবের পবিত্র হৃদয় (আরশ)। মারেফাত জগতের সূফী সাধকবৃন্দের মতানুযায়ী এ হৃদয়ই হচ্ছে স্রষ্টার আরশ। আর কলম হচ্ছে স্রষ্টার ইচ্ছাশক্তি। স্রষ্টার রহমতের কলম বলতে তাঁর কৃপা বা দয়ারূপ ইচ্ছাশক্তিকে বুঝায়।

স্রষ্টা সর্বোত্তম বিচারক। যারা উত্তম কর্ম করেন তিনি (স্রষ্টা) তাঁদেরকে কর্ম অনুযায়ী উত্তম ফল দান করেন, ইহা কর্মবাদের মূল নীতি বা বিধান।

আবার যেহেতু, রহমত হচ্ছে দয়া, কৃপা বা অনুগ্রহ। তাই রহমতের কলম মানে যে শক্তির মাধ্যমে স্রষ্টা মানবকুল তথা সৃষ্টির সর্ব জীবকে তাদের অসহায় অবস্থায় দয়া বা কৃপা করে থাকেন।

এমন কিছু বিষয় আছে যার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কর্ম করেও তার ফল অর্জন করা অসম্ভব হয়ে পরে। কেবলমাত্র মানবের অনুতাপের জন্য-ই স্রষ্টা রাহ্‌মানির রাহিম বা পরম করুণাময় দয়াল ও দাতা হিসেবে মানবকে সমূহ বিপদ হতে উদ্ধার করতে পারেন। "এই পরম করুণাময় শক্তিই হচ্ছে স্রষ্টার রহমতের কলম"।

গুরু রমিজ তাও বলেছেন যে, মানব ও সর্বজীব পরম আত্মা (স্রষ্টা) হতে সৃষ্ট। তাই, সকল-ই তাঁর জাত। আবার লেখা-লেখি হচ্ছে স্রষ্টার নিজ ইচ্ছা ক্ষমতা দ্বারা, যে যেই কর্মকান্ডে লিপ্ত তা সাথে সাথেই লিখে রেখে তাঁর বিধান মতে সংরক্ষণাগারে (জ্ঞান ভান্ডারের স্মৃতিফলকে) স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত করা। এই জ্ঞান ভান্ডারের

স্মৃতিফলক নিয়েই আত্মা সমুহ মৃত্যুর পর আলমে আরওয়ায় চলে যায়। এখানে (বাণীতে) তা-ও উলে- খ আছে যে, যদি কেহ ভুল লেখা-লেখি বা স্রষ্টার বিধান বিরোধী কোন কর্মকান্ডে (ষড়রিপু, এগারো ধারার পাপ ও ইন্দ্রিয়াদি তাড়িত কর্ম) জড়িত থাকে তবে তার ভরা বা বোঝাই নৌকা অর্থাৎ অসৎ কর্মে ভরপুর দেহ, কর্ম ফেরে মানব দেহ ছেড়ে পশু দেহে দেহান্তরিত হবে। কারণ, অনেক স্বাদ করে পাপাচারে আসক্তির ফলগুই এরকম হয়।

অন্তরা ২ ঃ ব্যাখ্যা ঃ এখানে কলম বলতে স্রষ্টার শক্তি এবং কালি বলতে স্রষ্টার অনন্ত শক্তির উৎসকে বুঝায়। এই অনন্ত শক্তির রূপও অনন্ত। মানুষ স্রষ্টার জাত হিসেবে কর্ম অনুযায়ী অদ্ভূত, আশ্চর্য বা অসাধারণ কল, মেশিন বা যন্ত্রের মত অনন্তরূপী জীবে বিচরণ করছে। স্রষ্টার এই কৌশল বা আশ্চার্য ব্যবস্থা অনাদি-অনন্তকালের জন্য চালু ছিল, আছে এবং থাকবে। প্রত্যেকটি মানব বা জীব অসাধারণভাবে আজব (আশ্চর্য) কর্মে মগ্ন আছে। একটির কর্ম-কৌশল অপরটিতে কোনক্রমেই বুঝার নয় এবং এভাবেই তাদের জীবন (আয়ু) অবসান ঘটে।

অন্তরা ৩ ঃ ব্যাখ্যা ঃ এখানে গুরু রমিজ বলছেন যে, যিনি কলমদার বা উক্ত শক্তি অর্জন করেছেন তাঁর নিকট স্রষ্টার প্রতিনিধির সকল ভার বা ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তিনি কলম বা শক্তির বেচা-কেনা অর্থাৎ বিনিময় করার ক্ষমতা প্রাপ্ত। স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে সে তাঁর ভক্তবৃন্দের সৎকর্মের বিনিময়ে উত্তম ফল দিতে পারেন। ইহাই গুরু (প্রতিনিধির) ও ভক্তের কর্ম ও কর্ম-ফলের বিনিময় বা বেচা-কেনা। যিনি উক্ত কলমদার (প্রতিনিধি বা সদ্‌গুরু) তিনি প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর সকল ভক্তের কর্মকান্ডের হিসাব নিয়ে তাঁদের কর্মের ভার গ্রহণ করতঃ কর্মের খতিয়ান বা কৃত-কর্ম কতটুকু করা হলো আর কতটুকু বাকী রইল তা অবগত হয়ে, প্রয়োজনে অতিরিক্ত কর্ম করানোর মাধ্যমে, আত্মার মুক্তির জন্য ষোল-আনা বা সর্ব কর্ম সমাধা করে দেন।

অন্তরা ৪ ঃ ব্যাখ্যাঃ এখানে মহাগুরু রমিজ একজন ভক্তরূপ ধারণ করে বা ভক্তের ভূমিকায় গিয়ে, ভক্তের আবেগ বা ভাবাবেগের কথা বর্ণনা করছেন। এ অবস্থায় তিনি বলেছেন, তাঁর উক্ত ষোলআনা অর্থাৎ সর্বকর্ম হিসাব করলে সর্বদা-ই কর্মের কিছু বাকী থেকে যায়। একজন ভক্ত জীবনে গুরু প্রদত্ত সর্বকর্ম পুরাপুরি (সমগ্র) সম্পন্ন করতে পারেন না। অতিব সামান্য অবশিষ্ট কর্ম ষোলআনা মিল করার জন্য পরম ভক্ত উপায় খুঁজছেন। তাই, তিনি গুরুপদে আত্মসমর্পণ করতঃ ষোলআনা মিলানোর জন্য বাকী কর্মের ভার সদ্‌গুরুর দয়া বা কৃপার উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

(বিঃ দ্রঃ এ অবস্থায় সদ্‌গুরু ভক্তের আদি-অন্ত বিবেচনা করে কৃপাগুণে ভক্তের মনো-বাসনা পুরা করতঃ তাঁর আত্মার মুক্তির ব্যবস্থা করে থাকেন)।

উলে- খ্য যে, কিছু সংখ্যক ওন্ড প্রকৃতির লোক ইচ্ছাকৃতভাবে এ মহা মূল্যবান বাণীর বিকৃত-ব্যখ্যা বা অপব্যখ্যা প্রদান করতঃ সাধারণ সরল প্রাণ ভক্তদেরকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা করে। এ ধরণের ওন্ড প্রকৃতির লোকদের থেকে সতর্ক থাকার জন্য সবাইকে অনুরোধ করা হলো।

ইতি– গ্রন্থকার

পরিভাষা ঃ

আরশ	→	সর্ব ব্যাপী খোদার আসন, বেহেশতের উচ্চতম অবস্থান
আধ্যাত্মিক অর্থ	→	মোমিনের (কাল্‌ব) হৃদয়।
চিন্তামণি	→	যিনি গভীর চিন্তা, ধ্যান বা মোরাকাবার মাধ্যমে স্রষ্টার দূর্বোধ্য গুপ্ততথ্য (রহস্য) উদ্‌ঘাটন করতে পারেন তিনিই একজন চিন্তামণি।
লহু মাফুজ	→	সংরক্ষনাগার (বেহেশ্‌তে অবস্থিত)
আধ্যাত্মিক অর্থ	→	মানবের জ্ঞান ভান্ডার।
মোমেন ব্যক্তি	→	যিনি স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করেছেন। অথবা যার সাথে স্রষ্টার যোগাযোগ আছে, তিনিই মোমেন ব্যক্তি।

মহাগুরু রমিজের জীবন দর্শন, সাধক জীবন ও রচনা-বৈশিষ্ট্য

গুরু রমিজ একজন "সূফী সাধক" ছিলেন। তাঁর জীবন-দর্শন ও সাধনা বৈশিষ্ট্য জানতে হলে প্রাসঙ্গিক কিছু মৌলিক বিষয় অবগত হওয়া প্রয়োজন।

প্রসঙ্গ কথা ঃ (পরিভাষা)।

মারেফত বা মারফত ঃ পরম তত্ত্ব জ্ঞান অর্জন করা ও স্রষ্টাকে সম্যকভাবে জানার যে সাধনা তাই মারেফাত বা মারফত। ইহাকে মরমী সাধনাও বলা হয়।

মরমী অর্থ- আধ্যাত্মিক।

তাহলে মরমী সাধনা হলো ঃ আধ্যাত্মিক সাধনা।

অথবা

অধ্যাত্ম বিষয়ক উপলব্ধির সাধনা।

অথবা

মর্ম উপলব্ধি করণের সাধনা।

অথবা

অজ্ঞেয় অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের সাধনা।

মরমীয়া সাধক ঃ

ধর্মাদির বাইরের আড়ম্বর বর্জন পূর্বক তার মর্মোদ্‌ঘাটনে প্রচেষ্টাকারী (mystic)।

অথবা

সাধারণ বুদ্ধির অতীত গূঢ় ঐশ্বরিক তত্ত্ব (মরমীয়া তত্ত্ব) বিষয়ক জ্ঞানী।

অথবা

যিনি অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন।

অথবা

অতীন্দ্রিয় বিষয়বোধ সমর্থ ব্যক্তি (মরমীয়া সাধক)।

- *স্রষ্টা সম্পর্কিত সাধারণ জ্ঞান ঃ*

১। **এলমূল ক্বাল্‌ব ঃ** যে জ্ঞান চর্চা করলে স্রষ্টাকে (আল-াহ্‌কে) জানা বা চিনার জন্য অন্তরের (হৃদয়ের) জ্ঞান অর্জন করা যায় তাকে এল্‌মূল ক্বাল্‌ব বলে।

২। **এলমূল মুকাশাফা ঃ** যে জ্ঞান চর্চা করলে স্রষ্টার (আল-াহ্‌র) সাথে অন্তরগুআত্মার (হৃদয়-আত্মা) সম্পর্ক খোলা হয়ে যায় বা উন্মোচন হয়ে যায় তাকে এল্‌মূল মুকাশাফা বলে।

৩। **এল্‌মে লাদুন্নি ঃ** যে জ্ঞান চর্চা করলে স্রষ্টার (আল-াহ্‌র) নৈকট্য অর্জন করা যায় তাকে এল্‌মে লাদুন্নি বলে।

বিঃ দ্রঃ অধ্যাত্ম বিষয়ক কোন জ্ঞান দ্বারা জ্ঞান চর্চা করা হলে আরো উচ্চস্তরের জ্ঞান অর্জন করা যায়।

***তাসাউফ ও সূফী-** সূফী মূলতঃ সাফা শব্দ হতে এসেছে। সাফা শব্দের অর্থ হলো পরিষ্কৃত বা পরিষ্কার করণ।

- **তাসাউফ বলতে কি বুঝায় ?**

উত্তর ঃ যে জ্ঞান চর্চা করলে মহান সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধির জ্ঞান অর্জন করা যায় তাকে তাসাউফ বলে।

** তাসাউফের লক্ষ্য হলো "আত্মার শুদ্ধিকরণ"। **

***এল্‌মে তাসাউফ ঃ** যে বিজ্ঞান চর্চা করলে তা মানুষকে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন পূর্বক স্রষ্টার পরিচয় ও তার সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জ্ঞান দেয়, পথ দেখায় এবং স্রষ্টার বিধান মোতাবেক শান্তিময় আধ্যাত্মিক জীবন পরিচালনার শিক্ষা দান করে তাকে এল্‌মে তাসাউফ বলে।

**** সূফী কে ?**

উত্তর ঃ তাসাউফপন্থী মহান ব্যক্তিগণকে "সূফী" বলা হয়।

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত বিজ্ঞান চর্চাকে কেহ কেহ এল্‌মূল কাল্‌ব, এল্‌মে মুকাশাফা, এল্‌মে লাদুন্নী ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন। যার সংজ্ঞা পূর্বেই উলে-খ করা হয়েছে।

বিশেষভাবে উলে-খ্য যে, মহাগুরু রমিজ সূফীবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর আজীবন জীবনাচরণে প্রতীয়মান হয়েছে যে, তিনি ছিলেন একজন মহাসূফী।

- *রমিজ কেন মহাসূফী ?*

উলে-খিত এলমে তাসাউফের সংজ্ঞা অনুযায়ী তাসাউফপন্থী মহান ব্যক্তিই হচ্ছেন একজন প্রকৃত সূফী।

সূফী সাধকবৃন্দের বৈশিষ্টগুলো নিম্নরূপ:

১. আত্মশুদ্ধির জ্ঞান দান করা।
২. স্রষ্টার পরিচয় লাভের জ্ঞান দান করা।
৩. স্রষ্টার সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জ্ঞান দান করা।
৪. স্রষ্টার সাথে যোগাযোগের পথ দেখানো।
৫. নিষ্কলুশ চরিত্র গঠনের পথ দেখানো।

৬. শান্তিময় আধ্যাত্মিক জীবন পরিচালনার শিক্ষা দান করা।

মহাগুরু রমিজের মতাদর্শ মতে তাঁর প্রণীত তিনটি গ্রন্থের উপদেশ ও বাণীগুলোর মর্ম গবেষণা পূর্বক তিনি যে একজন মহান সূফী এর যুক্তি হিসেবে তাঁর যে সকল সিদ্ধবাক্য রয়েছে তা নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ-

১. গুরু রমিজ তাঁর ভাষায় তিনি বলেন-

"আপনার দোষ যেবা ভাবে সব সময়,
সে হইল মহাজ্ঞানী জানিও নিশ্চয়"।

আপ্তবাক্য-১৪ (অলৌকিক সুধা)

আত্মসমালোচনা পূর্বক আত্মশুদ্ধির নিমিত্তে মহাগুরু রমিজ উক্ত আপ্তবাক্য ভক্তদের কল্যাণার্থে তাঁদের খেদমতে পেশ করেছেন। এখানে আত্ম শুদ্ধিকল্পে সর্ব প্রথমে নিজের দোষ বা আত্মার ভুলগুলো নিরূপণ করতঃ তা পরিহার করার জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে।

২.উক্ত বিষয়ে তিনি আরও বলেন-

"তোমার মধ্যে যদি মাত্র কিঞ্চিৎ থাকে ধোকা
আপনাকে দিলে ফাঁকি তুমি ভবে বোকা"।

উপদেশ-৪ (অলৌকিক সুধা)

আত্ম শুদ্ধিকল্পে সূফী-গুরু রমিজ কিঞ্চৎ মাত্র বা সামান্যটুকু ধোঁকা বা ফাঁকি অথবা প্রবঞ্চনা মনে স্থান দিতে পারবে না। ধোকা, ফাঁকি, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি পরিহার করতে হবে।

৩. আত্ম শুদ্ধির জন্য সূফী-গুরু রমিজ আরেক সিদ্ধবাক্যে তাঁর ভাষায় বলেন-

"তোমার মধ্যে যত ভেজাল করিলে বর্জন,
স্রষ্টার অনুগ্রহ তুমি পাইবে তখন"।

উপদেশ-৮ (স্বর্গের সুধা)

এখানে ভেজাল বলতে দেহস্থিত ষড়রিপু, ইন্দ্রিয়াদি ও রমিজ বর্ণিত এগারো ধারার পাপ সমূহকে বুঝানো হয়েছে। সূফী মতবাদ অনুযায়ী আত্মাকে সাফ বা পরিস্কৃত করতে হলে উলে- খিত সর্ব পাপ ত্যাগ করতঃ ভেজাল মুক্ত করার কথাই বলা হয়েছে।

উক্ত সর্ব পাপ হতে মুক্ত পেতে হলে সূফী গুরু রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন-

"ত্রিবেণীর ঘাটে যেবা নিত্য স্নান করে,
কোটি কোটি পাপে তারে গ্রসীতে না পারে"।

উপদেশ-৫ (স্বর্গে আরোহণ)

এখানে ত্রিবেণীর ঘাট বলতে সূফী গুরু রমিজ দেহের চক্ষুকে বুঝিয়েছেন। স্নান বলতে চক্ষের জল-ধারাতে সিক্ত হওয়াকে বুঝিয়েছেন। সর্ব পাপের জন্য অনুতাপের কান্নায় চোখের জল নির্গত হলে, তাকেই ত্রিবেণীর ঘাটে স্নান করা বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, স্রষ্টার কাছে অনুতাপ জনিত কান্নাই একমাত্র জীবনের সর্বপাপ হতে মাফ পেতে পারে।

এলমে তাসাউফ মতে বা সূফী তত্ত্ব মতে স্রষ্টার পরিচয় লাভের জন্য সূফী গুরু রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন-

"যে পর্যন্ত স্রষ্টার তুমি না পাও পরিচয়,
তোমার আরাধনা পুরা হবেনা নিশ্চয়"।

উপদেশ-২ (স্বর্গে আরোহণ)

এখানে সূফী গুরু রমিজ বলেন যে, স্রষ্টাকে না চিনে আরাধনা করলে তা কোন সময়ও ফলপ্রসু হবে না।

৪. স্রষ্টার সাথে ভক্তদের যোগযোগের পথ সম্বন্ধে সূফী গুরু রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন-

"দৈব বাণী, এলহাম, ওহী পাবে নিত্য নিত্য,
যখন যাহা হবে তাহা জানাইবে সত্য"।

উপদেশ-৪ (স্বর্গে আরোহণ)

এখানে, সূফী গুরু রমিজ ভক্ত এবং তাঁর গুরুর নিগুঢ় যোগ সাধনার (মোরাকাবা সাধনার) কথা বলেছেন। এ সাধনার ফলশ্রুতিতে অতীন্দ্রিয়ের মাধ্যমে (এলহাম, ওহী, দৈব-বাণীতে) পরম ভক্ত ও স্রষ্টার সাথে যোগাযোগ হয়ে যায়। স্রষ্টার সাথে এ সমস্ত যোগাযোগের মাধ্যমগুলোকে সূফী গুরু রমিজ তাঁর এবং পরম ভক্তের হাতের তলোয়ার হিসেবে অ্যাখ্যায়িত করেছেন। আর এ বিষয়ে তাঁর এক বাণীর বাক্যে তিনি তাঁর ভাষায় বলেন-

"হাতের তলোয়ার দৈব বাণী,
তার সাথে কেউ টিকবেনা"।

বাণী-১১ (স্বর্গের সুধা)

এখানে ইহাই বুঝা যায় যে, কোন এক সময় রাজা বাদশাগণ তলোয়ার শক্তি দ্বারাই বহিঃশত্রুর আক্রমন হতে নিজকে রক্ষা করতেন। তদ্রুপ সদ্‌গুরু এবং পরমভক্ত যোগ সাধন বা মোরাকাবার মাধ্যমে এলহাম দৈববাণী প্রাপ্ত হয়ে অজানাকে জানতে পেরে সকল রিপু জয় করে বা ধ্বংস করতঃ স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করে অনাবিল আনন্দ এবং শান্তিময় আধ্যাত্মিক জীবন পরিচালনা করতে পারেন।

উপরোক্ত সিদ্ধবাক্য ও বাণীগুলোর মর্ম উপলদ্ধি করতঃ তা কর্মে ও কর্মাচরণে, জীবনে ও জীবনাচরণে অনুশীলন করতে পারলে অবশ্যই নিষ্কলুস চরিত্র গঠিত হবে।

গুরু রমিজ তাঁর সারাটি জীবন ব্যাপী অন্যায়, অবিচার, পাপাচার, ষড়রিপু এবং ইন্দ্রিয়াদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতঃ সফলতা লাভ করে তাঁর সকল পর্যায়ের ভক্তকে আত্মার স্বভাব মুক্তির পথ দেখিয়েছেন এবং ভক্তদের সুবিধার্থে তিনি অধ্যাত্ম্য বিষয়ক তিনটি গ্রন্থ প্রণয়ন করে গেছেন। সূফী ও সূফীতত্ত্বের সকল বৈশিষ্টই তাঁর জীবনাচরণ ও কর্মাচরণের মাধ্যমে যথেষ্ট প্রমাণ রেখে গেছেন। তাই তিনি আমাদের নিকট (পরম ভক্তদের) পরম আরাধ্যতম পরম সূফী বা মহাসূফী হিসেবে হৃদয়ের মণিকোঠায় বসতী স্থাপন করেছেন।

মহাগুরু রমিজ যেভাবে সূফী সাধক (মারেফাতের সাধক) হলেন

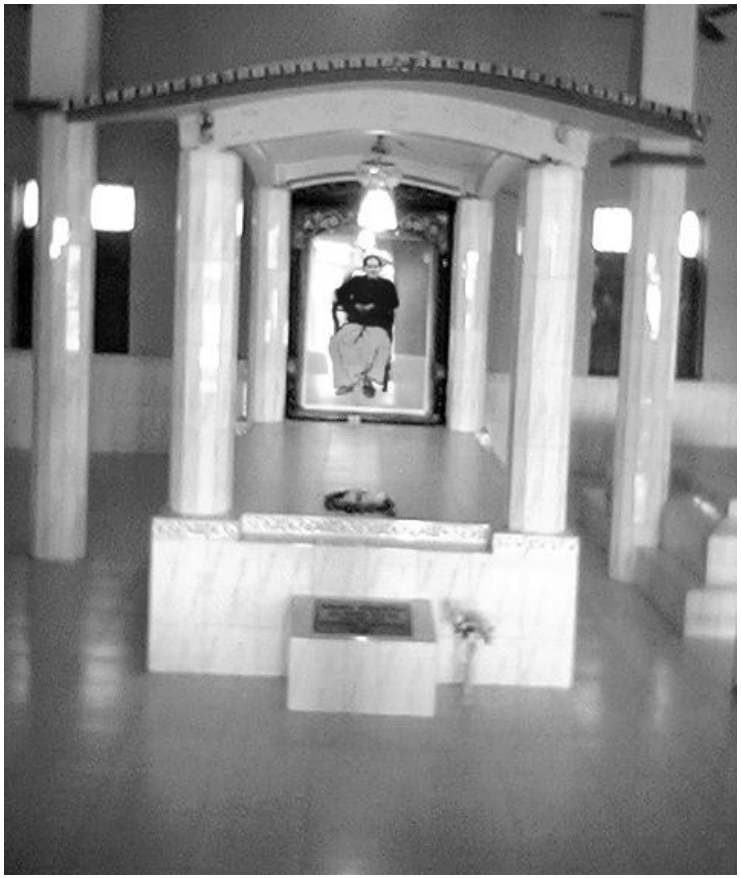

আত্মার পবিত্রতা বা আত্মার ভুল সংশোধন করাই হচ্ছে তাসাউফ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। আর আত্মার এ ভুল সংশোধন করলে আত্মা মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করে। রমিজের মতবাদ অনুযায়ী আত্মা, মুক্তিলাভ বা নির্বাণ লাভ করলে তার আর জন্মচক্রের (৮৪ লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ) আওতায় যেতে হয় না। এ মতবাদ সম্পর্কে পুস্তকের শুরুতেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এবার গুরু রমিজের সূফী সাধন বা মারেফাতের সাধক জীবন নিয়ে আলোচনা করা যাক।

এল্‌মে তাসাউফ পৃথিবীর আদিম মৌলিক জ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান (বিজ্ঞান) যা মহান স্রষ্টা (আল-াহ্‌তায়ালা) প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) কে নিজে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে-

"আর তিনি (আল-াহ্‌) হযরত আদমকে সব বস্তুর নামের জ্ঞান দেয়ার পর ফেরেশ্‌তাদের সামনে হাজির করলেন"। (সূরা বাকারা, ৩১ আয়াত)

মহান স্রষ্টা যে অতীন্দ্রিয় পদ্ধতিতে হযরত আদমকে জ্ঞান দান করেছিলেন তাওই তাসাউফ। এ পদ্ধতিতেই (অতীন্দ্রিয়ের মাধ্যমে) সকল নবী-রাসূল, পীর-পয়গম্বর, অলি-ঋষি, আউলিয়া, অবতার, মহাপুরুষ, মহামানব, মহাজন ইত্যাদি সকলেই স্রষ্টার তরফ হতে বাণী প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

এ পদ্ধতির সাধনাকে "অতীন্দ্রিয় সাধনা" বলা হয়ে থাকে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) একাধারে পনের বছর হেরাগুহায় তাসাউফের সাধনা তথা মোরাকাবা (ধ্যান যোগ সাধনা) করার পর চলি-শ বছর বয়সে তাঁহার নিকট আল-াহ্‌র (স্রষ্টার) পক্ষ হতে ওহী নাজিল হয়। ধ্যান যোগের এ সাধনাও তাসাউফের সাধনা বা অতীন্দ্রিয়ের সাধনা।

প্রকৃত পক্ষে এল্‌মে তাসাউফ আল-াহ্‌ (স্রষ্টা) কে প্রত্যক্ষভাবে জানার মহা বিজ্ঞান। শরীয়ত হচ্ছে ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক আচার-আচরণ সম্পর্কিত দিক নির্দেশনা আর তাসাউফ হচ্ছে আল-াহ্‌র (স্রষ্টার) নৈকট্য লাভের আত্মিক উপায়।

এল্‌মে তাসাউফ ইসলাম ধর্মের সে বিজ্ঞানময় দিক শিক্ষা দেয়, যে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের অন্তরচক্ষু (অতীন্দ্রিয়ের দর্শনেন্দ্রিয়) খুলে যায় এবং অন্তরচক্ষু দ্বারা স্রষ্টার দর্শন লাভ করা সম্ভব হয়। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে যে বিভেদকারী বা পৃথককারী পর্দা (দেহ, মন, হৃদয়, আত্মার কলুষতা বা রিপু) রয়েছে এল্‌মে তাসাউফের (অতীন্দ্রিয় সাধনার) অনুশীলনে সে পর্দা অপসারিত হয়ে যায়। ফলে মহিমান্বিত স্রষ্টার একক সত্ত্বা (পরম অসীম সত্ত্বা) বাস্তবে উপলব্ধি করা যায়।

সমগ্র সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত মানব জাতির জন্য তার প্রভুর পরিচয় জানা এবং প্রভুর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা অতীব প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ। আর এর মধ্যেই মানব জাতির চির শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিহীত রয়েছে।

তাই গুরু রমিজ স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা ও তাঁর নৈকট্য লাভ করার মানসে গৃহ ত্যাগ করলেন। এ সময় তার যৌবন কাল আরম্ভ হয়েছে মাত্র। অল্প বয়সেই তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্রষ্টা-তালাশী জ্ঞানী-গুণী মহৎ লোকদের এবং পীর-ফকির, গুরু-মহাজন, মাওলানা, পাদ্রী, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি মাননীয় ও বরনীয় ব্যক্তিদের

সাহচর্যে এসে স্রষ্টা (আল-াহ/ভগবান) সম্বন্ধীয় জ্ঞান চর্চা শুর“ করেন। দরবেশ, ফকির ও গুর“দেবদের বারামখ্যানা, আখ্ড়া, আস্তানা ও ভজনালয়ে আসা-যাওয়া করতেন। মসজিদ, মাদ্রাসা ও হিন্দুদের ভজনালয়েও যেতেন। নূতন নূতন স্থানে নূতন নূতন ভাবাদর্শের জ্ঞান চর্চা করতেন। শরীয়ত মারেফতের বাউল গানের আসর পেলে সেখানেও যেতেন। বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন স্বাধ ও অনুভূতি অর্জন করতেন।

সকল ধর্ম ও পথের উপর গুর“ রমিজের যথেষ্ট শ্রদ্ধাবোধ ছিল। ভারত বর্ষের খ্যাতনামা মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ইত্যাদি সকল তীর্থস্থান ও পবিত্র স্থানে গমন করতঃ সেখানে আধ্যাত্মিক বিষয়বোধ সম্পন্ন মহান ব্যক্তিদের সহচর্যে এসে আত্মতত্ত্ব বিষয় ও বিষয়বোধ সম্পর্কে জ্ঞান চর্চা করতেন। আর একই কারণে তিনি ভারতের পার্শ্ববর্তী নেপাল, ভুটান, তিব্বত ইত্যাদি দেশের এবং মধ্য প্রাচ্যের ইরাক, ইরান প্রভৃতি দেশে পর্যন্ত পর্যটক হয়ে গমন করতঃ ঐ সকল দেশের তীর্থ স্থান ও পবিত্র স্থান এবং মহা মণিষীদের মাজার শরীফগুলোতে অবস্থান করতেন। এ সকল পবিত্র স্থানের সূফী-পন্থী, অলি-আউলিয়া, দরবেশ-কুতুব, মণি–ঋষি, অবতার মহামানব ও মহাজনদের সাথে সরাসরি অথবা তাঁদের খলিফাদের সংস্পর্শে এসে বহুকাল যাবৎ সূফী-তত্ত্ব ও সূফীদের মূলনীতি যথা আত্মশুদ্ধি করণ ও আত্মাকে পবিত্র করণ পূর্বক স্রষ্টার সাথে সম্যক যোগাযোগ স্থাপনের জ্ঞান ও পথ পাবার সুনির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক সাধনা ও অতীন্দ্রিয় সাধনায় ব্রতী হয়ে গেলেন। তথা হতে তিনি এলমূল ক্বাল্ব, এলমূল মুকাশাফা ও এল্মে লাদুন্নীর জ্ঞান চর্চা করে এ তিন প্রকার জ্ঞানের সমন্বয় করতঃ উক্ত আধ্যাত্মিক পরিবেশে তিনি এল্মে তাসাউফের সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেন।

স্রষ্টার প্রতি সূফী সাধকদের সর্বস্ব অর্পণ বা আমিত্বকে অকুণ্ঠ চিত্তে বিসর্জন দেয়া এবং এর ফলশ্র“তিতে স্রষ্টা ও সূফী সাধকদের নৈকট্য লাভের প্রত্যক্ষ ঘটনা অবলোকন করে গুর“ রমিজ অভিভূত হয়ে পরেন। ইহা সূফী সাধকদের অধ্যাত্ম বিষয়ক মারেফাত বা অতীন্দ্রিয় সাধনারই ফল।

অতঃপর তিনি (গুর“ রমিজ) সূফী সাধকদের মারেফাত বা অতীন্দ্রিয় সাধনা ও সূফী মতবাদকে মনে-প্রাণে ভালোবেসে ফেলেন। তিনি তাঁর নিজ আধ্যাত্মিক জীবন পরিচালনা করার জন্য সূফী মতবাদকেই বেছে নিলেন।

মারেফাত সম্পর্কে গুর“ রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন- ***"হায়রে ছেরাতুল মোস্তাকিম***
মারেফাতে দেখবি সাথে রাব্বিল আলামিন"।

বাণী নং-৫৭ (অলৌকিক সুধা)

গুর“ রমিজ উলি-খিত পরিবেশে জ্ঞান চর্চা করতঃ জ্ঞান অর্জন করে সৃষ্টি কর্তার পরিচয় লাভের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধির জ্ঞান অর্জন করে নিজ আত্মাকে সাফা বা পরিষ্কৃত (সর্ব পাপ অপসারণ) করেছেন। এর ফলশ্র“তিতে তাঁর আত্মাকে পরিশুদ্ধ করণের মাধ্যমে পবিত্র করণ করা হয়েছে। একই সাথে তাঁর অন্তর বা হৃদয়ও পবিত্র এবং পরিশুদ্ধ হয়েছে। তিনি হয়ে গেলেন নিস্পাপ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী।

অতঃপর তিনি এল্মে তাসাউফ (আত্মার শুদ্ধিকরণ ও স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করার জ্ঞান অর্জন করা) নিয়ে নির্জন বা বিজন এলাকায় অবিরত গবেষণা করতে থাকেন। মানুষের আত্মাকে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন পূর্বক স্রষ্টার পরিচয় ও তাঁর সাথে সম্যক যোগাযোগ স্থাপনের জ্ঞান ও পথের দিক নির্দেশনার সুনির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক সাধনা ও অতীন্দ্রিয় সাধনায় (মোরাকাবায়) মগ্ন হয়ে গেলেন। এভাবে আরো বিভিন্ন আধ্যাত্মিক পরিবেশে বহুকাল আত্মনিয়োগ করতঃ সাধনায় সফলতা লাভ করে নিজ দেশের আদি বাসস্থানে ফিরে এসে সূফী সাধনায় মনোনিবেশ করলেন।

এখানেও তিনি মোরাকাবা বা নিগূঢ় ধ্যান যোগে অতীন্দ্রিয়ের যোগ সাধনায় মগ্ন থাকতেন। এ অবস্থায় (মোরাকাবা বা ধ্যানে) কোন এক বিশেষ মুহুর্তে ও শুভক্ষণে সর্ব শক্তিমান স্রষ্টার তরফ হতে তাঁর পবিত্র হৃদয়ে আধ্যাত্মিক দর্শন (Spiritual philosophy) খুলে গেল।

এই দর্শনের আবির্ভাবে তাঁর অন্তরচক্ষু বা দিব্যচক্ষু খুলে গেল। একই সাথে তিনি দিব্যজ্ঞান অর্জন করলেন।

দিব্যজ্ঞান ও দিব্যচক্ষুর আবির্ভাবে তিনি স্রষ্টাকে সম্যকভাবে পাবার পথ পেয়ে গেলেন। পেয়ে গেলেন তিনি স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করা ও আত্মার ভুল সংশোধনের এক সুমহান পথ ও আত্মশুদ্ধি বা আত্মার মুক্তির কর্মের বিধান। এ পথ ও বিধানের মাধ্যমে তিনি ভক্তদের আত্মার শুদ্ধিকরণ ও নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন পূর্বক মুক্তি ও নির্বাণের পথ দেখিয়েছেন।

১. *এ বিধান সৎগুর ্ বা চেতন গুর ্কে কেন্দ্র করে নিষ্কলুষ চরিত্র গঠনের আজীবন অবিরত সৎকর্ম ধারার বিধান।*
২. *এ বিধান আত্মার মুক্তি ও নির্বাণ বা মোক্ষ লাভের বিধান।*
৩. *এ বিধান স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং মানব ও সর্বজীবকে ভালবাসার বিধান।*
৪. *এ বিধান স্রষ্টার নৈকট্য লাভের বিধান।*
৫. *এ বিধান স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং সৎগুর ও পরম ভক্তের প্রেম সাধনার বিধান।*
৬. *এ বিধান সমীম ও অসীমের মিলনের বিধান।*
৭. *এ বিধান মহাবিশ্ব ও বিশ্ব প্রকৃতিতে লয় হবার বিধান।*
৮. *এ বিধানের ধ্যান ও ভাব, সুক্ষ্ম হৃদয়ে ফুটে প্রকান্ড স্বভাব।*
৯. *এ বিধান নিজকে নিজে চেনার বিধান।*
১০. *এ বিধান অতীন্দ্রিয় সাধনের এলহাম, ওহী, দৈববাণী প্রাপ্তির বিধান।*
১১. *এ বিধান খোদকে (নিজকে) চিনে খোদাকে চিনার বিধান।*
১২. *এ বিধান সদ্গুর ্র মাধ্যমে নিষ্কলুষ চরিত্র গঠনের বিধান।*

সর্বসৃষ্টি, সর্বজীব ও মানব কল্যাণে ব্রতী হয়ে গুর ্ রমিজ আধ্যাত্মিক ও মারেফাতের সাধনায় মগ্ন থাকেন। এ অবস্থায় বিশ্বপ্রেম ও ভক্ত প্রেমে প্রেমময়ী হয়ে স্রষ্টার কাছে আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে মোরাকাবা বা নিগূঢ় ধ্যানের মাধ্যমে মারেফাতের উচ্চতম সোপানে (মারেফাতের ৪র্থ স্তর বাকাবিল-াহ্) পৌঁছে সসীম রমিজ অসীম স্রষ্টা ও বিশ্বপ্রকৃতির সাথে বিলীন হয়ে একাকার হয়ে গেছেন। যার ফলশ্র ্তিতে তিনিও এক মহাশক্তিধর, মহাসূফী ও অধ্যাত্মবাদী পরম আধ্যাত্মিক গুর ্ হিসেবে ভক্তদের কাছে প্রকাশিত হলেন।

উলে- খ্য যে, ১৯০৫ সালে দ্বিতীয় বিবাহ্ করায় পারিবারিক কারণে তাঁকে জেলখানায় যেতে বাধ্য করা হয়। জেলখানায়ও গভীর রাতে তিনি মোরাকাবা বা ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। উক্ত ধ্যানের মাধ্যমেই তিনি খুঁজ পেলেন 'পৃথিবী' নামক সত্যিকারের সর্বজীবের জেলখানার সন্ধান। খুঁজে পেলেন তিনি সুমহান স্রষ্টার সৃষ্টি-রহস্য ও আত্মার মুক্তির সন্ধান।

তিনি (গুর ্ রমিজ) সর্বদা অতীন্দ্রিয় অলৌকিক এক অনন্ত শক্তির আরাধনা করতেন।

মোরাকাবা, মহা সাধনা আর মহাত্যাগ ও আত্মকর্মের গুণে গুর ্ রমিজ তার ভক্তদের কাছে মহাসূফী হিসেবে পরিগণিত হলেন। আর তিনি (গুর ্ রমিজ) সর্বদা অতীন্দ্রিয় অলৌকিক এক মহাশক্তির আরাধনা করতেন বলে তাঁর অনেক ভক্ত বিশেষ করে সনাতন ধর্মের ভক্তবৃন্দ তাঁকে মহাসূফী ও মহাশক্তি বলতেন। সর্বকর্মেই তিনি মহা ও মহান এর ভূমিকায় থাকতেন।

মহাগুর ্ রমিজ এক সম্ভ্রান্ত পীর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশের প্রথম সূফী সাধক হচ্ছেনগুআবু হানিফ ইবন্ আবুবকর ইব্রাহীম, যিনি তাঁর সাহিত্যে ব্যবহৃত 'ফরিদ উদ্দিন আত্তার' ('আত্তার'- Pharmacist বা ভেষজ ঔষধ প্রস্তুতকারী) নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি একজন পারস্য দেশীয় মুসলিম সূফী কবি এবং সূফীবাদের তাত্ত্বিক বিশে- ষক ছিলেন এবং তিনি পারস্য কবিতা ও সূফীবাদের উপর একটি চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিলেন।

তাঁর জন্ম ১১৪৫ খৃঃ এবং মৃত্যু ১২২০ খৃঃ। তাঁর জন্মস্থান ইরানের নিশাপুর শহরে। নিশাপুর (Nisapur) সংস্কৃত শব্দ ইহার আরবী উচ্চারণ 'নেয়শাবুর' (Neyshabur)। নিশাপুর উত্তরপূর্ব ইরানের রাজাভি খোরাসান (Razavi Khorasan) প্রদেশে বিনালাউদ (Binalaud) পর্বতমালার পাদদেশের উর্বর সমতল ভূমিতে অবস্থিত। বিখ্যাত কবি ও গণিতবিদ ওমর খৈয়াম, সুবিখ্যাত ইরানী চিত্রকর কামাল উল মলক্, বিখ্যাত মুহাদ্দীস মুসলিম ইবন্ আল্ হাজ্জাজসহ আরো অনেক প্রখ্যাত কবি, মণিষী ও সূফীদের জন্মস্থান এই নিশাপুর শহর।

ফরিদ উদ্দিন আত্তারের সাহিত্যকর্ম, সূফীবাদ (Sufism), অতীন্দ্রিয়বাদ (Mysticism) এবং অধিবিদ্যা (Metaphysics) এর ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে আরো বিশাল পরিসরে বিস্তার লাভ করেছিল। তাঁর উলে- খযোগ্য সাহিত্যকর্ম হলোঃ (Manteq al-Tayr) তায্কেরাতুল আউলিয়া (Tadkeratul Auwlia)। যারা তাঁর সাহিত্যকর্ম ও মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁরা হলেনঃ র"মী, হাফেজ জামী, নাভাই এবং আরো অনেক সূফী কবি।

নাভাই, ফরিদ উদ্দিন আত্তারের জন্মস্থান নিশাপুর শহরে তাঁর (ফরিদ উদ্দিন আত্তারের) মাজার শরীফ প্রতিষ্ঠা করেন। ফরিদ উদ্দিন আত্তার যে সকল স্থানে ভ্রমন করেছিলেন সেগুলো হলো ঃ বাগদাদ, বসরা, কুফা, মক্কা, মদিনা, দামেস্ক, তুর্কিস্থান এবং ভারত।

তিনি ভারতে থাকাকালীন অবস্থায় তাঁর ভারতীয় বংশ বিস্তার লাভ করে। গুর" রমিজের পিতা হলেনঃ পীরে কামেল হযরত খন্দকার হাজী সূফী পানা উল-াহ্। আর তিনি উক্ত বংশের শেজরা শরীফ মোতাবেক একাদশতম পুর"ষ এবং তিনিই হচ্ছেন গুর" রমিজের পীর বা গুর"। মহাগুর" রমিজ হচ্ছেন উক্ত বংশের শেজরা শরীফ অনুযায়ী দ্বাদশতম পুর"ষ।

মহাগুর" রমিজের বংশের শেজরা শরীফ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হযরত সূফী শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রহঃ) হতে ক্রমানুযায়ী মহাগুর" মহাসূফী খন্দকার রমিজ পর্যন্ত সবাই সূফী ও সূফী তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

মহাগুর" রমিজ একজন প্রকৃত সূফী হয়েও কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তত্ত্বসমূহের তত্ত্ববিদ হয়ে আজীবন অবিরত তত্ত্ব সংশি-ষ্ট সাধনায় মগ্ন ছিলেন। রমিজ পরবর্তী সময়ে বা বর্তমানে যারা তাঁর উত্তরসূরী হয়ে কর্ম করছেন তারাও সূফীবাদসহ কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদে গভীর বিশ্বাস রেখে রমিজ বিধান অনুযায়ী সকল কর্ম সাধন করছেন। মহাগুর" রমিজ সূফী তত্ত্ব বা অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব অতীন্দ্রিয় সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন তা তাঁর নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যের একটি। আর তা হলো তাঁর নীতির বৈশিষ্ট্যগুলোর ৮ম বৈশিষ্ট্য। এই তত্ত্বের বিস্তারিত বিবরণ অত্র পুস্তকে পূর্বেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

প্রত্যেক ধর্মেই এমন কিছু নীতি আছে যা সকল ধর্ম মত ও পথের অনুসারীদের কাছে গ্রহণযোগ্য। এই গ্রহণযোগ্য নীতির অন্যতম হচ্ছে মানবতাবাদ (Humanism)। গুর" রমিজের জীবনে ও জীবনাচরণে, মন ও মননে, কর্মে ও সাধনায় মানবতাবোধ ছিল প্রবল। ধর্মের যাগযজ্ঞময় আনুষ্ঠানিকতা-বিরোধী গুর" রমিজের নিকট কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে বৌদ্ধ, কে খ্রিস্টান তা বিবেচ্য বিষয় নয়। আত্মশাসন ও আত্মজ্ঞান লাভই মূল বিষয়। সকল ধর্ম ও মতের লোকদেরকেই তিনি সমমর্যাদা দিতেন।

ধর্মের বাহিরে আড়ম্বর সম্বন্ধে তিনি তাঁর এক আপ্তবাক্যে বলেন- ***"যাগযজ্ঞে নাহি হয় ঈশ্বর উপাসনা***
অরণ্য রোদনে কিন্তু কেহ শোনে না"

আত্মশাসনে বিজয়ী হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য তিনি তাঁর ভাষায় বলেন- ***"জাগরে এবার মেলরে আঁখি***
বলেরে হুংকারে কর্ণকুহরে দিন নাই বাকী।

১। ----------
২। বিজয়ী হও তুমি আত্ম শাসনে, দূর কর ভেজাল মহাজ্ঞানে,

জ্ঞানের সেবক হও ভূবনে, ছেড়ে দেও ফাঁকি"।

তিনি নিরব সাধনা পছন্দ করতেন। নিরব সাধনা বা ধ্যান করার নিমিত্তে তিনি তার মূল বাড়ি ছেড়ে নিজ গ্রামের প্রবহমান এক নদীর (আর সি. নদী) তীরে গ্রামবাসী হতে বিচ্ছিন্ন স্থানে বাড়ি নির্মাণ করেন। নিজ স্ত্রী এবং ছেলেওমেয়েদের কোলাহল থেকে মুক্ত থাকার জন্যে ১৯০৫ সালে উঁচু দোতলা ঘর নির্মাণ করতঃ দোতলার নির্জন কোঠায় ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তিনি তাঁর জীবনের শেষাংশে একাধারে চব্বিশ বছর উক্ত দোতলার নির্জন কক্ষে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। বাইরে কোথাও যেতেন না। তার মধ্যে যোগসাধনা ছিল প্রবল।

অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধ মহাগুরু রমিজ নিরহংকার, কর্তব্য সচেতন এবং অসীম ধৈর্য্যের অধিকারী ছিলেন। দিব্যজ্ঞানী রমিজ তাঁর পূর্বের থান কাপড় ও শাড়ি কাপড়ের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ভক্ত কল্যাণে সাধনলব্ধ তত্ত্বজ্ঞান, আত্মতত্ত্বজ্ঞান, গুরুতত্ত্ব ও গুরুতে অর্পণ, জ্ঞানতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব ইত্যাদি তত্ত্বচর্চা নিয়ে মগ্ন থাকতেন। এক মূহুর্তও তিনি অযথা সময় নষ্ট করতেন না।

তিনি উপরোলি- খিত চব্বিশ বছর সময়ে ভক্ত নিয়ে আধ্যাত্মিক বিষয় আলোচনা ও বাণী রচনা নিয়ে সময় কাটাতেন। গভীর রাতে ধ্যানস্ত অবস্থায় থাকতেন। তাঁর আধ্যাত্মিক প্রেমের গুণে তার পরম ভক্তগণ তাদের পরম আত্মাকে তাঁর পরম আত্মার সাথে বিলীন করে দিতেন। তিনি হয়ে যেতেন পরম-গুরু সিদ্ধ-পুরুষ। তিনিও তাঁর পরমআত্মা জড়িত মহাশক্তির আবেশ দ্বারা ভক্তদেরকে মহান হৃদয়ে স্থান দিতেন। এ অবস্থায় তিনি নিত্য দিনের নিত্যকর্মের সময় তাঁর বারামখানায় (বর্তমান রমিজ ভবন) ভক্ত নিয়ে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিশে- ষণে পরম আনন্দে বিভোর থাকতেন।

পরম গুরু হয়ে তিনি সকল ভক্তের সর্ব কর্ম গ্রহণ করতঃ অতীন্দ্রিয় সাধনের মাধ্যমে ভক্তের সর্ব পাপ মোচন করে তাঁদের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করতেন। ভক্তের সর্ব পাপ গ্রহণ করতঃ উক্ত পদ্ধতিতে ভক্তের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করাই শেষ চব্বিশ বছর তাঁর সাধনার মূল বিষয় ছিল। একমাত্র ইহাই ছিল তাঁর ধ্যান, ধারণা ও কর্ম সাধনা।

তাই তিনি তাঁর ভাষায় বলেন- ***"গুরু না করলে গ্রহণ***
কর্মফল হয় না কর্তন"। বাণী-৪৩ (স্বর্গে আরোহণ)

"স্বর্গে আরোহণ" পরম ভক্তকে চেতন গুরুর কাছে অবনত চিত্তে আত্মসমর্পণ ও আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে উভয়ের পরিপূরক যুগল সাধনা এবং যোগ সাধনায় লিপ্ত হতে হবে। তবেই গুরু-ভক্তের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবে।

যোগ সাধনা ঃ যোগ মানে ঐক্য, মিলন, সম্পর্ক, সংসর্গ, অবলম্বন, মাধ্যম। হিন্দু দর্শন মতে- জীব আত্মা ও পরম আত্মার মিলন, তপস্যা, ধ্যান (মোরাকাবা- মুসলিম মতে), সাধনা, সাধনার পথ, কর্ম কৌশল।

গুরু রমিজ যোগসাধনায় (ধ্যান বা মোরাকাবায়) ছিলেন একনিষ্ঠ। প্রকৃত পক্ষে ভারতীয় দর্শনে যোগকে দর্শনের একটি শাখা রূপে গণ্য করার মূলে রয়েছে দর্শনের সাথে মানব জীবনের নিগূঢ় সম্পর্কের স্বীকৃতি। অধ্যাত্ম জীবনের বিশেষ ক্ষেত্রে যাতে পরমসত্ত্বা (স্রষ্টা) ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হন সে জন্যেই যোগকে আধ্যাত্মিক দর্শনের অংশ হিসেবে মর্যাদা দান করা হয়েছে।

বস্তুত অমরত্ব লাভ প্রয়াসই যোগ সাধানার মূল লক্ষ্য। আর এ পথে গুরুবাদ বা গুরুর পথ নির্দেশনা অনস্বীকার্য। সে জন্যেই ফকির, সাধু, সন্যাসী, মুণি-ঋষি, অলি সবাই অকুণ্ঠ চিত্তে গুরুপদে সর্বস্ব নিবেদন করে থাকেন। গুরু রমিজের মতাদর্শে কোন মহিলা গুরু হতে পারেন না। যিনি গুরু হবেন তিনি অবশ্যই রমিজ মনোনীত প্রতিনিধির নিকট হতে এজাজত প্রপ্ত হতে হবে। তিনি প্রতিনিধির আদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী কোন সত্য সন্ধান কারীকে ভক্ত করতে পারেন।

গুরু রমিজের বিধানেও আত্মার মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করার জন্য অথবা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার নিমিত্তে একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, নিষ্কলুষ এবং চৈতন্য মানবগুরুর প্রয়োজন এবং এই গুরুর নির্দেশনা অনুযায়ী যোগ সাধনা অনুশীলন করতে হবে।

আর সে জন্যেই লালন তাঁর ভাষায় বলেন- ***"ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার***
সর্ব সাধন সিদ্ধ হয় তার"।

উক্ত বিষয়ে বা গুরুকরণ সম্পর্কে মহাগুরু রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন- ***"সদ্‌গুরুর চরণে তোমার বিকাইও জীবন***
অন্তর্যামী অন্তরের ব্যাথা করিবে বারণ"। উপদেশ-১৭ (অলৌকিক সুধা)

উক্ত যোগ সাধনা প্রসঙ্গে গুরু রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন- ***"চিন্তা কর চিন্তামণি সে কোথায়,***
আরশ কুরছি লহুমাফুজে
লেখতে আছে সর্বদায়"। বাণী-১৮ (অলৌকিক সুধা)

এখানে, যিনি গভীর চিন্তা, ধ্যান বা মোরাকাবার মাধ্যমে স্রষ্টার দূর্বোধ্য গুপ্ততথ্য (রহস্য) উদঘাটন করতে পারেন তিনিই একজন চিন্তামণি। সৃষ্টির বিষয়াদি নিয়ে যে পবিত্র স্থানে (আরশ) অবস্থান করতঃ স্রষ্টা তাঁর আসনে (কুরছি) বসে সর্ব সৃষ্টির তদারক করেন, তা হচ্ছে আরশ কুরছি। (আলমেআরওয়ায় অবস্থিত)।

উক্ত বাণীর অংশে মহাগুরু রমিজ স্রষ্টার অবস্থান সম্পর্কে (মোরাকাবা বা ধ্যান) করতঃ তথ্য নিরূপণ করার কথাই বলছেন। একই সাথে সেখানে সর্ব জীবের সকল কর্ম ও সর্ব সৃষ্টির তথ্য সর্বদা লিখে রেখে রেকর্ড করতঃ সংরক্ষণাগারে (লহুমাফুজ) সংরক্ষণ করা হয় তার কথাও বলেছেন। এ বিষয় সম্মন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করার জন্য গুরু রমিজ চিন্তামণিদের আহ্বান করেছেন।

গুরু রমিজ বাস্তবে একজন মরমী সাধক ছিলেন। চিন্তা ও চেতনায়, বাস্তব বিশ্বাস ও মননে, সূফী বা মরমী সাধকগণ একেশ্বরবাদী প্রেমবাদী।

রমিজ ছিলেন "স্রষ্টা এক এবং সর্বজীবে, সর্বভূতে সর্বময় বিরাজিত" এই নীতিতে বিশ্বাসী। তিনি সর্বদা এক স্রষ্টা প্রেমে আত্মমগ্ন ছিলেন। এ সাধনাতে পূর্বোলি-খিত মুর্শিদ বা গুরুকরণ বা গুরু ধরা অবশ্যম্ভাবী। প্রেমের মাধ্যমেই সূফী সাধকগণ পরম করুণাময় ও আনন্দময় সত্ত্বার সান্নিধ্য কামনা করেন। বস্তুতঃ সূফীবাদকে Islamic Mysticism বা ইসলামীয় মরমীয়াবাদ বা মানবতাবাদ (Humanism, divotion to human interests) বা অতীন্দ্রিয়বাদ বলা হয়।

মানবতাবাদ অনুসারে স্রষ্টার সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলনেই মানবের একমাত্র সার্থকতা। কিন্তু এই মিলন বুদ্ধির অতীত স্তরের কোন জ্ঞান প্রসূত বা কোন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ামূলক নয়, ইহা একান্তভাবে হৃদয়াবেগ প্রসূত। মনে রাখতে হবে *"প্রেমই স্রষ্টা ও মানুষের পরিপূর্ণ মিলনের সেতু"*। এই মিলনে মানবের ব্যক্তিগত সত্বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে ঐশ্বরিক সত্বায় পরিণত হয়। মানব এবং ঈশ্বর, আল-াহ্ বা স্রষ্টা তখন ঐক্য লাভ করতঃ উভয়ে একাকার হয়ে যায়। *এই ঐশ্বরিক ঐক্য লাভই গুরু রমিজের (সূফীদের) চরম লক্ষ্য।*

এই সাধনা একাত্মবোধের সাধনা। আল-াহ্, ব্রহ্ম বা স্রষ্টাকে লাভ করা নয়, তাঁর সাথে এবং তাঁর জাতের সাথে লয় হওয়া বা বিলীন হয়ে মিশে যাওয়াই মূল বিষয়। এ পর্যায়ে সাধক বলতে পারেন *"আমি বাকাবিল-াহ্ স্তরে পৌঁছেছি বা আমি আল-াহর (স্রষ্টার) জাতের সাথে মিশেছি বা বিলীন হয়েছি"*। অথবা সনাতন ধর্মের সাধক বলতে পারেন **'অহংব্রহ্মোস্মি'** আমি ব্রহ্ম হয়েছি।

গুরু রমিজ একজন বিশিষ্ট কর্মবাদী ছিলেন। কর্মই ছিল তাঁর মূল মন্ত্র। মানব সৃষ্ট ধর্মের নামে যাগযজ্ঞময় প্রাচীন প্রথা বর্জন করতঃ গুরু রমিজ ধর্মের ভিতরের মূল নিগূঢ় রহস্যময় মানবতাবাদী করণীয় কর্মগুলো অনুশীলন করতেন।

যে সমস্ত কর্ম করলে মানব, সর্বজীব ও সর্বসৃষ্টির কল্যাণ বয়ে আনবে ঐ সমস্ত কর্মের মধ্যে তিনি একনিষ্ঠভাবে আত্মমগ্ন ছিলেন।

তাঁর কর্মবাদ নীতির মতবাদ অনুসারে ধর্ম মানেই কতগুলো দৈহিক, আর্থিক এবং মানসিক বৈধ কর্মের কর্মাচরণ। যার মাধ্যমে মানবাত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন ও নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন করা সম্ভব। আর এর মধ্যেই রয়েছে মানব জীবনের কল্যাণ, শান্তি, সমৃদ্ধি এবং মুক্তি।

কর্ম ছাড়া কোন ধর্ম হতে পারে না। কর্মই ধর্মের মূল। তাঁর জীবনে তিনি (রমিজ) কর্মকে অত্যাধিক মূল্যায়ন করতেন। তাঁর মতে কর্মই ধর্ম। সব কিছুর মধ্যে তিনি আত্মকর্মকেই বড় মনে করতেন।

কর্ম-ধর্ম বিষয়ে রমিজ তাঁর এক আপ্তবাক্যে বলেন- ***"সবচেয়ে বড় হল আপনার কর্ম,***
বিশ্ব মাঝে কর্ম ছাড়া নাহি কোন ধর্ম"। উপদেশ-০১ (অলৌকিক সুধা)

গুরু রমিজ তাঁর সঙ্গীত বা বাণীর তিনটি পুস্তক রচনা করেছেন। এ তিনটি পুস্তকের সঙ্গীতগুলোর মধ্যে আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, লোকজ, মরমী বা মারফতি, বাউল, ধ্রুপদ (ক্লাসিক্যাল), বিচ্ছেদ, শ্যামা ও স্তুতি ইত্যাদি রয়েছে। তিনি তাঁর রচিত বাণীতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকল ধর্মের মানুষকে সমঅধিকার প্রদান করেছেন। সকল ধর্মেই মানবতার সমর্থন রয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

সকল ধর্মের সার কথার সমন্বয়ে মানবতার ধর্মকেই (Human Religion) তিনি উর্দ্ধে তুলে ধরেছেন। মহাগুরু রমিজের বাণী দিব্য (অলৌকিক বা স্বর্গীয়) প্রেরণায় রচিত। *প্রেম-বিচ্ছেদে, বিষাদে, আত্মশাসনে, আত্ম চেতনায়, গুরু আদেশে-আশীর্বাদে, আশা-আকাঙ্ক্ষায়, আনন্দ-বিরহের উপাদানে রচিত এসব বাণী বা গানের ভিতর ধ্যানমগ্ন দিব্যানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে যা কখনো সহজ, কখনো রূপকের আবরনে প্রচ্ছন্ন।*

গুরু রমিজের রচনায় মিষ্টিক স্পর্শ (মরমী বা অতীন্দ্রিয়বাদী) যেমন সুস্পষ্ট তেমনি তাঁর অনেক গান সাহিত্যের দিক থেকে চিরস্থায়ী অমূল্য সম্পদ।

'পাখি' এই রূপক লালন শাহ্‌র গানে যেমন পাই তেমনি গুরু রমিজের অনেক গানেও এই পাখির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। লালন শাহ্ যেখানে বলেছেন-
"খাচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়"।

সেখানে গুরু রমিজ বলেছেন- ***"অচিন এক পাখি কি সুন্দর***
দীল কাবাতে নিজ ইচ্ছাতে বিরাজ করে নাই তার ডর"।

রমিজের অনেক বাণীতে পাখির উপমা বার বার এসেছে। দেশজ অতি পরিচিত এই পাখি রূপকের মাধ্যমে (উপমার মাধ্যমে) উভয় লোক কবিই আমাদেরকে এক নতুন ভাব রাজ্যে নিয়ে যান। রমিজের বাণীতে, আদেশ-উপদেশে বা আপ্তবাক্যে অধ্যাত্ম চেতনার সুর অনুরনিত বা প্রতিধ্বনিত। সনাতন ধর্মের যারা শ্যামা মায়ের নামে পশু বলিদান করছেন তাদের তিনি অজ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

গুরু রমিজের মতে শ্যামা মা মানবসহ সকল প্রাণীরই মা। মায়ের মনোরঞ্জন বা মাকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্তে তার এক সন্তান অপর এক বা একাধিক সন্তানকে মায়ের চোখের সামনে বধ করবে ইহা হতে পারে না। মায়ের কাছে সকল সন্তানই সমান এবং সমঅধিকার ও মমতা প্রাপ্য।

পশু বলিদানের বিষয়টি মায়ের কাম্য নয়। পশু বলিদান পূর্বক ইহার মাংস উদরস্ত করার প্রচলিত প্রথা মানব রচিত একটি লিপ্সা বা লোভ জাতীয় অপসংস্কৃতি বিশেষ। এ প্রসঙ্গে রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন- ***"মা তোরে কে বলে কালি***
তুমি আদ্যাশক্তি মহামায়া ভক্তেরে দেও চরণ ধূলি"।

১। ----------
২। ----------
৩। তুমিতো ত্রিজগত মাতা, অন্তরে তোর নাইগো ব্যাথা মা হয়ে সন্তান হত্যা, এ বিধান তুই কেমনে দিলি।
৪। রমিজ বলে মায়ের সন্তান, মায়ের কাছে সকল সমান
মায় চায় না সন্তানের প্রাণ, অজ্ঞান যারা দেয়রে বলি।

গুরু রমিজ অনেক শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছেন। শ্যামা মায়ের প্রতি তাঁর অনেক শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে। মায়ের স্তুতিমূলক অনেক বাণী তিনি রচনা করেছেন।

শ্যামা মাকে অনেক কাছে পাবার পথ দেখানোর জন্য এবং মায়ের চরণ (বিধান) তার অন্তরে স্থাপন করতঃ মায়ের কৃপা ও দয়া পাবার জন্য স্তুতি বাণীতে ব্যাকুল হয়ে আকুল আবেদন জানিয়েছেন।

তাঁর ভাষায় তিনি শ্যামা মাকে অতি কাছে পাবার জন্য এবং তাঁর চরণ ধূলি পাবার আশায় বলেন- ***"মাগো তুমি থাক কাছে***
আমি তোমার অজ্ঞান ছেলে তুমি ছাড়া আর কে আছে"।

১। তুমি মা আঁধারে আলো, পথ দেখায়ে নিয়ে চল
ভয় আর কারে করি বল, তুমি যদি থাক পাছে।
২। মাগো আমি যেন না যাই ভুলে, এই নিবেদন চরণ তলে
কৃপা কর অধম বলে, তুমি বিনে সব মিছে।
৩। রমিজ বলে মায়ের চরণ, অন্তরেতে কর স্থাপন
যত দুঃখ তোর হবে বারণ, মায়ের দয়া যে পেয়েছে।

গুরু রমিজের বাণী রচনার উলে-খযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো তিনি অল্প বয়স হতেই রচনা আরম্ভ করেন। তিনি যা কিছুই রচনা করতেন তা সাথে সাথে অন্যেরা লিখে রাখতেন। এ বিষয়ে চিন্তাগুভাবনা করে তিনি সময় কাটাতেন না। তাৎক্ষণিক রচনা করা এবং ভক্তগণ তা লিপিবদ্ধ করে রাখা, ইহা ছিল তাঁর সারাজীবনের একটি রচনা নৈপুণ্য। বাল্যকাল হতেই তিনি তৎকালীন কবিগানের আসরে পরিবেশগতভাবে তাৎক্ষণিক রচনা করে এবং স্বরচিত গান গেয়ে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতেন।

ক্রমে ক্রমে তিনি পরিবশেগত কারণে মারেফাত জগতে ঢুকে পরেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে মারফতি গান রচনা করতে থাকেন। এ সমস্ত গানের কথা বা বাণী তাঁর নিজ গ্রামের ভক্ত জনাব মুন্সী আব্দুল মান্নান সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। রমিজ তেমন কোন লেখাপড়া জানা লোক ছিলেন না। তাঁর মধ্যে শিক্ষিত পটুত্বের চেয়ে স্বতঃস্ফুর্ততাই বেশি ছিল। রচনার এ বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে প্রকৃতিগতভাবেই অর্জিত হয়েছিলো। প্রকৃতির সাথে তিনি লয় হয়ে গেছেন। তাই, তিনি ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক স্বভাব কবি। *মহাবিশ্ব প্রকৃতিই ছিলো তাঁর শিক্ষাগুরু।*

তিনি তাঁর রচনায় বাংলা শব্দ বা বাক্যের সাথে কোর-আন ও হাদীস এর আরবী শব্দ ও বাক্য অতি চমৎকারভাবে সংযোজন করতেন। ইহাতে সুর ও ছন্দের অতি চমৎকার মিল ছিলো। এ ধরনের একটি বাণী তাঁর ভাষায়- ***"হায়রে অতারা জেউনা***
ওমা ইউদলি মিউন ফাহুন কুল হামুনা।"

১। মনরে লায়ল-া কুম লাইউবছেরুন তাসকুরুন,
ছোম্মুন বোকমুন ইয়া রাউন আনফুছুনা।

২। *আজরা নারান তাওকাদান ইয়া মোশরেকিনা,*
লাহাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইন্নাহু কান।
৩। *ইন্না রামিজা মোস্তাকিনা ফাছাম্মা ওয়াজহুনা,*
আল-া ইন্না তাওক্কালতু ইন্নাকা রাব্বানা।

বাণী-১৭১ (স্বর্গে আরোহন)

গুর" রমিজের মধ্যে এল্‌মে মারেফাত প্রকৃতিগতভাবেই উন্মোচিত হয়েছে এবং একই ধারায় তাঁর মধ্যে সূফীতত্বের তত্ত্বজ্ঞান বা এল্‌মে তাসাউফের তত্ত্বজ্ঞান অর্জিত হয়েছে। সূফীদের তত্ত্ব অনুযায়ী তিনি আত্মশুদ্ধি করতঃ তাঁর আত্মাকে পরিশুদ্ধ (পবিত্রকৃত) করেন এবং বিশ্ব প্রকৃতি ও স্রষ্টার কাছে নিজকে বিলীন করে দিলেন।

এ আত্মবিলীন করা অবস্থায় তাঁর ভাষায় তিনি বলেন- ***"তুমি বিনে কারে কই আপনা বন্ধুয়ারে,***
কে বুঝবে আমার বেদনা"।

১। *বন্ধুরে, তুমি আরশিলে- মোমেনা, ব্রহ্মান্ডে আছে জানা,*
দেখাও তুমি কুন্‌ফাইয়া কুনা অ বন্ধুরে, জীবনের যত পাপ,
এবার তুমি কর মাফ রে, এ হল আমার আরাধনা।
২। *বন্ধুরে, তুমিত দয়াল পতি, তুমি বিনে নাই গতি;*
তুমি ছাড়া কারে কই আপনা অ বন্ধুরে, জানাও তুমি দয়া করে
দ্বীনহীন এ দাসেরে, কি দিয়া তোর করি ভজনা।
৩। *বন্ধুরে, আমি অপরাধী এ ভূমন্ডলে, জানাই তোমার চরণ তলে,*
কি করিলে হইবে মার্জনা অ বন্ধুরে, দয়া করে এ দাসেরে,
দেও দেখা থাক ঘরে রে, শ্রীচরণ তোর করি বন্দনা।
৪। *রমিজ কয় কে বুঝবে বেদন, তোর পদে এ নিবেদন*
দেখা দিয়া পুরাও বাসনা অ বন্ধুরে, যদি তুমি থাক ধারে,
চাইনা কিছু এ সংসারে রে, দাসেরে দেও চরণ দু'খানা।

বাণী-৫৯ (স্বর্গের সুধা)

গুর" রমিজের বাণী রচনার আরো একটি বৈশিষ্ট্য বা কৌশল হলো এই যে, তিনি বাণীর আরম্ভে (স্থায়ীতে) কোনো একটি বিশেষ বিষয়ের সমাধান পাবার নিমিত্তে একটি প্রশ্নমূলক সমস্যা উপস্থাপন করেন। অতঃপর প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি অন্তরাতে (বিষয়ের বর্ণনাতে) বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত এবং বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সর্বশেষ অন্তরায় (স্তবকে) তিনি তাঁর নাম উলে- খ করতঃ বাণী আরম্ভের উলে- খিত সমস্যাটির একটি চমকপ্রদ দার্শনিক সমাধান দিয়ে থাকেন।

রচনার এই একটি রীতির মাধ্যমে সকল পাঠক/পাঠিকা রচিত বিষয়ের উদ্দেশ্য, সমস্যা ও সুষ্ঠ্য সমাধান পেয়ে থাকেন।

উদাহরণ স্বরূপ তাঁর একটি বাণীতে তাঁর ভাষায় বলেন- ***"মন দেখে শুনে কেন আছ ভুলে ?***
আসা যাওয়া তোর হল না বন্ধ
খেটে মরবি ভবের জেলে"।

১। *আসা যাওয়া জীবের কর্মগতি, কারে তুমি জানাও স্তুতি,*
কেহ নয় কার সাথী, ভালমন্দ সব কর্মফলে।
২। *কেউ কানা কেউ দেওয়ানা, কেউ লেংড়া কেউ খেতে পায় না,*
কেউ করে আমীরানা, বিচার কর নিজের দিলে দিলে।
৩। *তুমি বল আন্‌ছি ইচ্ছা করে, যা চেয়েছি দিয়েছে মোরে,*

আমি বলি তা হয় কি করে, পিতায় কি কখন ফেলে জলে ?
৪। যদি বল এইসব বিধির ইচ্ছা, তবে সাধন ভজন সবই মিছা,
সমান হবে রাজা প্রজা, বিচার হবে না কোন কালে।
৫। রমিজ কয় এইসব শোনা কথা, এ কথার নাই আগামাথা,
ঠিক করে নেও কর্মখাতা, মুক্তি পাবি ধরাতলে। - বাণী-০১ (অলৌকিক সুধা)

এই বাণীর মূল বিষয়বস্তু হলোও মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী বা জীবের জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে আসা এবং মৃত্যুর পর আবার চলে যাওয়া প্রসঙ্গে। এ বিষয়টি আমরা দৈনন্দিন দেখছি। আত্মার ভুলের জন্যই পুনরায় তাঁর জন্ম নিয়ে ভবরূপ জেলখানায় আসতে হয়। গুরু রমিজ পৃথিবীকে কর্মফল ভোগ করার একটি জেলখানা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

এ বিষয়টি বিবেক ও জ্ঞান দ্বারা দেখে শুনেও মানুষ কেন ভুল করছে তাওই মনকে বিবেক দ্বারা জিজ্ঞাসিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, এখানে বাণীটির প্রথমেই পৃথিবীতে আত্মার আসা যাওয়া নিয়ে একটি সমস্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। বাণীটির ১ হতে ৪ নং অন্তরা পর্যন্ত লেখক বিভিন্ন বাস্তবমূখী যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক ৫ নং সর্বশেষ অন্তরার কথা অনুযায়ী প্রমাণ করেছেন যে, জন্মচক্র হতে মুক্তি পেতে হলে একজন চেতন গুরু বা সৎগুরুর মাধ্যমে সঠিক কর্ম তালাশ করে তাঁর প্রদর্শিত বিধান ও আদেশ মোতাবেক সকল কর্ম সম্পন্ন করতে হবে এবং তাহলেই পৃথিবীতে আসা যাওয়া বন্ধ অথবা রোধ হয়ে যাবে।

এভাবে গুরু রমিজ তাঁর বাণীগুলোর প্রথমেই সমস্যা জড়িত জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করেন এবং অবশেষে তিনি নিজেই তাঁর সমাধান দিয়ে থাকেন।

এই রীতি অনুসারে তাঁর ভক্তগণ রচিত বাণীগুলোর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জটিল সমস্যা ও উহার সমাধানের পথ পেয়ে থাকেন। মহাগুরু রমিজ এই প্রক্রিয়ায় তাঁর ভক্তগণকে জ্ঞানার্জনের কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। *ইহা একটি অভিনব অধ্যাত্ম বিষয়ক জ্ঞান চর্চার পথ ও পাথেয়।*

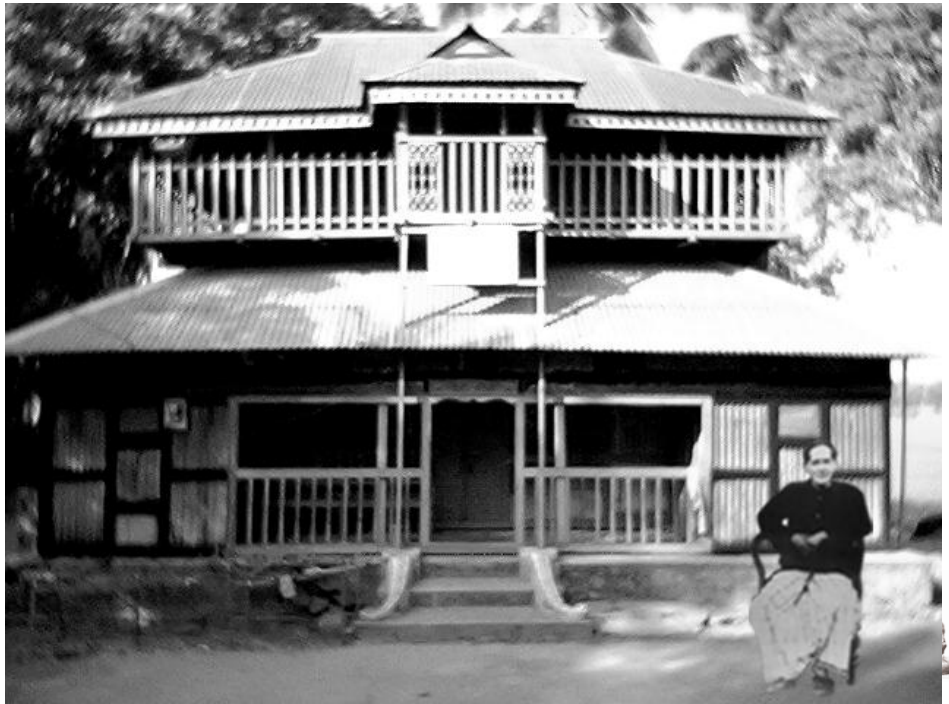

রমিজ বাণীতে উলে-খিত পরিভাষা সমুহ

মহাগুরু রমিজ তাঁর অনেক বাণীতে বন্ধু, বন্ধুরে, সখি, সখিগো, শ্যাম বন্ধু, প্রাণ বন্ধু, সুবল ইত্যাদি সম্বোধন সূচক শব্দ চয়ন করতঃ বাণীগুলোতে পরিভাষা হিসেবে প্রয়োগ করেছেন। উলে-খিত পরিভাষাগুলো তিনি যে অর্থে বা ভাবার্থে ব্যবহার করেছেন তা তার ভক্তদের সুবিধার্থে নিম্নে উলে-খ করা হলো ঃ

১. *মন/মনরে* → *চিত্ত, অন্তঃকরণ, অন্তরিন্দ্রিয়, হৃদয়, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি।*

২. *মন-মাঝি* → *দেহ - মন - হৃদয় - আত্মা - জ্ঞান ইত্যাদির পরিচালক। এ পরিচালক, বাণীর উদ্দেশ্য ও*

অর্থভেদেও গুরু, মহাগুরু, পরমাত্মা, ব্রহ্মা বা স্রষ্টা ইত্যাদি হতে পারে।

৩. *বন্ধু, বন্ধুরে* → *মিত্র, সখা, হিতৈষী, কল্যাণকারী ব্যক্তি, সুজন, প্রিয়জন ইত্যাদি।*

৪. *সখি/সখী* → *সঙ্গী, সহচর, সুহৃদ।*

৫. *শ্যাম/শ্যাম বন্ধুয়া* → *ভালবাসার পাত্র বা প্রেম করা হয়েছে এমন পাত্র। যেমম- গুরু, কৃষ্ণ, স্রষ্টা, পরমাত্মা ইত্যাদি।*

উক্ত পরিভাষাগুলো রমিজ বাণীর একটি বৈশিষ্ট্য।

তাছাড়াও তাঁর আরো বৈশিষ্ট্য হলো যে-

গুরু রমিজ আধ্যাত্মিক কর্মকান্ডে লোক দেখানো বেশ-ভূষাকে কখনো পছন্দ করেননি। *লাল-সাদা ইত্যাদি রং-বেরংয়ের কাপড় পড়ে, লম্বা চুল এবং মাথায় জটা রেখে, গলায় তজবী ঝুলিয়ে যেমন সাজ তেমন হয়ে বহুরূপী ভাব ধরে মানুষকে আকৃষ্ট করে মন ভুলানো, মন মাতানো, লোক ঠকানো, লোক দেখানো, ভাওতাবাজী, ফকিরীর অভিনয় বা ভান করাকে তিনি সব সময়ই অপছন্দ করতেন*। তিনি এ সমস্ত বর্জন করে আত্মজ্ঞান দ্বারা নিজকে নিজে চিনার কথা বলেছেন।

ঐরূপ ভন্ড লোকদের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর ভাষায় বলেন-

"বেশ ভূষাতে হয় না ঋষি
আত্মজ্ঞানে নিজকে চিনে
জাতে জাতে মিশামিশি"।

১. *লম্বা চুল মাথে জটা, পুরুষে দিলে মেয়ের ঘোমটা,*
পায়না তারে নাচলে খেমটা, ঘটে ঘটে দেখ আছে বসি।

২. *লাল হলুদ বেশ পরিলে, আরও যদি দেয় তসবি গলে,*
পায়না তারে ভূমন্ডলে, তালাস করিলে দিবানিশি।

৩. ----------

৪. ----------

-বাণী-০৯ (অলৌকিক সুধা)

মহাগুরু রমিজের রচনার আরেকটি বিশেষ দুর্লভ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর তা হলো তাঁর রচিত অনেক ভবিষ্যত বাণী রয়েছে, যা তিনি তাঁর মৃত্যুর ৫০ বছর পূর্বে এবং এখন থেকে ১০০ বছর পূর্বে লিখেছিলেন। ঐ সমস্ত বাণীর ফলাফল এখন পাওয়া যাচ্ছে ও দেখা যাচ্ছে।

যেমন তাঁর ভাষায় তিনি বলেছেন-

"আজব কারখানা কেহ নয় আপনা
খুঁজিয়া কাহারে পাবিনা"।

১. *হবে মহামারী ছাড়তে হবে বাড়ী, খবর তারই জাননা,*
হবে লোকক্ষয় আরও বন্যার ভয়, কে কোথায় যাও নাই ঠিকানা।
২. *আসিতেছে শত্রু হবে অপমৃত্যু, এবার খেলবে নতুন খেলা রব্বানা, রাস্তা-ঘাটে কত হত্যা অবিরত, কারো কথা কেউ শুনবেনা।*
৩. *রমিজ কয় প্রাণ কাঁপে ডরে, যুবালোক এবার নিবে ধরে,*
সাইক্লোন কম্পনে নিয়া যাবে উড়ে, উপায় কি তার বলনা ।

বাণী-০৭ (স্বর্গের সুধা)

গুরু রমিজ প্রণীত তিনটি বাণীর পুস্তকে এরকম অনেক ভবিষ্যত বাণী রয়েছে যা মানুষ পড়লে অবাক হবে। এ বাণীগুলোতে তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তিনি যে মহাবিশ্ব প্রকৃতি ও স্রষ্টার সাথে বিলীন হয়ে আছেন তারই পরিচয় এবং প্রমাণ পাওয়া যায়।

মহাগুরু রমিজের রচনা বৈশিষ্ট্যের সাথে তাঁর জীবন দর্শন ও সাধক জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তিনি যা লিখেছেন তার মর্ম মতেই তিনি সর্বদা কর্মাচরণ করেছেন।

তাঁর জীবন দর্শন বলতে তাঁর আধ্যাত্মিক মতবাদের বৈশিষ্ট্যগুলোকেই বুঝায়, যা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. স্রষ্টা-এক এবং সর্বজীবে বিরাজমান।
২. সর্বজীবে দয়া প্রদর্শন।
৩. কর্ম অনুযায়ী ফল।
৪. সদ্‌গুরুর প্রতি আত্ম নিবেদন।
৫. আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের সাধনা।
৬. আত্মার ভুল সংশোন পূর্বক-মুক্তি সাধনা।
৭. ষড়রিপু দমন।
৮. মানবের প্রতি-স্রষ্টার তরফ হতে আদেশ, ঈশারা বা ইঙ্গিত স্বরূপ স্বপ্ন-সাধন।
৯. রুহের দেশ আলমে আরওয়াকে উপলব্ধি করণ।
১০. নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন।

মহাগুরু রমিজ মারেফত এবং জ্ঞানমার্গের উচ্চতম স্তরের সাধক ছিলেন। যারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান চর্চা করে, সত্য জ্ঞান অর্জন করতঃ সত্যে পরিণত হয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর ভাষায় বলেন-

"দেখিবে জ্ঞানের আলো খুলিবে দর্শন,
বিশ্ব মাঝে আর কিছু নয় শুধু একজন"।

উপদেশ-২৬ (অলৌকিক সুধা)

গুরু রমিজের উক্ত আপ্তবাক্যে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, একজন সদ্‌গুরু বা চেতন গুরুর সান্নিধ্যে এসে জ্ঞান চর্চা করলে এবং সাধনায় লিপ্ত হলে সত্যে পরিণত হওয়া যায়, সত্য জ্ঞান তাঁর মধ্যে ফুটে উঠে। মহাবিশ্ব প্রকৃতি যার সৃষ্টি তাকেও চিনা যায়। মহাবিশ্ব প্রকৃতির যাবতীয় কর্মকান্ড সবই একজনের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই সকল বিষয়বোধ এবং আত্মবোধ তাঁর (সাধনায় লিপ্ত ব্যক্তি) মধ্যে সৃষ্টি হবে। আর এই আত্মবোধ সম্বন্ধে গুরু রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন-

"যার হয়েছে আত্মবোধ, তাঁর হইল কর্মরোধ,
হইল সে খোদেখোদ, যখন যা তাঁর ইচ্ছায় করে"।

বাণী-১৩ (অলৌকিক সুধা)

যার আত্মবোধ সৃষ্টি হয়েছে তিনি সর্বপাপ, ষড়রিপু ও ইন্দ্রিয়াদিকে জয় করেছেন। এমতাবস্থায় তিনিই আধ্যাত্মিক দর্শন অর্জন করবেন। সত্য ও দর্শনের অধিকারী হলে পরে তাঁর দিব্যজ্ঞান ও দিব্যচক্ষু খুলে যাবে।

উপরোক্ত আত্মবোধ, কর্মরোধ ও খোদেখোদ বলতে গুরু রমিজ ইহাই বুঝাতে চাচ্ছেন যে, সদ্‌গুরু বা চেতন গুরুর সান্নিধ্যে এসে আরাধনা বা সাধনা করলে সত্য বা স্রষ্টার যত গুণাবলী আছে সবই তাঁর (সাধকের) মধ্যে স্ব-প্রকাশিত হবে। তিনি স্রষ্টাতে লয় হয়ে যাবেন। এভাবে স্ব-ভাবে সাধকের মধ্যে স্রষ্টার গুণাবলী স্ব-প্রকাশের ঘটনাকেই স্রষ্টাতে লয় হওয়া বুঝায়।

এই অবস্থায় তাঁর (সাধকের) ইচ্ছামতেই সকল আধ্যাত্মিক কর্ম সাধিত হবে। যারা সাধনার মাধ্যমে আত্মিক জ্ঞান অর্জন করতঃ উলে- খিতভাবে সত্যে পরিণত হয়েছেন তাঁরাই আধ্যাত্মিক দার্শনিক ও দিব্যজ্ঞানী। তাঁরা মন ও মননে, চিন্তা ও চেতনায়, কর্ম ও সাধনায়, একেশ্বরবাদী (আল-াহ্/স্রষ্টা এক) ও প্রেমবাদী।

মহাগুরু রমিজ স্রষ্টার মধ্যে বিলীন হওয়ার জন্যই নানাভাবে সাধনা করেছেন। অর্থাৎ সাধনার বিভিন্ন মার্গের কর্ম করেছেন এবং তাঁর ভক্তবৃন্দকে সাধনার পথ দেখিয়েছেন।

গুরু রমিজ সর্বজীবে দয়া করা (তাঁর মতবাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য) সাধনার উচ্চমার্গের পথ বলে মনে করতেন। এই বিষয়ে তাঁর দর্শন হলো জীব বা প্রাণী বধ করে অপর প্রণী বা নিজের মঙ্গল (মুক্তি) কামনা করা যায় না। পিতার কাছে যেমন মূর্খ, কুপুত্র, বিদ্বান সকল সন্তান-ই সমান ভালবাসা ও মায়া পেয়ে থাকে, তদ্রূপ সর্বজীবও স্রষ্টার সন্তান এবং তাঁর (স্রষ্টার) কাছে সমঅধিকার প্রাপ্য।

পিতার কোন সন্তানকে অপর কোন সন্তান পিতার সামনে হত্যা করলে পিতা যেমন সন্তুষ্ট হতে পারেন না, তেমনি স্রষ্টার সন্তান মানুষ অন্য কোন প্রাণীকে হত্যা করলে স্রষ্টা সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

মক্কা শরীফের পবিত্র কাবা শরীফে ও ইহার আওতাভুক্ত নির্দিষ্ট স্থানে কোন প্রকার প্রাণী বা জীব হত্যা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোন অবস্থায়ই সেখানে হত্যা করার কোন নিয়ম নীতি নেই। আর সেখানে হত্যা করা মানেই পাপ।

উপরোক্ত যুক্তিসঙ্গত কারণে এবং মানবদেহের রিপু ও ইন্দ্রিয়াদির সংযম সাধনের জন্য ও খাদ্য লোভ বা লিপ্সা সংবরণ করার নিমিত্তে গুরু রমিজ প্রাণী বা জীব হত্যা করে ইহাদের মাংস ভক্ষণ না করার উপদেশ দিয়েছেন। মাংসের পরিবর্তে নিরামিষ বা সবজি খওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

যে সকল ভক্ত গুর ে রমিজের নির্দেশ মতে কর্মসাধন করে পরিণত হয়েছেন ঐ সমস্ত ভক্তের পরমাত্মা সমূহ রমিজের পরমাত্মার সাথে লয়কৃত সকল আত্মাসহ, আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে স্বয়ং স্রষ্টার হয়েছেন। এই মহাপরমাত্মাকে গুর ে রমিজ আত্মার রাজ্যে বা থাকেন। আলমে আরওয়ার সকল কর্মকান্ড সর্বাধিপতির (স্রষ্টা) নিকট-ই তাঁর নিজের এবং সকল ভক্তের জন্য সর্ব বিষয়ের আবেদন

র ে হের দেশ বা আলমে আরওয়া সম্পর্কে গুর ে রমিজ নিম্নরূপ

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে, রাষ্ট্র পরিচালনার সুবিধার্থে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই একেকজন করে কর্মকর্তা থাকেন। তার আজ্ঞাধীনে উক্ত ডিপার্টমেন্টের পালন করেন। আত্মার রাজ্যেও তদ্র ে প বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আছে। আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতঃ মারেফাতের (সাধনার) উচ্চস্তর অর্জন করতে কর্মচারী হিসেবে কর্মরত থাকেন। সবাই স্রষ্টার বা সর্বাধিপতির ভাষায় বলেন-

"পৃথিবীতে প্রজা থাকে রাজার শাসনে,
কতশত ডিপার্টমেন্ট আছে স্থানে স্থানে

তিনি তাঁর ভক্তদের এবং পরিবারের সদস্যদের এমনকি কোন কোন আত্মীয়গুস্বজনকে বলেছেন*"তোমরা হাত-পা দ্বারা অথবা মুখের বাক্য দ্বারা সর্ব প্রকার হত্যা কর্ম বন্ধ কর। প্রাণী বা জীব হত্যা করে তার মাংস ভক্ষণ করে উদরস্থ করতঃ তোমাদের দেহকে প্রাণী এবং জীবের কবরস্থানে পরিণত করোনা। বরং তোমরা, আল-াহ্ বা স্রষ্টার গড়া তোমাদের দেহকে কাবা শরীফের মর্যাদা দিয়ে সর্বপাপ বর্জন করতঃ আত্মশুদ্ধি এবং নিষ্কলুশ চরিত্র গঠন পূর্বক কাবা শরীফে রূপান্তরিত কর। নির্বিকার, নিষ্কলুশ এবং পরিশুদ্ধ দেহের পবিত্র হৃদয়েই (ক্বালব্ -এ) আল-াহ্ বা স্রষ্টা বাস করেন"।*

মহাগুর ে রমিজ এবং তাঁর স্ত্রী নূরজাহান রমিজ আজীবন নিরামিষ ভোজী ছিলেন। তিনি তাঁর দুই সংসারের তিন ছেলে সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় সংসারের দুই ছেলেকেই তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফা নির্বাচন করে রেখে গেছেন। তাঁরাও পিতার (গুর ে রমিজের) আদর্শে আদর্শবান হয়ে তাঁর প্রদর্শিত বিধানে সুষ্ঠ্যভাবে ভক্ত পরিচালনা করছেন। রমিজ পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই তাঁর বিধান মেনে চল্ছেন এবং তাঁরা নিরামিষ ভোজী। রমিজের বর্তমান জীবিত শিষ্যবৃন্দ ও তাঁর অনুসারী দুই ছেলের শিষ্যবৃন্দ সবাই নিরামিষ ভোজী এবং গুর ে রমিজের আদেশ ও উপদেশ মেনে চল্ছেন।

গুর ে রমিজ যাঁর নিকট আবেদন করেন

তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতঃ (পবিত্রীকৃত) পরমে সাথে লয় হয়েছে। আর গুর ে রমিজের পরমাত্মা তাঁর সাথে বিলীন হয়ে একাকার মহাপরমাত্মায় পরিণত আলমে আরওয়ার সর্বাধিপতি হিসাবে মর্যাদা দিয়ে নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। মহাগুর ে রমিজ এই সর্বাধিপতির নিবেদন করে থাকেন।

ধারণা দিয়েছেন-

অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট থাকে। প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে অন্যান্য কর্মচারীগণ নিজ নিজ কর্তব্য শৃংখলার সহিত যারা পৃথিবীতে সদ্গুর ে র অধীনে সৎকর্ম করে নিজ সক্ষম হয়েছেন, তারাই আত্মার রাজ্যের কর্মকর্তা-আজ্ঞাধীন থাকেন। উক্ত বিষয়ে গুর ে রমিজ তাঁর

সেই রকম ডিপার্টমেন্ট আছে রূহের দেশে,
শত শত মুক্ত লোক কাজ করে নিজ খোশে"।

উপদেশ-২১,২২ (স্বর্গে আরোহণ)

*** বিঃ দ্রঃ রমিজের মতাদর্শ মতে রূহের দেশ আলমে আরওয়া সম্পর্কে উপরে আলোকপাত করা হলো। উলে-খ্য যে, মহাগুরু রমিজ অপার্থিব রূহের দেশ আলমে আরওয়া ছাড়াও আমাদের পৃথিবীর মতো আরো অনেক গ্রহের বা ভূমের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে বলেছেন।*

তাঁর মতে আমাদের সৌরজগতের বাইরে আরো অসংখ্য সৌরজগত রয়েছে। ঐ সমস্ত কোন কোন সৌরজগতের আওতাধীনে আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহ বা ভূমের মত আরো অনেক ভূম রয়েছে। কোন কোন ভূমে আমাদের পৃথিবীর মত আবহাওয়া, তাপমাত্রা, পানি, বৃক্ষলতা ইত্যাদি রয়েছে এবং ঐ সমস্ত ভূম বা গ্রহে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী বসবাস করছে।

মহাগুরু ও মহাসূফী খন্দকার রমিজ আধ্যাত্মিক বা মারেফাতের এতই উচ্চতম সোপানে অবস্থান করতেন, যার কারণে মোরাকাবা বা ধ্যানের মাধ্যমে তাঁর মধ্যে মহা জাগতিক শক্তি (Cosmic Energy) ও অধ্যাত্ম দর্শন-এর আবির্ভাব ঘটতো। এ দর্শনের মাধ্যমে তিনি উলে-খিত গ্রহ, মানব এবং প্রাণী সম্মন্ধে অবগত হয়ে যেতেন। তার-ই ফলশ্রুতিতে তিনি উপরোক্ত ভূম বা গ্রহরাজীর বর্ণনা দিয়েছেন। অন্যান্য গ্রহ ও গ্রহলোকে কিংবা ভূমগুলোতে মানব ও প্রাণীর বসতির কথা তিনি এখন থেকে একশত বছরেরও অধিক কাল পূর্বেই তাঁর ভক্তদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন।

"রমিজ কেন মহাশক্তি"

রূপান্তর ভেদে শক্তি অনেক প্রকারের। প্রকৃত জ্ঞান দ্বারা বিবেচনা করলে প্রধানতঃ দুটি শক্তিই পর্যবেক্ষিত হয়। তার একটি পার্থিব বা প্রাকৃতিক শক্তি, অপরটি অপার্থিব বা ঐশী শক্তি/আধ্যাত্মিক শক্তি। সমস্ত সৌরজগত যেমন এক মহাকর্ষ শক্তির মাধ্যমে গাণিতিক নিয়মে পরিভ্রমন অবস্থায় পরিচালিত, তদ্রূপ অনন্ত বিশ্বের সকল জড় ও জীব এক অনন্ত শক্তি/স্রষ্টা'র সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা বিধানে সৃষ্ট এবং পরিচালিত। প্রাকৃতিক মধ্যাকর্ষণ শক্তি যেমন মহাকর্ষ শক্তির নামান্তর তদ্রূপ আধ্যাত্মিক মহাশক্তি ও অনন্ত শক্তির নামান্তর।

গুরু রমিজ এমন এক আধ্যাত্মিক/ঐশী/অপার্থিব/অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন যাহার উপস্থিতি সাধারণ মানুষের মধ্যে অত্যন্ত বিরল/দূর্লভ। বিভিন্ন বিষয়ে অন্যান্য সকল লিখক, দার্শনিক, অলী, ঋষী ও বৈজ্ঞানিকদের চিন্তা ধারণার চেয়ে গুরু রমিজের ধ্যান-ধারণা সত্যিকারভাবে অভিনব, চমকপ্রদ ও ব্যতিক্রমধর্মী হিসেবে প্রতীয়মান হয়। তাঁর দৃষ্টান্ত নিম্নে বিবৃত হলো:

১. ***লেখক হিসেবে গুরু রমিজের প্রকাশিত তিনটি পুস্তকের বাণীগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান প্রদত্ত হলো-***

(ক) অলৌকিক সুধা ও সত্যের অনুসন্ধান..... ৮০ টি।
(খ) স্বর্গের সুধা ও সত্যের সন্ধান..... ১৮৪ টি।
(গ) স্বর্গে আরোহণ ও সত্যে পরিণত..... ২২৯ টি।
মোট- ৪৯৩ টি।

উক্ত বাণীগুলোর পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় পুস্তকের বাণীর সংখ্যা প্রথম পুস্তকের দ্বিগুণের অল্প বেশী। অর্থাৎ দ্বিতীয় পুস্তকে তিনি প্রথম পুস্তকের দ্বিগুণ শ্রম দিয়েছেন। আবার তৃতীয় পুস্তকের বাণী সংখ্যা প্রথম পুস্তকের প্রায় তিন গুণের সমতুল্য। অর্থাৎ তৃতীয় পুস্তক রচনাকালে তিনি প্রথম পুস্তকের তুলনায় তিনগুণ শ্রম দিয়েছেন। ভক্তদের কল্যাণে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের বাণী রচনাকালে পর্যবেক্ষিত হয় যে, প্রথম পুস্তকটি রচনা করেছেন যৌবনকালে, দ্বিতীয়টি প্রৌঢ়কালে এবং তৃতীয়টি বৃদ্ধকালে। সুতরাং যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধকালের আধ্যাত্মিক শ্রমের অনুপাত ১:২:৩। প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে গাণিতীক সমান্তর ধারা অনুসারে তাঁর ধ্যান ধারণা, গবেষণা, উপলব্দি ইত্যাদির বিস্তৃতি দ্বিগুণ হতে ত্রিগুণ পর্যন্ত বিস্তৃত। স্বাভাবিক লেখক/গবেষকদের বেলায় দেখা যায় যে, বয়োঃবৃদ্ধির শেষ প্রান্তে চিন্তাশক্তি হ্রাস পায়। কিন্তু গুরু রমিজের বেলায় সেটা উল্টো ঘটেছে। দেহ ত্যাগের ৩০ মিনিট পূর্বেও তিনি একটি বাণী রচনা করেছেন। সেই বাণী হলো-

"থাকতে চাইনা কারাগারে

কৃপা কর দাসের প্রতি দরজা খোল যাই বাহিরে।" বাণী - ৪ (স্বর্গে আরোহণ)

অতঃপর সম্পূর্ণ সুস্থ জ্ঞানে স্ত্রী কন্যাগণের সাথে কথা বলে পরলোক গমন করলেন। এই সবগুলো বিষয়ই সাধারণ্যে অভিনব ও ব্যতিক্রমধর্মী, মহাক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির বেলাই ইহা প্রযোজ্য।

২. তাঁর সুচিন্তিত মন মানসিকতা, বিচক্ষনতা ও ধ্যান ধারণার আরো সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রণীত তিনটি পুস্তকের নামকরণ বিশে-ষণ করলে। দেখুন, প্রত্যেকটি পুস্তকের নামের দুইটি অংশ। উপনামসহ ৩টি পুস্তকের ৩ × ২ = ৬ টি নাম। প্রত্যেকটি পুস্তকের প্রথম মূল নামগুলোর একটি চমকপ্রদ অর্থ বিদ্যমান। আবার দ্বিতীয় অংশের উপনামগুলোর ধারাবাহিকতায় একটি সুচিন্তিত অর্থ বিদ্যমান। প্রথম অংশগুলো যথাক্রমেও অলৌকিক সুধা, স্বর্গের সুধা এবং স্বর্গে আরোহণ। সুপ্রিয় পাঠক/পাঠিকাবৃন্দ, গবেষণালব্দ উপলব্দির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পুস্তকের বিষয়াবলী তিনি এমনভাবে বিন্যাস্ত করেছেন যে, এগুলো বিশে-ষণ করলে লোকালয়ের বাহিরের অপার্থিব নেশায় পেয়ে বসে। এ অপার্থিব উপলব্দির পরবর্তী স্তর হলো বেহেশত/স্বর্গ/আত্মার রাজ্যের উপলব্দি। এ অপার্থিব নেশা ও উপলব্দির মাধ্যমে ভক্তদের হৃদয়ের মণিকোঠায় আধ্যাত্মিক দর্শন নামক জ্যোতি সৃষ্টি হয়, যার মাধ্যমে আত্মার রাজ্য আলমে আরওয়ার উপলব্দি করতঃ রমিজ ভক্তগণ স্বর্গারোহণে ব্রতী হতে পারেন। আর সে জন্যেই ধারাবাহিকভাবে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুস্তক গুলোর নামকরণ অলৌকিক সুধা, স্বর্গের সুধা ও স্বর্গে আরোহণ অর্থবহ হয়েছে।

অপরদিকে পুস্তক গুলোর নামের দ্বিতীয় অংশ সমূহ হচ্ছে- সত্যের অনুসন্ধান, সত্যের সন্ধান ও সত্যে পরিণত। সত্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সন্ধান করাই হলো সত্যের অনুসন্ধান। অতঃপর সত্যকে অনুসন্ধান করে তার সঠিক সন্ধান যিনি পেয়েছেন তিনিই সত্যে পরিণত হয়েছেন এবং তার মধ্যে সত্যের আবির্ভাব ঘটে। সুতরাং উপরোলি-খিত পুস্তক গুলোর ধারাবাহিক নামের অর্থ অত্যন্ত সুচিন্তিত। বিশে-ষণ পূর্বক উপলব্দি করা যায় যে, গুরু রমিজের জ্ঞান ভান্ডার ছিল অত্যন্ত বিশাল। তাঁর সাহিত্যরসের পরিচয় পুস্তক গুলোর নামকরণ বিশে-ষণেই পাওয়া যায়।

৩. প্রিয় সুধীবৃন্দ, গুরু রমিজের বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর তিনখন্ড পুস্তকের উপদেশ গুলোর নামকরণের সুচিন্তিত ধারাবাহিকতা বিশে-ষণ করলে। পরিসংখ্যানসহ নিম্নে উহা আলোচিত হলো-

- **অলৌকিক সুধা ঃ-** (ক) আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ও জ্ঞানের জ্যোতি - ৩২ লাইন = ১৬ টি উপদেশ।
  (খ) গুরুতত্ত্ব ও গুরুতে অর্পণ - ৪২লাইন = ২১ টি উপদেশ।
- **স্বর্গের সুধা ঃ-** (ক) অলৌকিক জ্ঞানের আকর্ষণ - ৬২ লাইন = ৩১ টি উপদেশ।

- **স্বর্গে আরোহণ ঃ-** (ক) জ্ঞানের বিকাশ - ৪৪ লাইন = ২২ টি উপদেশ।

মোট = ১৮০ লাইন = ৯০ টি উপদেশ।

বিঃ দ্রঃ ৯০টি উপদেশের মধ্যে সরাসরি আদেশ - (৬+১১+৫) = ২২ টি। পরোক্ষ আদেশ (৯০-২২) = ৬৮টি।

উক্ত পরিসংখ্যান হতে পর্যবেক্ষিত হয় যে, প্রথম পুস্তকে সন্নিবেশিত উপদেশাবলীর বিষয় হলো জ্ঞানের জ্যোতি সম্পর্কে, তদ্রূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুস্তকে যথাক্রমে জ্ঞানের আকর্ষণ এবং জ্ঞানের বিকাশ। ধারাবাহিকভাবে দেখা যায় যে, জ্যোতি হতে আকর্ষণ এবং আকর্ষণ হতে জ্ঞানের বিকাশ। আলোর জ্যোতি দেখা যায়, কিন্তু জ্ঞানের জ্যোতি দেখা যায় না, তবে গুরু প্রদত্ত প্রবলভাব ও ধ্যানের মাধ্যমে তা অনুভব করা যায়। এ অনুভূতি গুরু ও ভক্তের মধ্যে এক নিগুঢ় রহস্যময় আকর্ষণ সৃষ্টি করে। উক্ত আকর্ষণ দ্বারা গুরুরূপ আয়নার মাধ্যমে নিজ হৃদয়ে অনন্তরূপ স্রষ্টার বিকাশ ঘটে। সেজন্যেই গুরু রমিজ উপদেশের ধারাবাহিকতায় জ্ঞানের জ্যোতি, আকর্ষণ এবং বিকাশের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এতে তাঁর সাহিত্যরসের প্রতিফলন ঘটেছে যা সাধারণ্যে নেই। এতে প্রতীয়মান হয় তিনি একজন মহাজ্ঞানী পুরুষ।

৪. একজন কবি বা দার্শনিক'কে বুঝতে হলে, তাঁর সকল লেখাকে বিচার বিশে-ষণের মাধ্যমে উপলব্দি করতে হয়। তদ্রূপ গুরু রমিজের যাবতীয় লিখাকে উপলব্দি করতে পারলেই তাঁকে বুঝা ও চেনা যাবে। হৃদয়ের মণিকোঠায় জেগে উঠবে গুরু রমিজরূপী স্রষ্টার আয়না। স্রষ্টার আয়নারূপ মহাজ্ঞানের মাধ্যমে পাওয়া যাবে অনন্তরূপী স্রষ্টার সন্ধান।

গুরু রমিজের তিনখন্ড পুস্তকে সন্নিবেশিত বাণী সমূহ বিশে-ষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এখন থেকে প্রায় একশ বছর পূর্বে বেশ কতগুলো ভবিষ্যৎ বাণী রচনা করেছেন। বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে যা অভাবনীয় ঘটনা ঘটছে তা তিনি বাণীর মাধ্যমে প্রায় একশ বছর পূর্বেই বলে গেছেন। তখন যা কল্পনাতীত ছিল এখন তা বাস্তবে ঘটছে। এ ধরণের ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন এমন কোন চিন্তাবিদ, দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক পুরুষ দ্বিতীয় জন আর পাওয়া যায় না। তাই গুরু রমিজ একজন ক্ষণজন্মা, আধ্যাত্মিক মহাজ্ঞান সম্পন্ন মহাপুরুষ। জ্ঞানই শক্তি (Knowledge is power) এ সর্ববাদী সন্মত সত্যের প্রেক্ষাপটে যিনি মহাজ্ঞানের অধিকারী তিনিই মহাশক্তি।

গুরু রমিজ বাণী রচনাকালে হারমোনিয়ামে সুর ধরে গেয়েছেন আর ভক্তবৃন্দ সাথে সাথে তা লিখে রেখেছেন। পূর্ব চিন্তা-ভাবনা ব্যতীত তাৎক্ষণিক বাণী রচনা করার ব্যক্তিত্ব পৃথিবীতে দুর্লভ। তিনি কোন স্কুল, মাদ্রাসা বা কলেজ ভার্সিটিতে বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করেননি। তিনি আরবীতেও বাণী রচনা করেছেন, আবার তাও চিন্তাভাবনা ব্যতীত। শুধু তাই নয়, হিন্দু ভক্তদের অনুরোধক্রমে তিনি তাৎক্ষণিক সংস্কৃত ভাষায় স্তুতি স্তবক রচনা করেছেন। অতএব, তিনি অলৌকিক জ্ঞান সম্পন্ন মহাক্ষমতাধর মহাশক্তি।

গুরু রমিজের বাণী ও উপদেশ সম্বন্ধে যা কিছু বলার ছিল অতি সংক্ষেপে বিষয়টি আপনাদের বিবেকের কাছে তুলে ধরলাম। কথায় এবং গল্পে তাঁর যত অলৌকিক কাহিনী ভক্তমহলে বিবৃত আছে তা লিপিবদ্ধ করলে কয়েক রিম কাগজেও কুলাবেনা।

৫. গুরুর মাধ্যমেই স্রষ্টার নৈকট্য পাওয়া যায়, এ নীতিতে আমরা বিশ্বাসী। সুতরাং গুরু স্রষ্টার আরশী বা আয়না। তাহলে সঙ্গত কারণেই মহাশক্তি খন্দকার রমিজ উদ্দিন মহোদয়কে অনন্ত শক্তি স্রষ্টার আয়না হিসেবে উপলব্দি করতে হবে। যেহেতু তিনি স্ব-শরীরে পৃথিবীতে নেই, সেহেতু তাঁকে উপলব্দি করতে হলে তাঁর নিয়োজিত প্রতিনিধিগণের সংস্পর্শে যেতে হবে। তাদের সঙ্গ করতে হবে। রমিজ প্রণীত পুস্তকের বাণী ও উপদেশ গুলোর বিশে-ষণ পূর্বক গবেষণা করতঃ তাঁর নীতি, আদেশ ও বিধান সম্পর্কে অবগত হয়ে আধ্যাত্মিক কার্য সাধন করতে হবে।

পৃথিবীতে যুগে যুগে বিভিন্ন স্থানে অলী, ঋষি, অবতার, নবী ও রাসূল, মহামানব-মহাজন ও ফকির-দরবেশ আবির্ভূত হয়েছেন। তাদের কেহ কেহ স্রষ্টার পক্ষ হতে সর্বজীব ও সৃষ্টির কল্যাণার্থে ওহী বা বাণী প্রাপ্ত হয়েছেন। উক্ত ওহী বা বাণী সমষ্টি দ্বারা এক একটি ধর্মীয় গ্রন্থ রচিত হয়েছে যা যুগে যুগে মানবের কল্যাণে এসেছে। উক্ত মহামানবগণ নিজেরাই ওহী/বাণী প্রাপ্ত হয়েছেন। অন্য কাহাকেও স্রষ্টার তরফ হতে ওহী/বাণী পাবার ব্যবস্থা করেননি। কিন্তু অত্যন্ত তৃপ্তির বিষয় যে, আমাদের গুরু মহোদয় স্রষ্টার তরফ হতে স্বপ্নের মাধ্যমে বাণী প্রাপ্ত হয়েছেন এবং তাঁর ভক্তদেরকেও স্বপ্নের মাধ্যমে স্রষ্টা ও গুরুর সাথে আত্মিক যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছেন। ***'স্বপ্ন-বিশে-ষণ' রমিজ নীতির একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।*** এখনো তাঁর অনেক ভক্ত রয়েছেন যারা স্বপ্ন বিশে-ষণ পূর্বক পরম সত্যের প্রকাশ করতে পারেন। গুরু রমিজের পরম ও সত্য স্বপ্ন-বিশে-ষণ নীতি এবং তাঁর প্রত্যেকটি কথা, উপদেশ বা বাণীতে অন্য সকলের ধ্যানগুধারণা হতে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী, সর্বজীব কল্যাণমূখী, একটি অভিনব গুণবাচক বিশিষ্ট-অদ্বৈত বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে পাওয়া যাবে অনন্তরূপী স্রষ্টার সন্ধান।

"একটি প্রবন্ধ"

সুপ্রিয় সুধীবৃন্দ,

৬. মহাগুরু রমিজ তাঁর প্রণীত *"স্বর্গে আরোহণ ও সত্যে পরিণত"* নামক পুস্তকে ১৩ নং উপদেশে ছন্দের মাধ্যমে ভক্তদের আদেশ করেছেন যে- ***"সাইন্টিস্ট দেখিয়া নেয় কোথায় কি রয়েছে***
তোমরা প্রমাণ কর স্রষ্টা কোথায় আছে"।

তার অর্থ হচ্ছে- বিজ্ঞানীরা যেমন যুক্তি-তত্ত্বের মাধ্যমে প্রকৃতির বিষয় বস্তুর সত্যের সন্ধান লাভ করে থাকেন, তেমনি তিনি ভক্তদেরকেও আত্মতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব এবং রমিজ রচিত তিনটি পুস্তকের বিষয়বস্তু গবেষণা পূর্বক বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক যুক্তিতত্ত্বের মাধ্যমে স্রষ্টাকে চেনা ও জানার জন্য সরাসরি আদেশ দিয়েছেন। একজন সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যেই আত্মরাজ্যের তত্ত্বসমূহ অবগত হওয়া সম্ভব। তাই স্রষ্টাকে চিনতে হলে প্রথমেই সদ্‌গুরুকে চিনতে হবে। সদ্‌গুরুর জাতের সাথে লয় হতে হবে। তবেই নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন পূর্বক পরম সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

মহাগুরুর উক্ত আদেশ/তাগিদের জন্য রমিজ কেন মহাশক্তি শীর্ষক প্রবন্ধ খানি সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদের খেদমতে পেশ করা হলো। তিনি স্বশরীরে থাকাকালীন স্কুল-কলেজে লেখাপড়া অবস্থায় তাঁর সরাসরি আদেশে প্রতি শুক্রবার সাপ্তাহিক মাহ্‌ফিলে উপস্থিত হয়ে অংশগ্রহণ করেছি। তাঁর বাণী রচনার নয়নাভিরাম দৃশ্য অবলোকন করে উপস্থিত পরিবারস্থ সকলে এবং ভক্তবৃন্দ তৃপ্তি লাভ করেছেন। তাঁর রচিত বাণী সাথে সাথে আমি ও অন্যান্য শিল্পীগণ হারমোনিয়ামে পরিবেশন করে তাঁর মনোরঞ্জন করেছি। এ সময় তাঁকে শিশুর মত কাঁদতে দেখেছি।

মহাশক্তির পরিবারে কেবল আমিই একমাত্র তাঁর সুর-তাল এবং কণ্ঠস্বরের অনুকরণ ও অনুস্মরণ করেছি। তাঁর নির্দেশে ১৯৬৬ সালে কুমিল-ায় ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁনের নিকট কণ্ঠসাধন করেছি। ১৯৬৪ সালে আমি ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম বর্ষের একজন কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজির নিয়মিত ছাত্র ছিলাম। গুরু রমিজ তাঁর আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ১৯৬৪ সালের শেষ দিকে আমাকে ডেকে নিয়ে আসেন। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া বন্ধ করে কুমিল-া ভিক্টোরিয়া কলেজে বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে লেখা পড়া করার জন্য গুরু রমিজ আমাকে সরাসরি আদেশ করলেন। আমি তাঁর আদেশ অনুযায়ী কুমিল-ার ভিক্টোরিয়া কলেজে লেখা পড়া আরম্ভ করি। আমি তাঁর প্রতিটি অনুষ্ঠানে যোগ দেই এবং সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে তাঁর ও ভক্তদের মনোরঞ্জন করতে থাকি। পরিশেষে তিনি নিজেও আমাকে আধ্যাত্মিক এবং সঙ্গীত সমন্ধে তালিম দিয়েছেন।

তিনি যে বাণী বিশে- ষণ দিয়েছেন আজো তা হৃদয়ে গাঁথা আছে এবং থাকবে। তাঁর সাথে সঙ্গ করা হয়েছে বিধায় তাঁর (মহাশক্তি) সম্বন্ধে যা লিখা হয়েছে তা বস্তুনিষ্ঠ। অনাগত ভবিষ্যতে ভাবাবেগ আপ-ুত হয়ে কেহ যেন মহাশক্তি সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত কিছু না লিখে সে জন্যেই মাঝে মাঝে তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখি।

আমার অবর্তমানে অনেকেই হয়তো গুর" রমিজের বই পুস্তক পড়ে এবং গবেষণা করতঃ সুন্দর সাবলীল ভাষায় মহাশক্তি সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখতে পারেন, তাদের পরিপূরক হিসাবে এই প্রবন্ধ উপকারে আসবে।

এ প্রবন্ধ পাঠ করে আপনারা যদি মহাশক্তি সম্পর্কে কিঞ্চিত মাত্রও ধারণা নিতে পারেন, তবে আমি আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। পরিশেষে আপনাদের হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা কামনা করছি। ইতি-

রমিজ মনোনীত প্রতিনিধি
(খন্দকার আমির"ল ইসলাম)

খন্দকার রমিজ উদ্দিন প্রণীত যুগ-যুগান্তরের অলৌকিক কাহিনী নামক হাতের লেখা গ্রন্থে তাঁর ভক্তদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের সুবিধার্থে **''কর্ম রাজ্যের প্রশ্ন-উত্তর''** অধ্যায়টির অংশ বিশেষ নিম্নে সংযোজিত হলো।

নং	প্রশ্ন	উত্তর
০১	মানুষ কয় জাতি ?	তিন জাতি, যথা-পুংলিঙ্গ, স্ত্রী লিঙ্গ এবং ক্লীব লিঙ্গ
০২	ক্লীব লিঙ্গ কেন হইল ?	পুর"ষে-পুর"ষে সঙ্গমের পাপের ফল।
০৩	শুকর কেন বানাইলো ?	সাতটি দোযখের একটি দোযখ।
০৪	খোদাকে চিনিয়াছ কি ?	চিনিবার চেষ্টা করিতেছি।
০৫	আত্মা কত প্রকার ?	দুই প্রকার যথা-পরম আত্মা ও জীব আত্মা।
০৬	খোদা কোন কাবা তৈয়ার করিয়াছেন ?	হৃদয় কাবা।
০৭	আত্মা কি জিনিস ?	জাতে খোদা।
০৮	খোদাকে কিভাবে লাভ করা যায়?	সৎকর্ম ও সদ্গুর"র কৃপায়।
০৯	আদমকে কে সৃষ্টি করিল ?	নিজ ইচ্ছায় সৃষ্টি হইয়াছেন।
১০	পীরের চেয়ে বড় কি ?	গুর"র প্রতি শিষ্যের অটল ভক্তি বিশ্বাস।
১১	কর্মের চেয়ে বড় কি ?	আর কিছু না।
১২	সবচেয়ে বড় শক্তি কাহার ?	যিনি ইচ্ছাশক্তি লাভ করিয়াছেন।

নং	প্রশ্ন	উত্তর
১৬	খোদাকে লাভ করিলে বেহশ্ত দোযখের দরকার কি?	অনাবশ্যক।
১৭	হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রভেদ কি?	নাই।
১৮	স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রভেদ কি এবং সম্পর্ক কি?	লিঙ্গের প্রভেদ। কর্মফল।
১৯	পাপ-পূণ্য কোন্টা ভাল ?	এক সমান।
২০	সত্যের অনুসন্ধান করিয়াছ কি ?	করিবার চেষ্টায় আছি।
২১	মৃত্যু সত্য না মিথ্যা ?	মিথ্যা।
২২	গুর" সত্য না মিথ্যা ?	আমি সত্য হলে গুর" সত্য।
২৩	খোদা কে এবং কি জিনিস ?	প্রকৃত জ্ঞান।
২৪	জ্ঞান সৃষ্টি কোথা হতে ?	অজ্ঞান হতে।
২৫	পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী মানুষ কি চায় ?	শান্তি।
২৬	পৃথিবীতে মানুষ সবচেয়ে কম কি চায় ?	সত্য ও হক কম চায়।
২৭	পৃথিবীতে মানুষ জীবিত বেশী না	জীবিত বেশী।

১৩	পীরের নিকট এসে কি কি লাভ করেছেন?	৮টি জিনিস। ক) আত্মতত্ত্ব জ্ঞান খ) এল্‌হাম, ওহী গ) সর্বজীবে খোদা ঘ) কর্মফল ঙ) আত্মার মুক্তি চ) বেহেশ্‌ত ও দোযখ ছ) আলমে আরওয়া জ) ইচ্ছাশক্তি
১৪	খোদাকে লাভ করিলে ফল কি ?	মুক্ত হওয়া।
১৫	জীব-জন্তু সৃষ্টি করিয়া খোদার লাভ কি ?	খেলার মাঠ (কর্মময় জগত, কর্মফলে যার যার জন্ম)
নং	প্রশ্ন	উত্তর
৩৫	মানুষের দেহের রাজা কে ?	বীর্য্য অর্থাৎ চন্দ্র।
৩৬	জাতে হক এবং খোদার জাত খোদা কে, এবং সম্পর্ক কি ?	জাতে হক হইল সর্বজীব, খোদার জাত খোদ হইল মানুষ এবং খোদার জাতের অংশ।
৩৭	খোদার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি?	খোদার জাত হইল মানুষ।
৩৮	আত্মার চালক কে ?	জ্ঞান।
৩৯	জ্ঞানের ধ্বংস কিসে ?	ক্রোধে।
৪০	হকের ছুরত কি এবং না'হকের ছুরত কি ?	হক মানে আলো, না'হক মানে অন্ধকার।
৪১	কর্মফলের অর্থ কি ?	পুরস্কার ও শাস্তি।
৪২	মেয়ে-পুরুষের মধ্যে বড় কে ?	মেয়ে বড়।
৪৩	আত্মার আসল নাম কি ?	জাতে হক।
৪৪	আত্মরাজ্যে বসতী আছে কি ?	হ্যা।
৪৫	এই পৃথিবীতে মানুষ সুখী না দুঃখী ?	দুঃখী।
৪৬	সত্য ভাল না মিথ্যা ভাল ?	উভয় সমান।
৪৭	খোদা লাভ করিয়া মানুষ সুখী না দুঃখী ?	সুখী।

	মৃত বেশী ?	
২৮	পৃথিবীতে মানুষ জ্ঞানী বেশী না অজ্ঞান বেশী ?	অজ্ঞান বেশী।
২৯	জ্ঞান কোথা হতে শিখিয়াছ ?	মাতা-পিতা হতে।
৩০	জাতে হকের আছ্‌লিয়াত স্বভাব কি ?	সর্বস্ব অর্পণ।
৩১	আত্মত্যাগ অর্থ কি ?	প্রাণ দিয়া প্রাণ রক্ষা।
৩২	সৌন্দর্য্য গঠন করা ভাল না দেখা ভাল ?	সৌন্দর্য্য গঠন করা ভাল।
৩৩	সৃষ্টির ধ্বংস আছে কি ?	সৃষ্টির ধ্বংস নাই।
৩৪	জগতের লোক সুখী কিসে ?	ক্রন্দনে।
৫৭	জীব আত্মা ও পরম আত্মার সম্পর্ক কি ?	জীব আত্মা পরম আত্মার খাদ্য।
৫৮	অনন্ত শক্তি ও মহাশক্তির মধ্যে বড় কে ?	অনন্ত শক্তি।
৫৯	মুক্তি বড় না জ্ঞান বড় ?	জ্ঞান।
৬০	আত্মার ধ্বংস কিসে ?	আত্মহত্যা।
৬১	মানুষের পিছনে সব সময় থাকে কি ?	মৃত্যু।
৬২	আমি বড় না তুমি বড় ?	আমি।
৬৩	কাহার বন্দেগী কর ?	নিজের।
৬৪	আত্মার রাজ্যের আচার-বিচার কি ?	কর্মফল।
৬৫	সৃষ্টির স্রষ্টা এবং মানুষে কত তফাৎ ?	কিছু না।
৬৬	সত্য ও হক এই দুইটির মধ্যে বড় কে?	সমান।
৬৭	কর্ম বড় না জ্ঞান বড় ?	জ্ঞান।
৬৮	গুরুকে কিভাবে জয় করা যায় ?	না চাহিতে দান করিলে।
৬৯	চিনা রাস্তা কি ?	ইচ্ছা শক্তি।
৭০	গুরু বড় না শিষ্য বড় ?	শিষ্য বড়।

৪৮	খোদা চিনিয়া তুমি কি পেয়েছ ?	আত্মরাজ্য লাভ করিয়াছি।
৪৯	আত্মরাজ্যের পরিচয় কি ?	এল্‌হাম, ওহী।
৫০	এল্‌হাম, ওহীর অর্থ কি ?	স্রষ্টার তরফ হইতে সংবাদ বা বাণী।
৫১	এল্‌হাম, ওহীর মালিক কে ?	সদ্‌গুর ু।
৫২	সদ্‌গুর ুর মালিক কে ?	পরম ভক্ত।
৫৩	সদ্‌গুর ুর সঙ্গে সম্পর্ক কি ?	আশ্রয় দাতা ও মুক্তি দাতা।
৫৪	গুর ুর সঙ্গে কি রূপ ব্যবহার করা উচিৎ ?	সর্বস্ব দান করা।
৫৫	সর্বস্ব দান অর্থ কি ?	জান, মাল ও যাবতীয় কর্ম অকুণ্ঠ চিত্তে প্রকাশ করা।
৫৬	স্রষ্টার বাড়ী কোথায় ?	ভক্তের অন্তরে।
নং	প্রশ্ন	উত্তর
৮০	গুর ুর রূপ কিভাবে চিন্তা করিবে?	জাহিরিভাবে।
৮১	গুর ুকে কি দিলে সন্তুষ্ট থাকেন ?	অন্তর দিয়া ভালবাসিলে।
৮২	শিষ্যকে কি দিলে সন্তুষ্ট থাকে ?	সব সময় গুর ুর দরশন পাইলে।
৮৩	গুর ু শিষ্যের নিকট কি চায় ?	আন্তরিক ভক্তি।
৮৪	ভালবাসার অর্থ কি ?	গুর ুর রূপ চিন্তা করিয়া অশ্র ু বিসর্জন।
৮৫	প্রেমের অর্থ কি ?	আত্মদান করা।
৮৬	কর্মের মালিক কে ?	যিনি পূর্ব কর্ম কর্তন করিতে পারেন।
৮৭	আসা-যাওয়ার বাধা কি ?	গুর ুর কৃপা।
৮৮	গুর ুর মুক্তি কিসে ?	শিষ্যের সৎকর্মে।
৮৯	গুর ু-শিষ্যের কর্মের প্রভেদ কি ?	কোন প্রভেদ নাই।
৯০	গুর ুর কৃপায় কিংবা শিষ্যের কর্মে মুক্তি লাভ হয় ?	হয়।
৯১	বধ না করিলে ফল কি ?	পরজনমে বধ না হওয়া।
৯২	কোন বস্তুতে ঈশ্বরের উপাসনা হয় ?	ঈশ্বরের কোন উপাসনা নাই।

৭১	গুর ু সত্য না মিথ্যা ?	আমি সত্য হইলে গুর ু সত্য।
৭২	সর্বজীব অর্থ কি ?	বেমিছাল।
৭৩	জন্মের পর কর্ম কি ?	লেখালেখি।
৭৪	শিষ্যের কর্তব্য কি ?	গুর ুসেবা।
৭৫	শক্তির পরিচয় কি ?	যখন যাহা চিন্তা করি তাহা সত্যে পরিণত হইলে।
৭৬	গুর ু থাকেন কোথায় ?	বিশ্বাসে।
৭৭	গুর ুকে পাইছ কিভাবে ?	যখন যাহা চিন্তা করি তাহা সত্যে পরিণত হইলে।
৭৮	গুর ুর শক্তি কাহার নিকট প্রচার ?	অবিশ্বাসীর নিকট।
৭৯	গুর ু-শিষ্যের কি সম্বন্ধ্য ?	জীবন দাতা।
নং	প্রশ্ন	উত্তর
১০৪	অন্তরঙ্গ শিষ্য কে ?	গুর ুকে যে ব্যক্তি অন্তর দিয়া ভালবাসে এবং আদেশ পালন করে।
১০৫	ব্রাহ্মণ, অলি, ঋষি কে ?	যে নিজ কর্ম দ্বারা ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছে।
১০৬	গুর ু কোন্ জাতি ?	নিস্পাপ জাতি।
১০৭	গুর ুর খোরাকী কি ?	অন্তরঙ্গ শিষ্যের ভক্তি।
১০৮	গুর ুর পাপ কি ?	অন্তরঙ্গ শিষ্যের যেই পাপ, গুর ুরও সেই পাপ।
১০৯	গুর ুর উপাসনা কি ?	শিষ্যের মুক্তি।
১১০	গুর ুর কর্তব্য কি ?	শিষ্যকে দৈববাণী দ্বারা পাপ হইতে ফিরাইয়া রাখা।
১১১	গুর ু আসে যায় কোথায় ?	সমস্ত শিষ্যের অন্তরে।
১১২	গুর ু ভালবাসেন কারে ?	গুর ু ভিন্ন অন্য কিছু জানে না যেজন।
১১৩	গুর ুকে চিনিয়াছ কি দিয়া ?	মহাজ্ঞান দ্বারা।
১১৪	গুর ুর বাবা কে এবং স্ত্রী কে ?	শিষ্য এবং শিষ্যা।

৯৩	পাপের মুক্তি কিসে ?	আত্মদানে।
৯৪	সত্যকে জয় করা যায় কিভাবে ?	ইচ্ছা শক্তি লাভ করিলে।
৯৫	গুরুর মুখে এবং শিষ্যের মুখে প্রভেদ কি ?	প্রভেদ নাই।
৯৬	গুরুকে হৃদয়ে স্থান দেয় কে ?	যিনি গুরু ভিন্ন অন্য কিছু জানে না।
৯৭	গুরুর প্রতি মমতা কার ?	যিনি গুরুর অনন্ত দয়া পাইয়াছেন।
৯৮	যাবে কোথায় থাকবে কোথায় ?	গুরুর শ্রী পাদপদ্মে।
৯৯	খোদা সৃষ্টি কোথা হইতে ?	জ্ঞান হইতে।
১০০	মানব জীবনে শান্তি কিসে ?	অন্তিমে গুরু দরশন লাভ করিলে।
১০১	কি করিলে গুরু সন্তুষ্ট থাকেন ?	জীবে দয়া আত্মদানে।
১০২	দাতা কে এবং গ্রহীতা কে ?	শিষ্য দাতা-গুরু গ্রহীতা।
১০৩	মিথ্যা কথায় পাপ হয় কি ?	গুরুর সঙ্গে বলিলে পাপ হয়।

১১৫	গুরুর বিপদ কি ?	অবাধ্য শিষ্যকে বর্জন করা।
১১৬	গুরুর আনন্দ কিসে ?	ভক্তের আঁখি নীড়ে।
১১৭	গুরু শক্তির পরিচয় কি ?	অসৎকে সৎ পথে আনা।
১১৮	গুরুর নাম কি ?	অন্তরযামী।
১১৯	গুরুকে পাওয়া যায় কোথায় ?	বিপদে পড়িলে।
১২০	গুরু জীবিত কি মৃত ?	জীবিত।
১২১	গুরুকে সন্তুষ্ট করা যায় কি দিয়া ?	সৎকর্ম দ্বারা।
১২২	গুরু সুখী কি দুঃখী ?	দুঃখী।
১২৩	গুরুকে পাওয়া যায় না কোথায় ?	কুকর্মে।
১২৪	গুরুকে দেখা যায় না কোথায় ?	অবিশ্বাসে।
১২৫	গুরুর ভালবাসায় ফল কি ?	নিত্য সংবাদ পাওয়া।
১২৬	নিত্য সংবাদের অর্থ কি ?	গুরুর কৃপা।

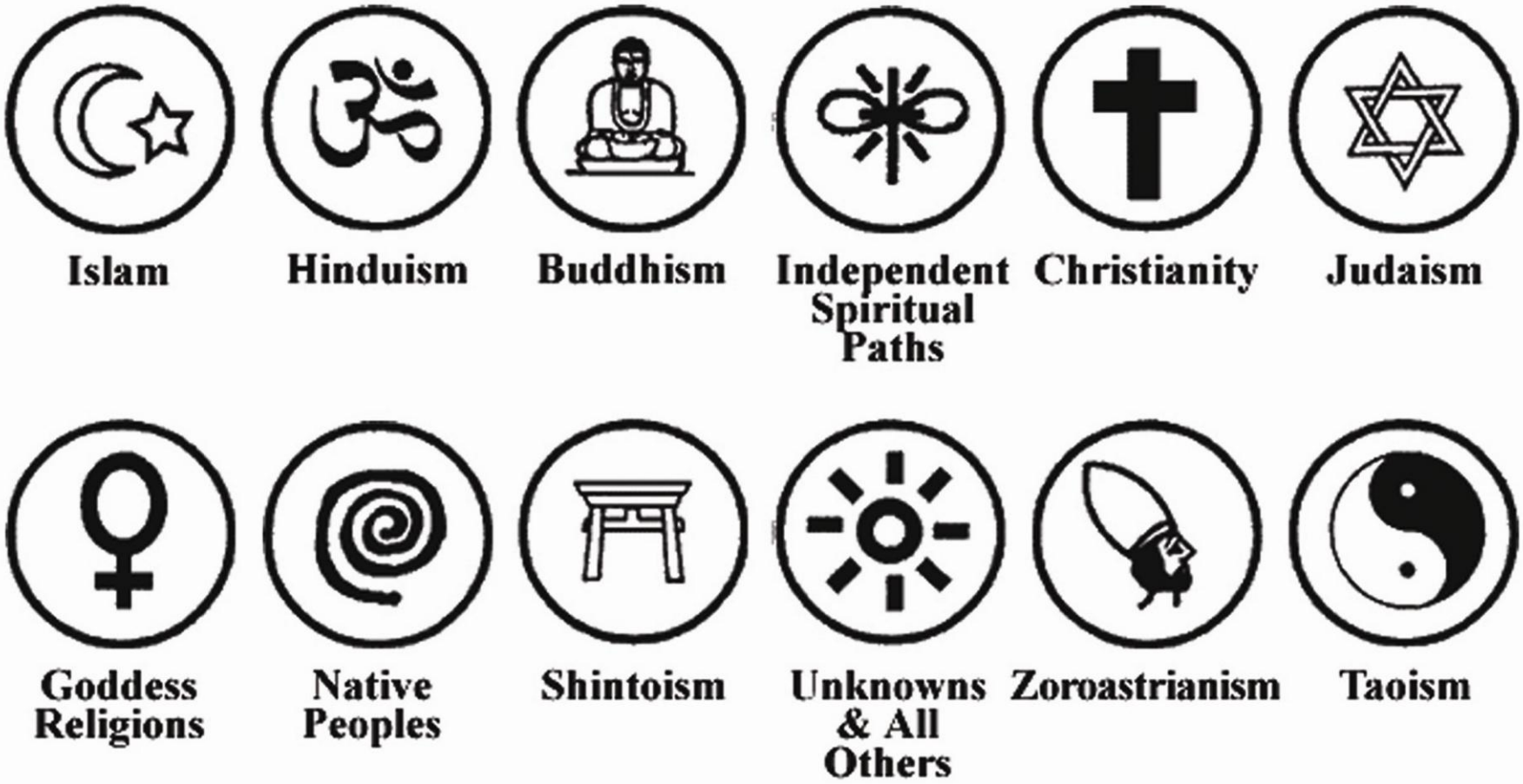
Islam
Hinduism
Buddhism
Independent Spiritual Paths
Christianity
Judaism
Goddess Religions
Native Peoples
Shintoism
Unknowns & All Others
Zoroastrianism
Taoism